আহসান হাবীবের কবিতা : শিল্পীচৈতন্য ও কাব্যরূপ

গবেষকের নাম : মো. ইসমাইল হোসেন সাদী
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১০
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল উপাধির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ডিসেম্বর ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

ভীষ্মদেব চৌধুরী, পিএইচডি
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
মুঠোফোন : ০১৫৫৬ ৪৯৩ ৮১৮

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল উপাধির জন্য মো. ইসমাইল হোসেন সাদী কর্তৃক উপস্থাপিত 'আহসান হাবীবের কবিতা : শিল্পীচৈতন্য ও কাব্যরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক ইতঃপূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্যে উপস্থাপন করেননি। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেননি।

(ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
তারিখ : ১৪/১২/২০১২

465013

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলাদেশের কবিতার অন্যতম প্রধান কবিপুরুষ আহসান হাবীব। মূলত গত শতকের চল্লিশের দশকে কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যিক পরিবেশেই কবি হিসেবে তাঁর অগ্রযাত্রা শুরু। চল্লিশের শেষদিকে এবং পঞ্চাশের শুরুতে 'বাংলাদেশের কবিতা'র যে যাত্রারম্ভ হয়, আহসান হাবীবের ভূমিকা সেখানে ছিল পথিকৃতের। কারণ আহসান হাবীবই ওই দশকের একমাত্র পরিপূর্ণ কবি, যিনি তিরিশের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী কাব্যধারাকে আত্মস্থ করে চল্লিশের কাব্যধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন এবং আধুনিকতার বীজমন্ত্রকে বাংলাদেশের পঞ্চাশের নতুন কবিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। আহসান হাবীবের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে ছিল সেতুবন্ধ রচয়িতার।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্নাতক শ্রেণির চতুর্থ বর্ষে পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল আহসান হাবীবের সফলতম কাব্য *দু'হাতে দুই হাতে আদিম পাথর*। তাঁর সম্পর্কে জানার আগ্রহ তখন থেকেই শুরু। কিন্তু *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*-এ অন্তর্ভুক্ত আহসান হাবীবের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাঁকে রবীন্দ্র-বিরোধী ও পাকিস্তানপন্থী কবি হিসেবে উল্লেখ করায় ধন্দে পড়ে যেতাম। সে-সম্পর্কে তখন জানার পরিসর ছিল সীমাবদ্ধ। তাই বিষয়টি আমার কাছে অমীমাংসিতই ছিল। স্নাতকোত্তর শেষ হওয়ার কয়েক মাস পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এমফিল-পর্যায়ের গবেষণায় আহসান হাবীবের কবিতা বিষয়ে নতুন করে অধ্যয়নের সুযোগ পাই। ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে 'আহসান হাবীবের কবিতা : শিল্পীচৈতন্য ও কাব্যরূপ' শিরোনামে গবেষণার জন্য আমি এমফিল গবেষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধিত হই। প্রথম পর্ব পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে দুই বছর আগে (২০১০ সালে ৬ ডিসেম্বর)। ব্যক্তিগত সমস্যার কারণেই গবেষণাকর্মটি সমাপ্ত করতে বিলম্ব হলো।

'আহসান হাবীবের কবিতা : শিল্পীচৈতন্য ও কাব্যরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভে আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে প্রাবন্ধিক-গবেষক-ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত *আহসান হাবীব রচনাবলী*র প্রথম খণ্ড। প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত আটটি কাব্যগ্রন্থই ছিল মূলত আমার গবেষণার প্রধান অবলম্বন।

465713

গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যাঁর সুনিপুণ নির্দেশনা, ঔদার্য ও অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছি, তিনি আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী। এই আদর্শ শিক্ষক নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছেন আমাকে, অন্যথায় গবেষণা-কর্মটি হয়ত অসম্পূর্ণই থেকে যেত।

অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের জন্য আমি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ওপর। এ ছাড়া সহায়তা পেয়েছি বাংলা বিভাগের মুহম্মদ আবদুল হাই স্মৃতি পাঠকক্ষ, কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আহসান হাবীবের কবিতা বিষয়ে প্রণীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ তুষার দাশের *নিঃশব্দ বজ্র : আহসান হাবীবের কবিতা* আর আহমদ রফিকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ছাড়া তাঁর রচনাকর্ম নিয়ে পরিপূর্ণ আলোচনা তেমন চোখে পড়ে না। এক্ষেত্রে অকৃত্রিম সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কবিপুত্র ও কথাসাহিত্যিক মঈনুল আহসান সাবের। আহসান হাবীবকে নিয়ে এবং তাঁর সৃষ্টিকর্ম নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গ্রন্থালোচনার প্রায় সব লেখাই সযত্নে আগলে রেখেছেন তিনি। আমার সঙ্গে দীর্ঘ এক কথোপকথনে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর বাবার অনেক স্মৃতিকথা, যা অন্য কোনোভাবেই

Dhaka University Institutional Repository

আমার জানা সম্ভব ছিল না। তাঁর দ্বারা সম্ভব সব সহযোগিতাই আমি পেয়েছি। কবির সুযোগ্য পুত্রকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধেয় তাঁরই পরামর্শে আমি ভাষা-সংগ্রামী আহমদ রফিকের কাছে গিয়ে আহসান হাবীব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। অশীতিপর এই মানুষটির সান্নিধ্য আমাকে যারপরনাই মুগ্ধ করেছে। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টার একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁর। সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে আহসান হাবীবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা এবং চল্লিশ ও পঞ্চাশের কবি-কবিতা, ভাষা-আন্দোলন, রাজনীতি, স্বাধীনতাযুদ্ধ, বর্তমান সময়ের সংকটসহ নানা বিষয়।

কাজটি দ্রুত শেষ করার নিরন্তর তাগিদ দিয়েছেন শিশুসাহিত্যিক আখতার হুসেন। আহসান হাবীবের সঙ্গে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা। তিনি আহসান হাবীব সম্পর্কে দুর্লভ কিছু তথ্য দিয়ে আমার অভিসন্দর্ভকে ঋদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। আহসান হাবীবের কবিতা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে জেনে খুশি হয়েছেন কবি নাসির আহমেদ, যিনি আহসান হাবীব সম্পাদিত রবিবাসরীয় ('দৈনিক বাংলা'র) পাতার সহকারী হিসেবে কাজ করার সুবাদে কবির শেষ বয়সে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে যেসব তথ্য রয়েছে, তা দিয়ে অনায়াসে পৃথক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব। তাঁর দেওয়া অনেক তথ্য আমার উপকারে এসেছে। সাক্ষাৎ পেয়েছি 'দৈনিক বাংলা'য় আহসান হাবীবের সহকর্মী কবি-সাংবাদিক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র। তাঁদের ধন্যবাদ।

গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান চেয়ারপার্সন অধ্যাপক সিদ্দিকা মাহমুদা, অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অমৃতলাল বালা এবং সহযোগী অধ্যাপক মিজানুর রহমান খান। তাঁদের প্রতি রইল অশেষ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা জানাই প্রথমপর্বের মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন, অধ্যাপক নূরুর রহমান খান, অধ্যাপক সাঈদ-উর রহমান ও বহিঃপরীক্ষক হিসেবে আগত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শেখ আতাউর রহমানকে।

যাঁরা প্রতিনিয়ত উদ্বিগ্ন থাকেন আমার শারীরিক সুস্থতা নিয়ে আর প্রতিদিনই তাগিদ দেন গবেষণাকর্মটি দ্রুত করার—যাঁদের ত্যাগ ও ঋণ কখনোই শোধ করা যাবে না, তাঁরা আমার বাবা-মা। গবেষণাকর্মটি শেষ করার জন্য প্রতিনিয়ত তাগিদ দিয়েছেন আমার প্রবাসী বন্ধু গোলাম রব্বানী, 'কাঠখড়'-এর বন্ধু-সহযাত্রী জয়পুরহাট মহিলা ক্যাডেট কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক কবি কামরুল হাসান রোকন, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক রাকিবুল হাসান, গল্পকার ইমরান খান, কবি-সাংবাদিক প্রতীক মাহমুদ, কবি চাণক্য বাড়ৈ ও কবি জান্নাতুল তাজরী। তাঁদের সবাইকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

মো. ইসমাইল হোসেন সাদী

ঢাকা, ১৪ ডিসেম্বর ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ-কথা

প্রথম অধ্যায়
আহসান হাবীবের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য || ১-২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
আহসান হাবীবের আবির্ভাব : পরিপ্রেক্ষিত || ২৮-৫২

তৃতীয় অধ্যায়
আহসান হাবীবের শিল্পীচৈতন্যের স্বরূপ || ৫৩-৯৩

চতুর্থ অধ্যায়
আহসান হাবীবের কবিতা : বিষয়বৈচিত্র্য || ৯৪-১৬৬

পঞ্চম অধ্যায়
আহসান হাবীবের কবিতা : কাব্যপ্রকরণ || ১৬৭-২১০

উপসংহার || ২১১-২১৫

পরিশিষ্ট || ২১৬

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি
গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আহসান হাবীবের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

ব্রিটিশ ভারতের পিরোজপুর মহকুমা আর বর্তমানে বরিশাল বিভাগের পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি আহসান হাবীবের জন্ম। আহসান হাবীবের দাদা অবস্থাসম্পন্ন কৃষিজীবী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাবা হামিজুদ্দীন হাওলাদার গ্রামের একজন সৌখিন গৃহস্থ এবং মা জমিলা খাতুন মৃদুভাষিণী ও একজন আদর্শ সংসারী নারী ছিলেন। কবি আহসান হাবীব ছিলেন নয় ভাইবোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং ব্যতিক্রমী চরিত্রের অধিকারী, ধীর-স্থির ও শান্ত মেজাজি। নদীবিধৌত অঞ্চলে বেড়ে ওঠার কারণে কবির সৃষ্টিশীল মানসভূমি হয়তো আরো বেশি সংবেদনশীল হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। কারণ বই পড়ার পরিবেশ কিংবা বইপুস্তক-সংক্রান্ত তেমন কোনো ঐতিহ্য ছিল না পরিবারে। তবে ছোটবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখায় হাতেখড়ি হওয়ার পর থেকে তাঁর মামাবাড়িতে বইপড়ার মতো পরিবেশ এবং কিছু বইয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন আহসান হাবীব। সেটিও হয়তো তাঁর শিশুমনে প্রভাব ফেলে থাকবে ভবিষ্যৎ-লেখক হওয়ার ক্ষেত্রে। এ ছাড়া কবির বাড়ির অদূরে একটি নদীর ওপর ছিল একটি সাঁকো, যা দুই গ্রামকে সংযুক্ত করেছিল। দুই অঞ্চলের মানুষের এই মেলবন্ধনকারী সেতুটিও হয়তো শিশুমনে প্রভাববিস্তারী হয়েছিল কবিস্বভাবী হওয়ার জন্য।

কলকাতা মহানগরীতেই ছিল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত সাহিত্যিক পরিবেশ। কবি তো সৃষ্টির তাড়নায় ছটফট করবেনই, উপায়ও খুঁজবেন সমঝদার পেতে। তাই শঙ্করপাশা থেকে কলকাতা মহানগরীতে স্বপ্নপূরণের পথে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া। বেরিয়ে পড়ার কারণ ছিল মূলত দুটি। এক, পারিবারিক প্রতিবন্ধকতায় কবি হওয়া সম্ভব নয়; দুই, কবি হওয়ার জন্য কলকাতা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই—বিষয়টি আগে-ভাগেই উপলব্ধি করা। তবে কবি হওয়ার তাড়নাই বেরিয়ে পড়ার বড় কারণ বললে অত্যুক্তি হবে না। কেননা, বড় সন্তান হিসেবে আহসান হাবীব উপার্জন করুক—কবির বাবা এটা চাইলেও তখনো তাঁদের সংসার চলছিল সচ্ছলভাবেই। পরিবারের অতিরিক্ত একজন সদস্য সংসারী হয়ে উঠুক, সংসারের দায়িত্ব নেওয়া শিখুক—এমন প্রত্যাশা একজন স্বল্পশিক্ষিত গৃহস্থ বাবার পক্ষে অমূলক নয়। তবে তা ছিল কবি-যশঃপ্রার্থী অভিমানী আহসান হাবীবের জন্য উন্মুক্ত দিগন্তে ডানা মেলবার ক্ষেত্রে বাধা।

শৈশব-কৈশোর থেকেই আহসান হাবীব ছিলেন খুব শান্তস্বভাবী, প্রকৃতি-প্রেমিক, মৃদুভাষী ও ধীর মস্তিষ্কের মানুষ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠকালেই ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লিখে আনন্দ উপভোগের একটি উপায় তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই উপভোগের পথটি তাঁর পুরো কাব্যজীবনেই সক্রিয় ছিল। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় একবার এক শিক্ষক হাজি মুহাম্মদ মুহসীনকে নিয়ে রচনা লিখতে বলেছিলেন। শিক্ষকের বাড়ির কাজ হিসেবে লিখতে দেওয়া সেই রচনাটি কবি লিখে এনেছিলেন ছন্দে ছন্দে—কবিতার ভাষায়। তাতে বিপত্তিও ঘটেছিল। ওই শিক্ষক প্রহারে উদ্যত হয়েছিলেন শিশু কবিকে। সেদিন শিক্ষককে বিপুল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই কবি মোকাবিলা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবির স্মৃতিচারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন:

> ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন। শরৎবাবু বাংলা পড়াতেন। বাড়িতে একদিন রচনা লিখতে দিলেন 'হাজি মহসীন'।...পরের দিন ক্লাসে এসেই হুকুম করলেন, খাতাগুলো সব তাঁর সামনে রেখে দিতে। সবাই উঠে গিয়ে টেবিলে খাতা রেখে এলাম। শরৎবাবু এরপর খাতাগুলো দেখতে শুরু করলেন। তিন-চারটে দেখার পর আমার খাতাটা তাঁর হাতে পড়লো। খাতা খুলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকেই হঠাৎ তিনি গর্জন করে উঠলেন: হতভাগা মূর্খ কোথাকার; রচনা

Dhaka University Institutional Repository

লেখার মানে বোঝ না? কে তোমাকে বই থেকে কবিতা টুকে আনতে বলেছে সোনার চাঁদ, বলতে বলতে শরৎবাবুর গাত্রোত্থান অতঃপর অগ্রগমন। আমি তখন ঘূর্ণায়মান মস্তকে কাষ্ঠবৎ দণ্ডায়মান।...দেখলাম দেরি করবার আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি সাহসে বুক বেঁধে, একেবারে মরিয়া হয়ে আমি বলে ফেললাম, ওটা আমি, মানে নিজেই, এই নিজেই ওটা লিখেছি স্যার। নিজে বানিয়ে লিখেছি।...শরৎবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন।...নকল করেছি, তার উপর আবার মিছে কথা; এটা তাঁর বরদাশত হলো না। তাই দু'চোখে আগুন জ্বালিয়ে আমার মুখের দিকে এমন ভয়াবহ দৃষ্টিতে তাকালেন যে, মনে হলো আমি ছাই হয়ে যাবো।... সেই ছোটো বেলাতেও কি করে যেন একটা বিশ্বাস আমার জন্মেছিলো, সত্যি কথা বুক ফুলিয়ে বলতে পারলে, শেষ পর্যন্ত জয় হবেই। তাই সেই ভয়াবহ দৃষ্টির সামনেও আর একবার কথাটা উচ্চারণ করলাম কোনো রকমে, যদিও বুক ফুলিয়ে নয়। বললাম, আপনি বিশ্বাস করুন স্যার, আমি নিজেই লিখেছি ওটা।[২]

ছেলের এই কাব্যসৃজন-প্রয়াসের খবর বাবা হামিজুদ্দীন হাওলাদার জেনে গেলেও তাঁর কাছে তা কোনো গুরুত্ব বহন করেনি। কিন্তু শান্তস্বভাবী কবি ঠিকই স্থির থেকেছেন তাঁর অন্বিষ্ট খুঁজে পেতে। তাই ম্যাট্রিকুলেশন পাসের পর কলেজের লেখাপড়ার মায়া ত্যাগ করে কলকাতায় যাওয়ার পেছনে বাবার অনুশাসনই যে একমাত্র কারণ, তা অন্তত বলা যাবে না। কেননা, ১৯৩১ সালে যখন তিনি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র, তখন তাঁর প্রথম লেখা ছাপা হয় (লেখাটি কী নামে ছাপা হয়েছিল, তার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি)। পরের বছর কবি যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র, তখন 'শরীয়তে এসলাম' পত্রিকার সম্পাদকের ইচ্ছায় সেখানে ছাপা হয় "প্রদীপ" নামে একটি কবিতা। তবে ১৯৩৩ যখন তিনি নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী, তখন একটি গদ্যরচনা ছাপা হয় পিরোজপুর সরকারি স্কুলের ম্যাগাজিনে। লেখাটির নাম "ধর্ম"। আর ১৯৩৪ সালে "মায়ের কবর পাড়ে কিশোর" নামে কবিতা প্রকাশিত তাঁর স্কুল ম্যাগাজিনেই। তখন তিনি দশম শ্রেণির ছাত্র। এছাড়া ১৯৩৫ সালে "রিক্ত" ও "স্মৃতি" নামে তাঁর আরো দুটি লেখা প্রকাশিত হয়। এরই সুবাদে লেখক হওয়ার বাসনাবীজ তখন কবির মনে রোপিত হয়ে গেছে—অপেক্ষা শুধু অঙ্কুরোদগমের।

"প্রদীপ" কবিতাটি ছাপা হওয়ার প্রেক্ষাপটটি আহসান হাবীবকে কবি হওয়ার ক্ষেত্রে আশান্বিত করে তুলেছিল। স্কুল হোস্টেলের এক অনুষ্ঠানে তিনি একটি কবিতা পড়েছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে সভাপতি হয়ে এসেছিলেন *শরিয়তে এসলাম* পত্রিকার সম্পাদক আহমদ উল্লাহ এনায়েতপুরী। কবিতা শোনার পর তিনি কবির কবিতা চেয়েছিলেন 'শরিয়তে এসলাম'-এ প্রকাশ করার জন্য। কবি খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে তৎক্ষণাৎ বাড়ি গিয়ে বেশ কয়েকটি কবিতা জমা দেন প্রকাশ করার জন্য। সেখান থেকে "প্রদীপ" ও "চলার গান" নামের দুটি কবিতা সম্পাদক বেছে নেন। তারপর শুরু হয় অপেক্ষার পালা—কবে সেই কবিতা দুটি ছাপা হবে কালো অক্ষরে! সেই অপেক্ষা আর প্রকাশের অনুভূতি সম্পর্কে কবি স্মৃতিচারণা করেছেন এভাবে :

এরপর থেকে দু'-তিন মাস আমার কি হালে কেটেছে, সে কথা বলে বোঝাবার ভাষা আজো শিখতে পারিনি।

স্কুলের 'কমন-রুমে' আসে শরিয়তে এসলাম। আগে কখনও 'কমন-রুমে' যেতাম না।...রোজ যাই বিকেলে। পত্রিকা ওল্টাই, উসখুস করি, কাউকে কিছু বলতে পারিনে;...'প্রদীপ' বা 'চলার গান'-এর নামগন্ধও নেই।...হয়তো একটা কবিতা ছাপাতে এরকম দেরি হয়েই থাকে, এত (sic) আর কলম ধরে টকটক করে লিখে ফেলা নয়। যাই হোক আর মাসখানেক পরে 'প্রদীপ' কবিতাটিতে আধাপাতা জুড়ে পত্রিকা এলো 'কমন-রুমে'। পাতা ওল্টাতে সেই পাতায় চোখ পড়তেই মনে হলো, কি যে মনে হলো—...। পত্রিকাটি সেদিন বাড়িতে নিয়ে এলাম এক ফাঁকে।...রাত্রে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। অনেক কষ্টে ঘুম এলো। কিন্তু বারবার সে ঘুম ভেঙেও গেল। অনেক রাত্রে আর একবার উঠে আলো জ্বালালাম।...বের করে সেই সোনার পাতাটি আর একবার খুললাম, পড়লাম।...হ্যাঁ, আমার নিজের

Dhaka University Institutional Repository

লেখাই বটে। নামও তো রয়েছে। ভুল হবার কথা নয়। আবার আস্তে পত্রিকাটি বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়লাম।[২]

সৃষ্টির নেশায় এমন অকৃত্রিম যখন অনুভূতি, তখন তিনি স্কুলের স্বল্প পরিসরে হলেও কবিখ্যাতি পেয়ে গেছেন। কিন্তু কবির স্কুলটি ছিল তাঁর গ্রাম শঙ্করপাশা থেকে তিন মাইলের দূরত্বে মহকুমা শহর পিরোজপুরে। ওই বয়সে এত দূর থেকে প্রতিদিন স্কুলে আসা-যাওয়া কষ্টের ব্যাপার। তাই কিশোর বয়সেই কবি লেখাপড়ার সুবাদে শহরে বাস করার সুযোগ পেয়ে যান। এ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন :

তারপর একদিন শহরে। গ্রাম থেকে এসে স্কুল করা আর সহ্য হচ্ছিলো না। মহকুমা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা, সরকারি স্কুলের ছাত্র, মান বাড়লো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে লেখাটেখার কথা যখন জানাজানি হয়ে গেলো, শহরের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উৎসাহ দিতে লাগলেন আর স্কুলের মাস্টার মশাই মাস্টার সাহেবরা চোখে চোখে রাখতে লাগলেন তখন তো পুরোপুরি মান্যগণ্য। ওপরের ক্লাসের ছাত্ররা ডেকে সেধে সেধে বন্ধুত্ব করে, দু'একটি উকিলবাড়ির মেয়েরা রাস্তায় 'এই দেখুন' বলে গল্পের বই চায়।[৩]

কিন্তু আহসান হাবীবের মনের চোখ খুলে যায় মূলত মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে ১৯৩৬ সালে যখন তিনি বরিশাল ব্রজমোহন (বি এম) কলেজে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পৌঁছেন। কারণ একটু স্বাধীনভাবে বাড়ির বাইরে বেরোনোর সুযোগ কবির জীবনে তখনই ঘটে। ক্রমান্বয়ে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয় বাইরের জগতের সঙ্গে। এ বছরেরই আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ বাড়িতে কাউকে কিছু না বলেই তিনি চলে যান কলকাতায়। শুরু হয় নতুন জীবন। বেড়ে উঠতে থাকে শঙ্করপাশা গ্রামের এক নিভৃতচারী কিশোর।

সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা কলকাতা মহানগরের নাগরিক পরিবেশে কেমন থাকতে পারে একজন নিরীহ কিশোর, যে কিনা জীবিকা এবং লেখক হওয়ার তাগিদে সবাইকে ছেড়ে সবকিছু ত্যাগ করে শূন্য হাতে চলে এসেছে কলকাতায়। স্বাভাবিকভাবেই তাকে বৈরী পরিবেশের মধ্যে পড়ে সংকটের সম্মুখীন হওয়ার কথা; হয়েছেও তা-ই। তবু কারও মুখাপেক্ষী হননি কবি। তাই তাঁকে প্রথম প্রথম বাসস্থানের অভাবে ঘুমাতে হয়েছে ফুটপাতে; আর প্রতিকূল আবহাওয়ার দিনে অপরিচিত কোনো বাড়ির বারান্দায়। তখন এমনও রাত কেটেছে, যখন আচমকা জলের ঝাপটায় রাতদুপুরে কবির গভীর ঘুম ভেঙেছে। সেখান থেকে উঠে গেছেন অন্য কোনো জায়গায় ঘুমানোর জন্য। পরে তিনি ভেবেছেন, সেই রাতের ঘুম ভাঙার কারণ ছিল হয় কোনো শিশুর মূত্র অথবা অন্য কোনো নোংরা পানি। কারণ অত রাতে কোনো বাড়ির বারান্দায় ভালো পানি পড়ার সম্ভাবনা কম।[৪] সেই সময়কালেরই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা: একদিন দুপুরে এক হোটেলে খেতে গিয়েছেন কবি। খাওয়ার পর দেখেন পকেটে টাকা নেই। নিরুপায় হয়ে তিনি তাঁর মাফলারটি দোকানের ম্যানেজারের কাছে রেখে যেতে চাইলেন—পরে টাকা দিয়ে মাফলারটি নিয়ে যাবেন বলে। কিন্তু ম্যানেজার অতটা নিষ্ঠুর আচরণ না করে কবিকে বলেছিলেন, 'আমরা ভাই লোক চিনি। এটা নিয়ে যান। পরে সময় মতো পয়সাটা দিয়ে দেবেন।'[৫] সেই সময় এমনও দিন গেছে তাঁর, যখন তিনি টাকার অভাবে সকালের নাশতা খেয়েছেন জড়ো করা পত্রিকা বিক্রি করে। তবুও মানসিক শক্তি হারানোর মতো মানুষ ছিলেন না আহসান হাবীব। তিনি প্রথম প্রথম আরও অনেকের সঙ্গে যখন মেসে উঠেছিলেন, তখন সেখানে তাস-জুয়ার আড্ডাও চলত নিয়মিত; হতো হৈহুল্লোড়ও। সেই সময়গুলোতেও তাঁর কবিতা লেখা থেমে থাকেনি। জীবন-সংগ্রাম আর বৈরী পরিবেশে তিনি শুধু নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন এমন নয়, সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে শিল্পিত কবিতাও লিখে গেছেন নিরলসভাবে। কিন্তু কলকাতা শহরের অপরিচিত এবং সংগ্রামমুখর জীবনে কবিতা লিখে বা সাহিত্যচর্চা করে উপার্জন এবং তার ভিত্তিতে টিকে থাকা কোনোটিই সহজসাধ্য ছিল না। সাহিত্যিক আবু

Dhaka University Institutional Repository

জাফর শামসুদ্দীনের (১৯১১-৮৮) স্মৃতিচারণায় তখনকার পরিস্থিতি এবং আহসান হাবীবের জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে সামান্য ধারণা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

> তিনি কবিতা লিখতে অথবা আরো ব্যাপক অর্থে বলতে পারি সাহিত্যচর্চা করতেই কোলকাতা এসেছিলেন—চাকরির জন্যই চাকরি করতে নয়। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী মন্দার বাজার। চাকরির জন্যই চাকরি পাওয়াও একজন ম্যাট্রিক পাশ তরুণের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। আর সাহিত্য করার জন্য চাকরি—সেতো প্রায় ডুমুরের ফুলের মতোই অদৃশ্য!...লেখকগণ রচনা ছাপা হলেই নিজেদের ধন্য মনে করতেন। ঈদ সংখ্যা বেরোলে কাউকে কাউকে ৫/১০ টাকা দেয়া হতো।...সাহিত্য সেবার জন্য কোলকাতায় এসে আহসান হাবীব এ অবস্থার সম্মুখীন হন। শুনেছি, সওগাত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করাকালে তিনি নাকি অনূর্ধ্ব ত্রিশ টাকা মাসোহারা পেতেন। আমার মতো যারা সংগ্রামকে ভয় করেছি তারা সাহিত্যসেবাকে জীবনের দ্বিতীয় লক্ষ্যাদর্শরূপে নিয়ে ছোট-খাট চাকরি গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আহসান হাবীব তা করেননি। তাঁর কাছে কবিতা লেখা তথা সাহিত্য সেবাই ছিল জীবনের একমাত্র লক্ষ্যাদর্শ। তিনি জীবিকার জন্য আজীবন চাকরি করেছেন, কিন্তু এমন প্রতিষ্ঠানে একটি দিনও চাকরি করেননি, যার সঙ্গে সাহিত্য উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক ছিল না।[৬]

তবে কলকাতায় যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আহসান হাবীবের ঠাঁই জোটে কলেজ স্কোয়ারে গ্রেট ইস্টার্ন লাইব্রেরির মালিকের বাসায়। তিনিও ছিলেন পিরোজপুরের অধিবাসী। সময়টা ছিল ১৯৩৬ সাল। এ বছরেরই ৩১ অক্টোবর প্রকাশিত হয় বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা 'আজাদ'। পত্রিকাটি ছিল মূলত তৎকালীন বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৯)। ততদিনে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় আহসান হাবীবের কবিতা ছাপা হওয়া শুরু হয়েছে। যেমন *দেশ* পত্রিকায় ওই বছরের ৫ ডিসেম্বর "একখানা চিঠি" নামক একটি কবিতা ছাপা হয়। আর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৭ সালেই তিনি 'আজাদ' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। কয়েক মাস পর তিনি কাজ (১৯৩৭) করেন 'তকবীর' নামক এক পত্রিকায়। সেখান থেকে কিছুদিনের মধ্যেই 'মাসিক বুলবুল' পত্রিকায় তিনি যোগ দেন সহকারী সম্পাদক হিসেবে। এক বছর (১৯৩৭-৩৮) পর এই পত্রিকার চাকরি ছেড়ে যোগ দেন ওই সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী 'সওগাত' পত্রিকায়। এখানে তুলনামূলক বড় পদে—ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে তিনি নতুন চাকরি শুরু করেন এবং পাঁচ (1939-43) বছরের মতো এই পত্রিকার সঙ্গেই যুক্ত থাকেন।[৭] কলকাতায় গিয়ে তখন পর্যন্ত কোনো পত্রিকায় সবচেয়ে বেশি সময় এখানেই চাকরি করেন তিনি। এরপর তিনি স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে যোগ দেন (১৯৪৩) অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা বেতারে। এখানে তিনি 'বিদ্যার্থী মণ্ডল' বা স্কুল-ব্রড কাস্টের দায়িত্ব পান। মূলত 'গল্প দাদু'র আসরের জন্য ওই সময় খুব পরিচিত হয়েছিলেন আহসান হাবীব। এখানে তিনি সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-৭৬), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২) প্রমুখ ব্যক্তিকে। এখানে সফলতার সঙ্গে শুধু তিনি দায়িত্ব পালনই করেননি মুসলমান অনেক চাকরিপ্রার্থীকে কাজেরও সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কথাসাহিত্যিক রশীদ করিম (১৯২৫-২০১১) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁকে কবি আহসান হাবীব স্কুল-ব্রড কাস্টে অনুষ্ঠান করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে রশীদ করিম লিখেছেন, '...এটা ইতিহাস হয়ে থাকবে যে জয়নাল আবেদীন, সৈয়দ আলী আহসান ও আহসান হাবীবের উদ্যোগে আর চেষ্টায় মুসলমানরা যেভাবে কোলকাতা রেডিওতে প্রোগ্রাম করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিছুদিন আগেও তা ছিল অকল্পনীয়। সেজন্য তাঁদের কতরকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা শুধু তাঁরাই জানেন।'[৮]

'সওগাত' পত্রিকায় চাকরি, কলকাতা বেতারে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন—এসবের পরও কবি হওয়ার কাঙ্ক্ষিত জায়গাটিতে আহসান হাবীব নিজেকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা, পেশাগত কাজের ভিড়েও যখন মনে হয়েছে কবিতা লেখার, তখন লিখেছেন। এমনকি তা প্রতিকূল পরিবেশেও অব্যাহত ছিল। সৃষ্টিশীল মানুষ, বিশেষ করে কবিরা সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেন তাঁদের সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে। তাঁর জীবনযাপনের মধ্যে সংস্কার থাকতে পারে, সমাজ-সচেতন মানুষ হিসেবে চেতনায় লালিত হতে পারে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ। এসবের কারণে ওই কবিচারিত্র্যে ফুটে উঠতে পারে অহমিকা অথবা অসহায়ত্বের প্রতিচ্ছবি। শব্দের কারুকার্যের দরুণ এর সবই কবির সৃষ্টিকর্মকে বা কবিতার বিষয়কে বৈচিত্র্যপূর্ণ আঙ্গিকে রূপান্তরিত করতে পারে। সমকাল ও সমাজকে বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে সবাই যে আবার কর্মবৃত্তকে মুখর করেন—এমন নয়। কেউ কেউ আবার সমকালকে চিরকালীন করে, শিল্পসৌন্দর্যকে ধ্রুপদী করার মানসে প্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন। আহসান হাবীব তেমনই একজন কবি। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান হাবীবের স্মৃতিচারণা উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছেন :

> তার কাব্যজীবনের সূত্রপাত থেকে তাকে আমি দেখে এসেছি। কোথাও তার আগমন আবির্ভাবের মতো ছিল না, তিনি প্রচণ্ড কোনো সাড়া কোথাও তুলতেন না কিন্তু একটি সুনিশ্চল প্রশান্তিতে সকলের মধ্যে আগ্রহ বিতরণ করতেন। যুবক বয়সে তার স্নিগ্ধ মনোরম কান্তি এবং নিরীহ লজ্জিত পদক্ষেপ এখনো আমার দৃষ্টিতে ভাসছে। তিনি তখন নিজেকে না জানিয়েও এক বিশেষরূপে জানিয়েছেন। এ যেন ঘোষণা করা নয় কিন্তু একটি সহজ স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে স্ফুরিত হওয়া।...চাকরি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, কর্মক্ষেত্রে ঐশ্বর্যবান হওয়া, জীবনে সম্মানিত হওয়া এগুলোর কোনোটাই তিনি প্রত্যাশা করেননি। একপ্রকার নির্বিকার প্রশান্তিতে তিনি জীবনের পথ চলেছেন। যদি কোনো একটি ক্ষেত্রে ঐকান্তিকতা নিয়ে আপনাকে উন্মোচন করার চেষ্টা আহসান হাবীবের ছিল তবে সে চেষ্টা ছিল কাব্যক্ষেত্রে।[৯]

কলকাতা বেতারে আহসান হাবীবের অন্যতম সহকর্মী ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। তাঁরা থাকতেনও একই এলাকায়—কাছাকাছি ছিল তাঁদের মেস। তাই তাঁদের মধ্যে বোঝাপড়াটা দৃঢ় থাকাটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া তাঁদের বয়স ও বেড়ে ওঠার সমসাময়িকতা এবং সাহিত্যক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের কাল ও কলকাতায় কর্মসূত্রে একাত্ম থাকা সেই সম্ভাবনাকে আরও ঘনীভূত করেছে। সময়টা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫)—একদিকে গোটা বিশ্ব সেই যুদ্ধের প্রভাবে বিপর্যস্ত, অন্যদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের মাধ্যমে চলছে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নানা কর্মসূচি। চলছে হিন্দু-মুসলমানকেন্দ্রিক রাজনৈতিক স্বার্থ নিরূপণের নানা কৌশল-অপকৌশল। ওই সময় কলকাতা বেতারে অনেক গুণী লেখক-শিল্পী-সাংবাদিকই আসা-যাওয়া করতেন। কথা হতো রাজনীতি, সামাজিক সংকট প্রভৃতি বিষয় নিয়ে। তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), সরোজকুমার রায় চৌধুরী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। সেই সময়ের পরিস্থিতিতে কলকাতা বেতারে তাঁরা আসতেন অনুষ্ঠান করতে। অনুষ্ঠান শেষে আড্ডাও দিতেন তাঁরা। সৈয়দ আলী আহসানের ভাষ্যে সে সময়ের চিত্র এবং আহসান হাবীবের কবিচারিত্র্যের, বিশেষত লেখালেখির ক্ষেত্রে নিভৃতচারিতারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

> ...আমি এবং রণেন আচার্য—যিনি নিজেকে আচারিয়া বলে পরিচয় দিতেন, আমরা দু'জন প্রোগ্রাম এ্যাসিসট্যান্ট এক ঘরে বসতাম। আমরা দু'জন মিলে দেখতাম কথিকা বিদ্যার্থীদের আসর ও সাহিত্য বাসর। আহসান হাবীব বিদ্যার্থীদের আসরের পরিচালক ছিলেন। গল্পগুজবে সরোজকুমার প্রায়ই রাজনীতি নিয়ে কথা বলতেন। একদিন হঠাৎ বললেন, 'আলী সাহেব, জানেন, জিন্নাহ হচ্ছেন একজন ব্রিটিশের এজেন্ট।'...আমি বললাম, এজেন্ট অর্থাৎ দালাল? তাহলে আপনি কাদের দালাল? তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে...কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বিমল চন্দ্র ঘোষ তাকে থামিয়ে বললেন, জিন্নাহ, গান্ধী, নেহরু সকলেই দালাল—পুঁজিপতিদের দালাল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এরা কেউই জনগণের প্রতিনিধি নন। এমন সময় বীরেন কৃষ্ণ ভদ্র বলে উঠলেন...এদেশের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছেন

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস। তিনি একদিন আসবেন এবং দেশকে মুক্ত করবেন। এত সব তীব্র সমালোচনার মধ্যে আহসান হাবীব নির্বিকার বসে নিজের কাজ করতেন; অংশগ্রহণ করতেন না। রাজনীতির প্রতি তিনি ছিলেন নিরাসক্ত উদাসীন। তার নিশ্চিত নির্লিপ্ততার ফলে তাকে প্রায় চেনা যেত না।[১০]

কলকাতা বেতারের পাশাপাশি আহসান হাবীব একই সময়ে 'ইত্তেহাদের' সাহিত্যপাতার কাজও করেছেন। তবে প্রায় পাঁচ বছর (১৯৪৩-৪৮) স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেন কলকাতা বেতারে। সেখানে বিদ্যার্থীমণ্ডলীর আসরের পরিচালক থাকাকালে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৭ সালের ২১ জুন বগুড়া শহরের নামাজগড় এলাকার মোহসীন আলীর মেয়ে খাতুন সুফিয়ার সঙ্গে কবির বিয়ে হয়। পরে তিনি 'ইত্তেহাদের' সাহিত্যবিষয়ক পাতা 'সাহিত্য মজলিস'-এর দায়িত্বেই স্থিত হন। এ সময় কবির ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন শিশুসাহিত্যিক রোকনুজ্জামান খান (১৯২৫-৯৯)। বিয়ের আগে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার কমরেড পাবলিশার্সের প্রথম প্রকাশনা হিসেবে আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* প্রকাশিত হয়। আর এ বইয়ের প্রচ্ছদটি ছিল শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা। এর মাধ্যমে বাংলা কাব্যের মহাসড়কে কবি আহসান হাবীব একটি দৃঢ় আসন লাভ করেন। 'ইত্তেহাদ'-এ চাকরিরত অবস্থায় তিনি সস্ত্রীক কলকাতায় বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময়ও তাঁর সঙ্গে একই বাসায় থাকতেন শিশুসাহিত্যিক এবং তখনকার 'ইত্তেহাদের' ছোটদের পাতা 'মিতালী মজলিসের' প্রথমে সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক রোকনুজ্জামান খান। ঘনিষ্ঠজন হিসেবে তাঁর মূল্যায়নে উঠে এসেছে ব্যক্তি ও কবি-সম্পাদক আহসান হাবীবের চারিত্র্য। তিনি বলেছেন :

১৯৪৭ সালের জানুয়ারীর শুরুতেই ঝকঝকে তকতকে আধুনিক অঙ্গসজ্জায় প্রকাশিত হলো দৈনিক ইত্তেহাদ। ভাষা, বানান, সবই আধুনিক।...ডাকসাইটে সাংবাদিক আবুল মনসুর যে পত্রিকার সম্পাদক, তার সাহিত্য মজলিসের দায়িত্ব নিয়ে যিনি এলেন, চেহারায়, কথায়-বার্তায় তিনি মনসুর সাহেবের বিপরীতধর্মী। ছোটখাটো সুন্দর, স্বল্পভাষী আহসান হাবীব এলেন ইত্তেহাদের সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে।...আর দৈনিক ইত্তেহাদের সাহিত্য মজলিসের দফতর তখন পরিণত হলো তরুণ সাহিত্য-সেবীদের অত্যন্ত নিরাপদ আড্ডাস্থলে। এই সাহিত্য মজলিসের মধ্যমণি আহসান হাবীব আমাদের আকর্ষণ করলেন তাঁর মধুর ব্যবহারে। 'আহসান হাবীব সাহেব' আমাদের হাবীব ভাই-এ পরিণত হলেন। কোলকাতার বিভিন্ন এলাকা থেকে তরুণ সাহিত্যিকদের সমাগম ঘটতে লাগলো হাবীব ভাই-এর দফতরে।...অনেক সম্পাদক আমরা দেখেছি। কিন্তু আহসান হাবীবের মত আর একজন সাহিত্য-সম্পাদক চোখে পড়ে নি। ভবিষ্যতেও পড়বে কিনা সন্দেহ। তিনি তাঁর সম্পাদিত সাহিত্য পৃষ্ঠায় নিজের লেখা ছাপতেন না।...সাহিত্য-সম্পাদকের প্রধান কাজ যদি হয় লেখক সৃষ্টি তাহলে বলবো আহসান হাবীব সে কাজে অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।[১১]

রোকনুজ্জামান খান শুধু আহসান হাবীবের সহকর্মীই ছিলেন না, বিয়ের পরবর্তী সময়েও প্রকৃত অগ্রজ-অনুজের মতোই সুখে-দুঃখেও কাছাকাছি ছিলেন তাঁরা। এমনকি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সালে ঢাকার আসার আগ পর্যন্ত কলকাতার দিলকুশা স্ট্রিটের একই বাড়িতেই তাঁরা দুজন বসবাস করেছেন। কারণ আহসান হাবীব নিজেই রোকনুজ্জমানকে তাঁর সঙ্গে থাকতে বলেছিলেন। কবির প্রসঙ্গ টেনে রোকনুজ্জামান লিখেছেন, '...কবি হেসে প্রস্তাব দিলেন, তুমি আমার সঙ্গেই থেকো—মেসে না থেকে। তারপর ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সেই দিলকুশা স্ট্রিটের বাসাতেই আমরা একত্রে বাস করেছি।'[১২] অর্থাৎ ঢাকায় ফেরার আগ পর্যন্ত তাঁরা একসঙ্গেই বসবাস করেছেন। ঢাকায় এসে আহসান হাবীব শুরু করেন অন্য এক জীবনযুদ্ধ। কেননা, কবি দেশ ছেড়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন একা—কাউকে না বলে, না নিয়ে। আর কলকাতায় প্রথমাবস্থার মতো ঢাকাও তাঁর কাছে নতুন ছিল বৈকি। কিন্তু এখানে তিনি এসেছেন সংসারসমেত। বাস্তব পরিস্থিতিটা ছিল এমন—কলকাতার সমস্ত প্রতিষ্ঠা-খ্যাতি বিসর্জন দিয়েই এখানে

Dhaka University Institutional Repository

নতুন করে শুরু করতে হবে। তাই ঢাকার সাহিত্যিক-সাংবাদিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রথমদিকে তিনি ছিলেন 'নিজ দেশে পরবাসী'র মতো।

দুই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্বের মতো ভারতীয় উপমহাদেশেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় রাজনৈতিক-সামাজিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এবং সাধারণ মানুষের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তোলে। অন্যদিকে ১৯৪০ সালে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা বিস্তারে ভূমিকা পালন করে। এটি জনমনকে আরো উসকে দেয়। ফলে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে জনভাবনার একাংশ পুরোপুরি দেশবিভাজনের রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি তখন কোনো পর্যায়েই কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেনি। তাই সস্তা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে জনমনকে দ্বিভাজিত করে ফেলেন কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা। এর ফলে দুটি ধর্মকেন্দ্রিক সম্প্রদায়কে দুটি জাতি হিসেবে অভিহিত করে প্রস্তাবিত দ্বিজাতি তত্ত্বকেই তখন মুসলমানরা মুক্তির একমাত্র সোপান হিসেবে ধরে নেয়। দ্বিজাতি তত্ত্ব তখন বাঙালি মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দিবাস্বপ্ন দেখিয়েছিল—সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সদ্য সচেতন বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত এমনকি কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেও ওই স্বপ্ন বিস্তার লাভ করেছিল। তবে নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের পূর্ব বাংলায় স্বপ্নভঙ্গের বাস্তবতা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল।

দেশভাগের পরপরই—একই বছরেই এ অঞ্চলের মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, তারা স্বাধীন তো নয়ই, বরং একটি উপনিবেশ থেকে আরেকটি ঔপনিবেশিক শোষণের যাঁতাকালে পড়েছে তারা। কেননা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। দেশের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছাত্রদের পক্ষ থেকে দাবি ওঠে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার। কিন্তু সময় যতই গড়াতে থাকে পূর্ব বাংলার মানুষের দাবিকে অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ততই কঠোর অবস্থান নিতে থাকে। এমনকি ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় এসে জনসমক্ষে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছাত্র-জনতার দাবিকে উপেক্ষা করে বক্তৃতা দেন। অর্থাৎ এ দেশের মানুষের দাবিকে ক্রমেই বিপরীত অবস্থানের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এমনকি আরবি-উর্দু হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রও শুরু হয় কিছু অত্যুৎসাহী বুদ্ধিজীবীদের কর্মকাণ্ডে। তাই পূর্ববঙ্গে হাজার বছরের ভাষা-সংস্কৃতির রক্ষা এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মৌলিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ, বিশেষ করে কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীরা যাঁর যাঁর অবস্থান থেকে একাত্ম হতে থাকেন এ আন্দোলনে।

বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান এবং আমাদের 'মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ' মানুষের কবি-সাংবাদিক আহসান হাবীব তখন কলকাতায়। তিনি তখন 'ইত্তেহাদের' সাহিত্যপাতা 'সাহিত্য মজলিস'-এর সম্পাদনার দায়িত্বে। নিজের ভাষার ওপর আগ্রাসন দেখে তিনিও তাঁর অবস্থান থেকে দেশমাতৃকা তথা মাতৃভাষার জন্য কর্তব্য পালন করেছেন এবং ভাষা-সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন কলকাতা থেকেই—বিভিন্ন লেখকের লেখা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। কারণ তখন পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকাই ছিল মূলত প্রচারমাধ্যমের অন্যতম ভরসা। তাই ঢাকায় না থেকেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ভাষার চেতনা

Dhaka University Institutional Repository

ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর সম্পাদিত সাহিত্যপাতা একটি বড় ভূমিকা রাখতে পেরেছিল। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক আবদুল হকের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। তিনি লিখেছেন:

> ...ইত্তেহাদ-এ তিনি কয়েকটি বিষয়ে আমার প্রবন্ধ ছেপেছিলেন বিশেষ করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে। শুধু আমার নয়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গে তিনি অনেকের লেখা *দৈনিক ইত্তেহাদ*-এ ছেপেছিলেন এবং পরে যে-ভাষা আন্দোলন হয়েছিল তাতে এইভাবে তিনি অবদান রেখেছিলেন।[১৩]

আহসান হাবীব শুধু অন্যের লেখা ছাপিয়েই ভাষা-সংগ্রামীদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি, তিনি ভাষা-আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন বেশ কিছু অমর কবিতা। সাম্প্রদায়িক হঠকারিকতায় দেশবিভাগের ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সব শাখায় ইসলাম আর মুসলমানিত্ব আরোপের অপচেষ্টা এবং ষড়যন্ত্র চলছিল। বাংলা সাহিত্যকে তখন পাকিস্তানি সাহিত্য বানানোর জন্য কৃত্রিম জোয়ার সৃষ্টি করা হয়েছিল। '...প্রায় নিঃসঙ্গ আহসান হাবীব ত্রিশোত্তর আধুনিক কবিতার মূলধারার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই। যার ফলে আধুনিক বাংলা কবিতায় বিশেষত চল্লিশ দশকের প্রধান কবির এই অবস্থান আমাদের এ অঞ্চলের কবিতাকে একটা বড় সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছে। পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট প্রবল স্রোত নষ্ট করতে পারেনি আমাদের কবিতাকে। মুক্তচিন্তা আর প্রগতির পথেই চালিত হয়েছে পূর্বপাকিস্তানের কাব্যধারা। সেই সাফল্য যাঁরা নিশ্চিত করেছিলেন আহসান হাবীব তাঁদের অন্যতম।'[১৪]

পাকিস্তান-বিষয়ক বিভ্রান্তি সত্ত্বেও দেশবিভাগের (১৯৪৭) পর বছর তিনেক যেতে না-যেতেই অবিভক্ত বাংলার কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বাঙালি মুসলমান কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা নতুন আশায় বুক বেঁধে ঢাকায় আসা শুরু করেন। ভাবনা একটাই—নতুন দেশ, নতুন রাজধানী হয়তো নতুন প্ল্যাটফর্ম হবে অন্তত কর্মসংস্থানের দিক থেকে। কেননা, বাঙালি মুসলামানদের বেশির ভাগই দেশ ছেড়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন কর্মসংস্থান, পড়াশোনা কিংবা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হতে। ওই সময় অন্তত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিবেশ কলকাতায় যতটা সমৃদ্ধ ছিল, তা অন্য কোথাও ছিল না।

তবে দেশবিভাগের সময় ঢাকার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশটা কলকাতার মতো না হলেও ততদিনে অনেকটাই সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে। তাই বলে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের জন্য ঢাকায় আসাটা যে খুব স্বেচ্ছা-সুখকর ছিল, সেটাও বলা যাবে না। এর জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নেতিবাচক পরিস্থিতিও দায়ী ছিল। মুসলমানদের জন্য যেহেতু আলাদা ভূখণ্ড হয়েই গেছে আর তার ভিত্তিতে যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং কর্মসংস্থানের নিশ্চিত পরিবেশ পাওয়া যায়—এই সম্ভাবনাসূচক চিন্তাগুলোই মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) আহসান হাবীবসহ কলকাতাফেরত লেখকদের মধ্যে কাজ করেছিল। তাই তাঁরা ঢাকায় প্রথমাবস্থায় নতুন পরিবেশকে মোকাবিলা করেছেন নিজ নিজ জায়গা থেকেই। আহসান হাবীব ঢাকায় এসেও সুযোগ পান কলকাতায় দুই বছর (১৯৪৭-১৯৪৯) বন্ধ থাকার পর ঢাকা থেকে পুনঃপ্রকাশিত (১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে) 'মাসিক মোহাম্মদী'তে। একই সঙ্গে দেশবিভাগের পর আবুল কালাম শামসুদ্দীনের (১৮৯৭-১৯৭৮) সম্পাদনায় ঢাকায় স্থানান্তরিত (১৯৪৮ সালের অক্টোবর) 'দৈনিক আজাদ'-এর সাহিত্যপাতাতেও কাজ শুরু করেন তিনি। তৎকালে পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল 'দৈনিক আজাদ'। এমনকি নবপর্যায়ে প্রকাশিত 'ইত্তেহাদ' পত্রিকাতেও তিনি সাহিত্যপাতার দায়িত্ব পালন করেছেন, কাজ করেছেন 'সওগাত'-এও। কলকাতায় থাকা অবস্থায় আহসান হাবীব যে পত্রিকাগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ঢাকায় এসে নতুন কলেবরে প্রকাশিত সেসব পত্রিকায় যুক্ত হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারলেও কবিকে নতুন পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আর সেই পত্রিকাগুলোকেও প্রথমদিকে নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে। কারণ কবিজীবন শুরুর দিকে তাঁর কাছে কলকাতা যেমন নতুন ছিল, তেমনি ঢাকাও—পার্থক্য শুধু বয়স আর সময়ের। ইতোমধ্যে কবি এক কন্যাসন্তানের জনক হন, সেটি ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে। ফলে বেড়ে যায় সাংসারিক ব্যয়। কিন্তু নতুন স্বপ্ন নিয়ে আসা নতুন পরিবেশে হয়নি কোনো স্থায়ী অথবা নিশ্চিত কর্মসংস্থান; বাড়েনি সংসারধর্ম সাবলীলভাবে যাপনের মতো উপার্জনের পরিসর। সংগতকারণেই তাঁকে ছুটতে হয়েছে নতুন কাজের খোঁজে। চাকরির পরিমণ্ডল যেহেতু ছোট ছিল, তাই বেকার হলেই ঘুরতে হয়েছে এ-অফিস থেকে ও-অফিসে। যেমন 'ইত্তেহাদ' নবপর্যায়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। আহসান হাবীবকেও কর্মসূত্রে জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু কিশোর বয়স থেকেই গোড়খাওয়া কবি আহসান হাবীব সহজে দমবার পাত্র নন। তাই এত সংকটের মধ্যে পড়েও সাহিত্যের আধুনিক মেজাজকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর বিশেষত্ব।

কবির জন্য সময়টা ছিল এ-রকম, একদিকে স্ত্রী-সন্তানসহ নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জীবনযুদ্ধ, অন্যদিকে বাঙালির ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম। কলকাতায় থাকতে ভাষা-আন্দোলনের যে উত্তাপ অনুভব করেছিলেন, তার সুসংগঠিত রূপ তিনি ঢাকায় এসে সশরীরে উপলব্ধি করেন। সংগ্রাম ও সংকট চিরদিনই সৃষ্টিশীল মানুষকে আরও উজ্জীবিত করে তোলে মহৎ সৃজনকর্মের জন্য। তাই ভাষা-আন্দোলন নিয়ে কবি আহসান হাবীবও লিখতে থাকেন নতুন নতুন কবিতা। কিন্তু তিনি যেহেতু সেই অর্থে কোনোকালেই কর্মী (activist) ছিলেন না, তাই এখানেও তাঁর অংশগ্রহণ ছিল একজন সৃষ্টিশীল মানুষের মতোই। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ১৯৪৭ সাল থেকেই বিভিন্ন সময়ে ছাত্র-জনতার নানা কর্মতৎপরতার মধ্যে ছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হরতালের মতো কঠোর কর্মসূচি। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখও ছিল সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকা হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি। সে সময় সাধারণ মানুষের দাবির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বরং অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের মধ্য থেকে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন। পাকিস্তান সরকার এবং সংগ্রামরত ছাত্রজনতা পরস্পরের বিপরীত অবস্থানে থাকায় পুলিশ সরকারের নির্দেশে মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। ঘটে যায় ইতিহাসের বর্বর এক হত্যাকাণ্ড। পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবিতে অকাতরে প্রাণ বিসর্জনের ঘটনা আর একটিও নেই। এর ফলে ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি এ দেশের মানুষের মমত্ববোধ অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। তার পরও পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক সরকার ভাষার দাবিকে মেনে নেয়নি। তাই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে—প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। এমনকি ১৯৫৬ সালে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সরকারি অনুমোদন আদায়ের আগ পর্যন্ত এ আন্দোলন অব্যাহত ছিল। তখনকার ঢাকায় বসবাসরত তরুণ কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—প্রায় সবাই ভাষা-আন্দোলনে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে ওঠে বাঙালির এক মহান চেতনার নাম। এই চেতনাই পাকিস্তানিদের কাছ থেকে অন্যান্য দাবি আদায়েরও প্রধান প্রেরণা হিসেবে আবির্ভূত হয় বাঙালি মুসলমানসহ পূর্ব বাংলার বাংলাভাষীদের কাছে। আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের শক্তি-সাহস সবই বাঙালি অর্জন করেছে একুশের চেতনা থেকে।

একুশের চেতনা লালন করে সৃজিত হয়েছে অনেক মহৎ সাহিত্যকর্ম। কবিতা-নাটক-গান-ছোটগল্প—সাহিত্যের সব শাখাতেই ছিল সৃষ্টির মুখরতা। এ চেতনা নিয়ে, বিশেষ করে যেসব কবি একুশের চেতনাকে অন্তরে ধারণ করে কবিতা লিখেছেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন আহসান হাবীব।

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতায় থাকাকালে যেমনটা করেছিলেন, তেমনি এ সময়ও নিজে লিখেছেন এবং ভাষা-আন্দোলনকে সমর্থন করে—এমন লেখা ছাপিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন—নানাভাবে জ্ঞাপন করেছেন অকুণ্ঠ সমর্থন। একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য পরের বছর তৎকালে ঢাকায় পরিচিত তরুণদের মধ্যে হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে কবি-সাহিত্যিকদের উদ্যোগে *একুশে ফেব্রুয়ারী* (১৯৫৩) নামে একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়, যাতে স্থান পায় ১৮ জন কবির কবিতা। এই সংকলনের মাধ্যমেই প্রথম এ দেশের কবি-সাহিত্যিকেরা নিজেদের মাটি খুঁজে পান। সংকলনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে নানা দিক থেকে। প্রথমত, একুশের চেতনাকে ধারণ করেই সংকলনটি প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয়ত, এর মধ্য দিয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের কবিতা বলতে যাঁদের কবিতা বিবেচনা করা হয়, সেই পঞ্চাশের দশকের প্রধান কবিদের নিয়ে প্রকাশিত হয় সংকলনটি। কেননা, এ সংকলনের বেশির ভাগ কবিই পরবর্তী সময়ে নিজেদের বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৮), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০০), সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫), ফজল শাহাবুদ্দীন (জ. ১৯৩৬) প্রমুখ এ ঐতিহাসিক সংকলনে কবিতা লিখে ঐতিহাসিক মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। এ সংকলনের কবিরাই পরবর্তী পর্যায়ে কাব্যচর্চা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশের কবিতার অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন। নিজেদের প্রতিভার অকৃত্রিম স্বাক্ষর রেখে প্রমাণ করেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের প্রধান কবি। কিন্তু আহসান হাবীব, যিনি বাংলা কবিতায় (অবিভক্ত বাংলাতেও) ততদিনে প্রতিষ্ঠিত এক নাম—কবি হিসেবে, লেখক হিসেবে, সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে। তখন তিনি রীতিমতো পরিচিত বাঙালি মুসলমান পাঠকদের মধ্যে। আর ভাষা-আন্দোলনের সময় ঢাকায় অবস্থান করা সত্ত্বেও ওই সংকলনে তাঁর কবিতা না থাকাটা রহস্যমণ্ডিত, প্রশ্নসাপেক্ষ এবং হতবাক করার মতোও বটে। কেননা, ওই সংকলনে এমন কবির কবিতাও প্রকাশ করা হয়েছে, যাঁর ছিল ওটাই জীবনের প্রথম লেখা কোনো কবিতা—সম্পাদক নিজে সংশোধন করে ছেপেছিলেন, যিনি পরে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন। আবার এমন দুজনের কবিতাও প্রকাশ করা হয়েছে, যাঁরা তার আগে বা পরে কখনো কবিতা লিখেছেন—এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক রবীন্দ্রগবেষক-প্রাবন্ধিক-কবি আহমদ রফিক তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তিনি কিশোরবেলা থেকেই কবিতা লেখেন, তখনো লিখতেন। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন : 'হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে আমারও চেনাজানা ছিল। সংকলন করার সময় আমার সাথে দেখাও হয়েছে। কিন্তু আমার পাশের কক্ষের জামালুদ্দিন এবং সালেহর কাছ থেকে লেখা নিয়েছে, যারা তার আগেও কোনোদিন লেখেনি, পরেও না। অথচ আমার কাছেও লেখা চাওয়া হয়নি। আর আহসান হাবীবের কবিতা ওই সংকলনে স্থান পায়নি, এটা তো অন্যায়। নিশ্চয়ই তাঁর কাছে লেখা চাওয়াই হয়নি। চাইলে তো তিনি অবশ্যই কবিতা দিতেন।'[১৫] এই সংকলনের প্রায় সবাই ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমানের বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয়। তবে আহসান হাবীবের সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য ছিল প্রায় এক প্রজন্মের। তাই এ কথা বলা অসমীচীন হবে না যে সংকলনটি করার ক্ষেত্রে শুধু কবিপ্রতিভা নয়, হয়তো তারুণ্যও প্রাধান্য পেয়েছিল।

তিন

আহসান হাবীব যেহেতু কায়ক্লেশে জীবনযাপন করছিলেন, তাই তাঁকে প্রতিনিয়ত তটস্থ থাকতে হয়েছে জীবিকার তাগিদে। 'ইত্তেহাদ'-এর প্রকাশনা স্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়ার পর আহসান হাবীব 'মাসিক

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদী' আর 'আজাদ'-এর রবিবাসরীয় পাতার দায়িত্ব পালন করছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সেখানকার কর্তৃপক্ষ কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। কবিও ছাঁটাইয়ের তালিকায় পড়েন। এমন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে কবি কেমন দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন, নিজের সংকটকে আড়াল করতে শিখেছিলেন আর হাজারো বৈরী পরিবেশেও তিনি কেমন মার্জিত রুচির পরিচয় দিতেন, তা তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা ছাড়া কেউ আঁচ করতে পারতেন না। সংবাদপত্রে কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনা এখনো বিরল নয়। আহসান হাবীব প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন লিখেছেন :

> আহসান হাবীব তখন মাসিক মোহাম্মদী এবং আজাদের সাহিত্যপাতা একসঙ্গে দেখছেন। হঠাৎ করে পড়ে গেলো ছাঁটাই-এর হিড়িক। এক মাস পর সে অফিসে আর যেতে হবে না, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ...ওঁর চোখে বেদনার ছাপ থাকলেও বিদগ্ধ হাসি জীয়ন্ত দুঠোঁটে। এমনিতে ফিটফাট থাকতে পছন্দ করতেন।...সেই সময় এ অভ্যাস আর এক ডিগ্রী ওপরে উঠলো। পাটভাঙ্গা ধোপ দুরস্ত পোশাক পরে অফিস করছেন। বলতেন ইচ্ছে করেই পরছি। যে কদিন ওখানে আছি রোজ পরবো, নিভাঁজ এমনি পোশাক।[১৬]

এমন পরিস্থিতিতে সাংসারিকভাবে সবাইকে নানা বিড়ম্বনা পোহাতে হয়। কবিও বিড়ম্বনায় পড়েছেন, বিব্রত হয়েছেন, কিন্তু অভ্যস্ততার কারণে কখনো আক্ষেপ করেননি অথবা কাউকে বুঝতে দেননি খুব ঘনিষ্ঠজন ছাড়া। কারণ তিনি শূন্য থেকেই শুরু করেছিলেন তাঁর সংগ্রামী জীবন। সেটা কবি হওয়ার জন্য যেমন, তেমনি টিকে থাকার জন্যও। আহসান হাবীবের কলকাতাজীবনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর তৎকালে *সওগাত*-এর সহযোগী সম্পাদক আবদুল হক তাই প্রাসঙ্গিকভাবে মন্তব্য করেছেন :

> এ-রকম দুর্দিনেও আহসান হাবীব পোশাকে-পরিচ্ছদে ধূমপানে কখনো দারিদ্র্যের পরিচয় দিতেন না। তিনি অনুকম্পা চাইতেন না। অসচ্ছল অবস্থায় তার দিন কাটছে এমন ধারণা থাকা সত্ত্বেও তাকে দেখেছি পনির কিনতে। দারিদ্র্য তাকে অনেক সময় ঘিরে থাকলেও তিনি যে তার কাছে পরাজয় স্বীকার করেন নি এটি তার সুস্থ-সবল মনের পরিচয়। তবে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ*-এর পর তাঁর কবিতায় যে-মন্দাভাব এসেছিল তা যে শুধু মানসিক ভাটার জন্য, তার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের, অথবা সমাজের সাংস্কৃতিক দারিদ্র্যের সম্পর্ক ছিল না এমন কথা বলা কঠিন। আমাদের সমাজ যদি অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হত এবং সংস্কৃতির দিক থেকে উন্নত পর্যায়ে থাকত তা হলে আহসান হাবীব আরো ভালো লিখতেন, তাঁর ব্যক্তিগত মেধা অমন থমকে থাকত না...।[১৭]

ব্যক্তিত্বের এমন পরাকাষ্ঠা খুবই বিরল আমাদের সমাজে। উপার্জনের পরিসর সংকুচিত হলে আর্থিক সংকট মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর থেকে আপাতভাবে বাঁচতে কেউ দেনার হাত বাড়ান না, এমন দৃষ্টান্তও তো সুলভ নয়। কিন্তু আহসান হাবীব ওপথে সহসা পা বাড়াননি। সংকটের কথা তেমন কাউকে বুঝতেও দেননি তিনি খুব কাছের মানুষ ছাড়া। তাই কবি হওয়ার জন্য যাঁর এত ত্যাগ, তিনিও লিপ্ত হয়েছিলেন ফরমায়েশি কাজে। 'আজাদ-মোহাম্মদী' থেকে বেকার হওয়ার পর তাই বিদেশী কবিতা ও গল্পের অনুবাদ, পুস্তক সম্পাদনা, ঢাকা বেতারে ছোটদের জন্য অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন; কখনো-বা লিখেছেন সিনেমার জন্য গান।[১৮] এর সবই ছিল সংগ্রামী জীবনে উপার্জনের পৃথক পৃথক প্রয়াসমাত্র। এমনকি টিকে থাকার জন্য তিনি পুস্তক প্রকাশনা এবং বিক্রয়ের কাজেও হাত দিয়েছিলেন। নিজের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থা 'কথাবিতান' থেকে জহুরুল হকের *সাতসাঁতার* নামক একটি বই বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল তখন। কিন্তু 'কোনো প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানকে চালু রাখতে হলে অনেকগুলি জনপ্রিয় প্রকাশনা চাই; ভালো পুস্তক-বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচুর চাহিদা আছে এমন বইয়ের ভাণ্ডার থাকা চাই। কথাবিতান-এর কোনোটিই ছিল না। ব্যবসা-বৃদ্ধির আরো অনেক বড়ো বড়ো কথা তাঁর জানা ছিল না।'[১৯] তাই চলেনি 'কথাবিতান'। যদিও একপর্যায়ে কবির *ছায়াহরিণ* (১৯৬২), *অরণ্য নীলিমা* (১৯৬২) ও *সারা দুপুর* (১৯৬৪) গ্রন্থ বের হয় তাঁর নিজের প্রকাশনা সংস্থা থেকেই। *লালসালু* উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয় এই 'কথাবিতান' থেকে। এর আগে ১৯৫৪ সালে কবির দ্বিতীয় কন্যা জোহরা নাসরীনের জন্ম হয় (যিনি ২০১১ সালের ১০ আগস্ট তারিখে কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন)। সংসারের কলেবর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তখন বৃদ্ধি পায় কবির সাংসারিক ব্যয়। এটা-সেটা করতে করতে আর কোনো উপায় না পেয়ে, সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত না থাকতে পেরে ১৯৫৭ সালে তিনি যুক্ত হন বাণিজ্যিক প্রকাশনা সংস্থা 'ফ্রাংকলিন প্রোগ্রামসে'। কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত পত্রিকাগুলোর প্রায় সবগুলো থেকে চাকরি হারিয়ে যখন তিনি বেকার, তখনই এ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত হন। এখানে তিনি প্রোডাকশন অ্যাডভাইজার হিসেবে প্রায় সাত বছর দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ের মধ্যে আহসান হাবীব দুজন পুত্রসন্তানের জনক হন। এর একজন উত্তরকালের বাংলাদেশের অন্যতম কথাসাহিত্যিক মঈনুল আহসান সাবের (জ. ১৯৫৮), আরেকজন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী মনজুরুল আহসান জাবের (জ. ১৯৬২)।

১৯৬৪ সালে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এ (দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'দৈনিক বাংলা') সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেওয়ার আগ পর্যন্ত আহসান হাবীব এই প্রকাশনা সংস্থাতেই দায়িত্ব পালন করেছেন। 'দৈনিক পাকিস্তান' ছিল পাকিস্তান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের ট্রাস্টের পত্রিকা (পরে বাংলাদেশ সরকারের)। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮)। এই পত্রিকায় সাহিত্য-সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ার মধ্য দিয়ে আহসান হাবীব কর্মজীবনে প্রথম স্থায়ী চাকরি শুরু করেন। সেটি ছিল কবির জীবনের এক আকস্মিক ঘটনা। এখানে চাকরি পেয়ে আহসান হাবীব সম্মানিত বোধ করেছিলেন। কবি এ পত্রিকায় প্রথম স্থায়ী চাকরি পাওয়া এবং অন্যান্য পত্রিকায় সাহিত্য-সম্পাদকের দায়িত্বটা পত্রিকার জন্য কেমন অগুরুত্বপূর্ণ ছিল ওই প্রসঙ্গে বলেছেন :

> ঢাকায় ফ্রাংকলিন প্রোগ্রামস-এর অফিসে বসে কাজ করছিলাম, একটি ফোন এলো। কথা বলবেন প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন। পর মুহূর্তে শামসুদ্দীন সাহেবের কণ্ঠ। তিনি জানতে চাইলেন, তক্ষুণি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি কি না। জ্বী, আসছি, বলে ফোন রেখে দিলাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম দৈনিক বাংলার জন্য নির্ধারিত বাড়িতে। বেশি কথার দরকার হয়নি, কেন না, প্রস্তাব এলো ওপক্ষ থেকেই, আমার সম্মতির অপেক্ষামাত্র। আমি সানন্দে সম্মতি জানালাম। একটু পরেই নিয়োগপত্র হাতে এলো।...প্রথমত লিখিতভাবে চাকরির যে মান আমার জন্যে নির্ধারিত হলো তা এর আগে আর কোথাও পাইনি। দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনা যখন যিনিই করেছেন কোথাও, তাঁকে প্রায় ফালতু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তাঁর চাকরির কোনো নির্দিষ্ট মান ছিলো না। কোলকাতার ইত্তেহাদে সাহিত্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান হিসেবে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিলো, তা ছিলো প্রধান সম্পাদক আবুল মনসুর-এর ব্যক্তিগত উদার মানসিকতার ফলশ্রুতি, লিখিত কোনো দলিল ছিলো না।[২০]

কবির ৪৭ বছর বয়সে পাওয়া প্রথম স্থায়ী এই চাকরিতে পুরোপুরি না হলেও খানিকটা আর্থিক সচ্ছলতার মুখ কবি দেখতে পেয়েছিলেন। আর কিছু না হোক নিয়মিত বেতন-ভাতা পাওয়ার নিশ্চয়তা তিনি এখান থেকেই পেয়েছিলেন। ঢাকায় এসে কবি সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে যশ-খ্যাতি অর্জন করেন ক্রমান্বয়ে এই পত্রিকার 'রবিবাসরীয় পাতা' প্রকাশের দায়িত্ব পালনের পর থেকেই। আহসান হাবীব এখানে যোগ দেওয়ার পরপরই প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি নতুন লেখকদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে, সম্ভাবনাময় তরুণ লেখকেরাই কবির কাছে প্রাধান্য পেতে থাকেন। ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যের গুণ-মান বিচারে নিষ্ঠা তাঁকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে খ্যাতি ও সম্মান এনে দেয়। তাঁর সম্পাদিত পাতায় লেখকের গুণ বা মান নয়, কেবল লেখার গুণ ও মানই গুরুত্ব পেত। নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন বলেই লেখকেরা এই সাহিত্যপাতায় লেখা ছাপা হওয়াকে লেখক হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতির সনদপ্রাপ্তি হিসেবে বিবেচনা করতেন—নিজেদের গৌরাবান্বিত মনে করতেন। কেননা, ওই সময় আহসান হাবীবের সম্পাদিত সাহিত্যপাতায় লেখা না ছাপা হলে নিজেদের কবি-লেখক হিসেবে ভাবতে কুণ্ঠা বোধ করতেন অনেকে। অন্তত মানের বিচারে লেখা ছাপা হওয়ার নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন তৎকালীন তরুণেরা। কবি তরুণদের আগ্রহ সম্পর্কে বলেছেন :

> তরুণ লেখকরা আসেন, আসেন তরুণ লেখিকারা।...কাঁচা লেখা অনেকেরই, অনেকেরই লেখায় অনেক ত্রুটি, অনেকের লেখাই ছাপানো যাবে না। কিন্তু কি আগ্রহ লেখক হয়ে ওঠার, আর কি আত্মবিশ্বাস। আমাদের সাহিত্যে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার কথা যতই বলি না কেন, এই আগ্রহ আর আত্মবিশ্বাসই একদিন সব কুয়াশা মুছে ফেলবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আর থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের একটি ছাত্রীও যখন ঘোষণা করেন, মহিলা লেখিকা বলে দয়া চাই না, সামগ্রিকভাবে সবার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যদি টিকে যাই তবেই আমাকে জায়গা দেবেন আপনার বিভাগে, নইলে লিখে কী হবে, তখন গৌরববোধ করি।[২১]

আবার মানের বিচারে লেখা প্রকাশ না হওয়ায় কবি বিরাগভাজনও হয়েছেন অগণন মানুষের কাছে। কেননা, লেখা অমনোনীত হলে কেউ ক্ষুব্ধ হয়েছেন কেউ-বা সাহিত্য-সম্পাদক আহসান হাবীবের লেখা বিচারের ক্ষমতা-দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন। কেউ-বা ধারণা করেছেন টাকা দিলেই হয়তো লেখা মনোনয়ন পাবে ছাপা হওয়ার জন্য। কেউ-বা পাঠিয়েছেন অশ্রাব্য ভাষায় লেখা চিঠি। কেউ করেছেন আরও নিষ্ঠুর আচরণ। তাই বলতে হবে, এ পত্রিকায় লেখা সম্পাদনা করে ছাপানো নিয়ে কবির অর্জিত হয়েছিল মিশ্র স্বাদের অভিজ্ঞতা। 'দৈনিক বাংলা'য় লেখা অমনোনীত হলে যে কবি তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন, তার প্রমাণ দিয়েছেন কবি তাঁর লেখায় :

> লেখা ছাপানোর জন্যে কি হারে, কত টাকা লাগবে জানতে চেয়ে যেমন চিঠি আসে, কেউ কেউ আবার পূর্বাহ্নেই লেখার সঙ্গেই পোস্টাল অর্ডার পাঠিয়ে দেন। বার বার ডাকে লেখা পাঠিয়েও লেখা ছাপা না হলে সবশেষে যে চিঠিটি আসে সেটিতে কবিতা বা গল্প থাকে না, থাকে অশ্লীল গালাগাল ভর্তি একটি চিঠি কখনো ব্লেড খামের মধ্যে।[২২]

অন্যকিছু নয়, কবি হওয়া আর সাহিত্যসেবা করার জন্য আমাদের দেশে যদি কেউ মন-প্রাণ উজাড় করে ধ্যান-জ্ঞান করে থাকেন, সেটা আহসান হাবীব। কর্মজীবনের প্রতিটি সময়, সম্পাদনার দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশে পৃথকভাবে পূর্ণাঙ্গ একটি সাহিত্যপত্রিকার খুব অভাব বোধ করেছেন। বিশেষ করে ওই সময় তরুণ ও উঠতি বয়সী লেখকদের উৎসাহিত করার মতো সাহিত্যবিষয়ক একটিও মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছিল না পূর্ববাংলায়। অথচ তরুণদের অপার সম্ভাবনা দেখেছেন তিনি স্বাপ্নিক চোখে। তিনি বলেন :

> আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এতদিনেও এমন একটি মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা আমরা পেলাম না যে পত্রিকায় একটি লেখা ছাপানোর জন্যে উঠতি লেখকেরা দিনরাত সাধনা করবেন, সতর্ক পরিচর্যা করবেন নিজের লেখার। তেমন একটি পত্রিকা যে পত্রিকায় একটি লেখা ছপানোর জন্যে যে কোনো তরুণ লেখক স্বপ্ন পুষবেন মনে মনে।...ইতিমধ্যেই তরুণ লেখকরা এসে আমার চারপাশে জড়ো হয়েছেন দিনে দিনে। তাঁরা আমাকে ভালোবাসেন, আমার ওপরে ভরসা করেন।...কি করে ফেরাবো এঁদের?...দৈনিক বাংলার, তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানের সাহিত্য বিভাগের দু তিনটি পৃষ্ঠা প্রবীণদের লেখায় ভরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে চাকরি করতে পারতাম। উৎসাহে উদ্দীপনায় এবং আমার প্রতি অকুণ্ঠ দাবির জোরে...দিনে দিনে এই তরুণরাই কি করে যেন তাঁদের মনোরম মুঠোয় আমাকে বন্দী করে নিলেন।...আমার মনোযোগ এবং ভালোবাসা তাঁরা কেড়ে নিলেন, নিজেদের ক্ষমতায়। সাহিত্য বিভাগের অর্ধাংশ আবার কখনো তিন চতুর্থাংশ জুড়ে অতঃপর তাঁদেরই অবস্থান।[২৩]

সেই কারণে সেই সময়ের তরুণেরা, যাঁরা পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন লেখক হিসেবে, তাঁদের কেউ শিক্ষক হিসেবে, কেউ অভিভাবক হিসেবে, কেউ-বা বন্ধু হিসেবে আহসান হাবীবের কৃতিত্বকে

Dhaka University Institutional Repository

স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছেন। ওই সময়ের তরুণেরা অকপটে স্বীকার করেছেন লেখক তৈরির ক্ষেত্রে 'দৈনিক বাংলা'র সাহিত্যপাতার মধ্য দিয়ে আহসান হাবীবের অবদানের কথা। এমনকি কীভাবে অল্প সময়ে তরুণদের তিনি অতি আপন করে নিয়েছেন, তার দৃষ্টান্তও ভূরিভূরি। যেসব তরুণ তাঁর খুব কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা জীবনাচরণও শিখেছেন তাঁর কাছ থেকে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনেক সময় তাঁকে বৈরী আচরণ সহ্য করতে হয়েছে। যেমন তাঁর বসার জন্য যে কক্ষটি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, সেটি ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম পরিসরের। মাফরুহা চৌধুরী আর তিনি বসতেন ওই কক্ষে। অথচ তার প্রায় দেড় যুগ আগে 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় তাঁর জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষটিও ছিল 'দৈনিক বাংলা'র চেয়ে বড় আয়তনের। তখনকার এক তরুণ, পরে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আবু কায়সার লিখেছেন এ প্রসঙ্গে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় আহসান হাবীবের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি এক প্রবন্ধে লিখেছেন:

> ...আহসান হাবীবের মতো নামকরা কবি ও সাহিত্য-সম্পাদকের সহযোগী হিসেবে কোনোদিন দায়িত্ব পালন করবো—এ ছিলো আশাতীত। আহসান হাবীব আস্তে আস্তে কীভাবে আমার হাবীব ভাই হয়ে উঠলেন, মনে নেই।...আহসান হাবীব তখন দৈনিক পাকিস্তানের প্রধান আকর্ষণ। কতোজন তাঁকে কেবল একনজর দেখতে আসতো! কিন্তু এমন মানুষকেও কয়েকজন সহকর্মী এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রায়শ দুর্ব্যবহার পেতে দেখেছি। পায়রার খোপের মতো একটির খুপরির মধ্যে বসে কাজ করতেন। প্রয়োজনীয় মাপের একখানা রুম তাঁকে কখনো বরাদ্দ করা হয়নি। ক্যাপস্টান ছিলো হাবীব ভাইয়ের ব্রান্ড! একদিন আমাকে হতবাক করে প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। বললেন, খাও খাও, সঙ্কোচ কীসের ! ইউনিভার্সিটিতে পড়ো—কবিতা লেখো—ধূমপানে দ্বিধা কেন; যা খাবেই, তা লুকিয়ে খেয়ে লাভ কি?...বলতেন, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে ভালো আছি। যদি তুমি শারীরিক বা মানসিকভাবে ভালো না-ও থাকো তখন—তবু বলবে ভালো আছি।[২৪]

এভাবে তিনি তরুণদের আগলে রাখতেন আর শেখাতেন জীবনাচারণ। শুধু তা-ই নয়, কোনো কোনো কবি বা লেখককে হাতে-কলমেও শিখিয়েছেন—এমন দৃষ্টান্তও আছে অগণন। সে সময় 'দৈনিক বাংলা' বা 'দৈনিক পাকিস্তানে' লেখা না ছাপা হলে লেখকদের নিজেদের কাছেই লেখক মনে হতো না। কারণ আহসান হাবীব ঢাকায় এসে যাঁদের তরুণ হিসেবে পেয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই শিক্ষাজীবনের কোনো-না-কোনো স্তরে স্কুল বা কলেজে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হিসেবে তাঁর কবিতা পড়েছেন। তাঁরাই যখন চাক্ষুষ করছেন কবিকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আহসান হাবীব ছিলেন তাঁদের কাছে পরম এক কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। আর যখন তাঁরা লেখালেখি করছেন, অথচ আহসান হাবীবের সম্পাদিত পত্রিকায় লেখা ছাপা না হলে মানসিক প্রশান্তি আসবে না, এটা স্বাভাবিক। তা ছাড়া তাঁর সম্পাদনা, লেখা নির্বাচনে যে নির্মোহতা ছিল, তাতে তরুণদের আস্থা তিনি অর্জন করেছিলেন আগে থেকেই। তিনি শুধু সম্পাদক ছিলেন না, তরুণ লেখকদের পিতৃসুলভ স্নেহ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। 'আমার বিবেচনায় আহসান হাবীব ছিলেন আমাদের সাহিত্য জগতের সেইসব বিরল প্রাণীদের একজন যিনি মনে প্রাণে ছিলেন আধুনিক, চির তরুণ এবং তরুণদের বন্ধু।'[২৫] বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনের নবাগত কবিদের পরিচর্যায় আহসান হাবীবের যে কৃতিত্ব, তার জুড়ি মেলাভার। তরুণ লেখকদের কাছে কীভাবে তিনি আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন, তার একটি দৃষ্টান্ত :

> কবি আহসান হাবীবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে স্কুল বয়সের শুরুর দিকে। এখনো সেই কবিতাটি মনে করতে পারি, 'মেঘনা পারের ছেলে আমি মেঘনা পারের নেয়ে/তালে তালে তালের নৌকা দু'হাতে যাই বেয়ে।'...তারপর ওপরের ক্লাসগুলোতে তার একাধিক কবিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটার পর দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন মহকুমা শহরের পাবলিক লাইব্রেরীতে আবিষ্কার করি তার কবিতার বই 'সারাদুপুর'।...বাংলা কবিতার জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে সত্তর দশক হচ্ছে একটি কিংবদন্তির কাল। তো একাধিক লিটল ম্যাগাজিন ও দু'একটি দৈনিকের সাহিত্যপাতায় তখন আমার লেখা ছাপা হয়েছে, এমনকি কণ্ঠস্বর সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের হাত দিয়ে উৎরে যাওয়ার পরও দৈনিক বাংলায় আমার কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়নি।...দৈনিক বাংলায় কবিতা প্রকাশিত না হলে কবি বলে স্বীকার করা হয় না—ভাবতে ভাবতে আমার বোধোদয় হয়েছিলো তিনি নিশ্চয়ই একমাত্র, যার হাতে উৎরে যেতে পারলে অন্তত এটুকু স্বস্তি লাভ করা যায় যে সফলভাবে শুরু করতে পেরেছি।[২৬]

আহসান হাবীবের সঙ্গে এই লেখকের পরে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় কবি নির্মলেন্দু গুণের (জ. ১৯৪৫) মাধ্যমে। পরিচিত হওয়ার পর লেখা দিতে বলেন তাঁকে। কবিতা পড়ার পর কবির মনে হয়েছে যে এই তরুণের কবিতায় ছন্দে ভুল রয়েছে। অল্প পরিচিত এই লেখককে কীভাবে কবি ছন্দে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন, সে সম্পর্কে লেখক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অকপটে স্বীকার করেছেন :

...আমার কবিতার ওপর লাল কলম দিয়ে কতগুলো শব্দের চারপাশে গোল দাগ দিলেন। তারপর বোঝাতে শুরু করলেন ছন্দ। মুহূর্তেই নিজের ত্রুটি চোখে পড়ায় যুগপৎ লজ্জিত এবং আনন্দিত হই। কারণ ছন্দ সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম না। সেদিন তিনি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে আমাকে ছন্দ বুঝিয়েছিলেন। পিতার বয়েসী এক কবি ও সম্পাদকের মুখোমুখি বসে ছন্দ শেখার বিষয়টা আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর অন্যতম। আমার বড়ো উপকার করেছিলেন তিনি। সেই থেকে আমার আর কোনোদিন ছন্দ ভুল হয়নি।[২৭]

দেশের সেরা এবং সরকারি দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদকের কী অপিরিসীম দায়িত্ববোধ থাকলে তিনি সম্ভাবনাময় লেখকদের এমন সযত্ন পরিচর্যা করতে পারেন, তা বর্তমান সময়ে শুধু নয়, আমাদের সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে বিরল। তিনি স্থায়ী চাকরিতে সমাসীন থেকে, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা প্রকাশ করে, উদাসীনতার আশ্রয় নিয়ে, শুধু দায়িত্বের জন্য দায়িত্বও পালন করতে পারতেন নানা অযুহাতে এবং এতে কষ্ট অনেক লাঘব হতো তাঁর; তাতে বেতন-ভাতাও কমে যেত না। এমনকি যত সময় তিনি 'দৈনিক বাংলা'য় বসে তরুণ লেখকদের দিয়েছেন, সেখান থেকে সময় বাঁচিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয়ে তিনি অতিরিক্ত কাজের সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন। সেটি করলে কবির আর্থিক সংকটের সংসারে হয়তো বাড়তি সচ্ছলতা যোগ হতো; পরিবারের সদস্যরা এতে বোধ করি আনন্দিতই হতেন। আসলে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার তাগিদ ছিল তাঁর মজ্জাগত। আত্মতাগিদেই তিনি ভবিষ্যৎপ্রজন্মের বাতাবরণ নির্মাণ করে গেছেন। এমনকি শুধু শহরের তরুণেরাই নন, মফস্বলের তরুণেরাও যাতে লেখক হিসেবে উঠে আসতে পারেন, আহসান হাবীব সে বিষয়টিও আন্তরিকতার সঙ্গে ভেবেছেন। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন এক তরুণ কবি, যিনি ছিলেন 'দৈনিক বাংলা'র সাহিত্যপাতার সম্পাদকের সহকারী, তাঁর কথা :

...কী গভীর আশায় তাঁকে লতার মতো জড়িয়ে ছিলো এদেশের তরুণ সাহিত্য যশোপ্রার্থীরা। একটি বৃক্ষের মতো তিনি ধারণ করেছিলেন সেই সব অপরিণত লতাগুলোকে। আর সে কারণেই প্রায় প্রতি সংখ্যায় বাধ্যতামূলক ছিলো তাঁর পাতায় সম্ভাবনাময় তরুণ লেখকদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। দূর মফস্বলের তরুণদের লেখা যাতে কম ছাপা না হয় সে জন্য আমার প্রতি নির্দেশ ছিলো মফস্বলের লেখকদের জন্য পৃথক ফাইল করা। এবং প্রতি সংখ্যায় যেন এক দুজন মফস্বলের লেখকের লেখা ছাপা যায়, সে জন্য তাঁর কাছে সাবমিট করা।[২৮]

কেননা, যেসব লেখক ঢাকায় বসবাস করতেন বা ঢাকায় যাঁদের ছিল স্থায়ী বাসস্থান, তাঁরা প্রায় প্রতিদিন খোঁজখবর নিতেন। তাঁদের লেখাই বেশি প্রকাশিত হতো। যদি এসব লেখকের চাপে দূরের লেখকের লেখা হারিয়ে যায়, সেই আশঙ্কা থেকেই ছিল আলাদা ফাইলের ব্যবস্থা। প্রতিভাবান নবীন লেখকদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান আশ্রয় ছোটকাগজের লেখা যাতে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেজন্য আহসান হাবীব 'পত্রপত্রিকা' নামের নিয়মিত কলামটিকে ১৯৮০ সাল থেকে আরও প্রশস্ত করেছিলেন।

তবে বিপত্তি ঘটত প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা অমনোনীত হলে। পরিচিত বা প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা সহজে তাঁদের অমনোনীত লেখার দায়ভার নিতে পারতেন না। তাঁদের ভেতরে হয়তো একধরনের অহমিকা কাজ করত। তাঁরা মনে করতেন, সাহিত্যজগতে যতটুকু পরিচিতি এসে গেছে, তাতে তাঁদের যেকোনো লেখাই ছাপা হবে। কিন্তু মাঝেমধ্যে পরিচিত লেখকদের লেখা না ছাপানোয় কবি-সম্পাদক আহসান হাবীবকে নানা কটূক্তি শুনতে হয়েছে। হতে হয়েছে নিষ্ঠুর পরিস্থিতির মুখোমুখি। তাতেও বিচলিত হননি তিনি। বরং লেখার মাধ্যমে তাঁকে কেউ আক্রমণ করলেও তা স্বাভাবিকভাবে সহ্য করে ইস্পাতকঠিন ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবু লেখার বিষয়ে আপস তিনি করেননি। কারণ আহসান হাবীবের কাছে লেখকের চেয়ে লেখার মানের গুরুত্বই প্রাধান্য পেত। কোলহালমুক্ত নিভৃতচারী কবি-সম্পাদক আহসান হাবীব তাই আমাদের দেশের সাহিত্যাঙ্গনে সব সময়ের জন্য নমস্য হয়েই থাকবেন। কবি নাসির আহমেদ লিখেছেন :

> এত বড় সৃজনশীল সাহিত্য সম্পাদক আমরা আর পাইনি। এ কথা বলছি এ কারণে যে, তিনি নিজের কবিতাকে যেমন নিবিড় নিমগ্নতায় সৃষ্টি করতেন, সমান যত্নে সৃষ্টি করতেন সম্ভাবনাময় লেখক-কবিও। এত বড় সাহসী সম্পাদকও তাঁর আগে কিংবা পরে পাওয়া যাবে কিনা জানি না। লেখা যদি লেখা মনে না হতো, কখনো আহসান হাবীব তা ছাপতেন না। লেখকের সামাজিক পরিচিতি বা সামাজিক অবস্থানের চেয়ে তাঁর কাছে বড় ছিল লেখার গুণগত মানই।...লেখকের নাম কিংবা খ্যাতির গুরুত্ব দিতেন না। লেখাটিই ছিলো তাঁর বিবেচ্য। সে কারণে বেশ কিছু লেখকের কাছে অপ্রিয় হয়েছিলেন। হয়েছিলেন তাঁদের কারো কারো ব্যক্তিগত ক্ষোভজনিত কুটিলতার শিকারও। একবার এমন এক প্রাবন্ধিকের একটি রচনা ফেরত দিয়েছিলেন, এই প্রত্যাখ্যানে যিনি রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন এবং একাডেমিক উচ্চশিক্ষার গৌরবে কিছুটা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেই লেখাটি ফেরত নিয়ে গিয়েছিলেন।...প্রবন্ধ লিখে তিনি হাবীব ভাইকে নাকচ করতে চেয়েছেন। এ ধরনের ঘটনা এক নয়, একাধিক দেখেছি। আবার এর উল্টোটিও দেখেছি। দেখেছি তাঁর কাছে শ্রদ্ধায় নত বহু প্রতিভাবান ব্যক্তিকে।[২৯]

আহসান হাবীব ছিলেন কঠোর সাহিত্য-সম্পাদক। কারো অনুরোধ-উপরোধে প্রভাবিত হয়ে তিনি লেখা প্রকাশের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। লেখা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো পরিচিত মুখ তাঁর কাছে গুরুত্ব পেত না। মনোনয়নের ক্ষেত্রে লেখার মান ভালো না হলে মাঝেমাধ্যে 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদকের সুপারিশও বাস্তবায়িত হয়নি—

> একবার একটি লেখা তিনি অমনোনীত করেছিলেন, যা ছিলো তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কেননা সেই লেখক একদিকে স্বনামখ্যাত প্রবীণ, অন্যদিকে তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে সম্পর্কিত, সর্বোপরি দৈনিক বাংলার তৎকালীন সম্পাদক সাহেবের মাধ্যমে এসেছে লেখাটি, তিনিও সহৃদয় বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছেন লেখাটির এক কোণে লাল কালিতে। তা ছাড়া যাকে নিয়ে লেখা; তা অবশ্যই ছাপা দরকার। একটি ন্যাশনাল সেন্টিমেন্ট জড়িত এই লেখাটির সঙ্গে। অথচ লেখাটি মুদ্রণযোগ্য নয়। কী কঠিন সংকটময় মুহূর্ত। কিছুটা দ্বিধা সংশয়ের ঝড়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন কবি আহসান হাবীব কিন্তু সম্পাদক আহসান হাবীব জিতে গিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত।[৩০]

এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে 'দৈনিক বাংলা'র সাহিত্য-সম্পাদক আহসান হাবীবের সম্পাদনা-সম্পর্কিত লেখা মনোনয়নের বিষয়ে। এটা ঠিক যে আহসান হাবীবের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রিসম্পন্ন 'প্রাবন্ধিকদের' পর্যায়ে ছিল না। তাই বলে তাঁর জানাশোনার গণ্ডি কিন্তু মোটেও সীমিত ছিল না। কারণ ক্ল্যাসিক ও সমকালীন বিশ্বসাহিত্য থেকে শুরু করে বৈষ্ণব পদাবলী, মাইকেল মদসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশি-বিদেশি সমকালীন পত্র-পত্রিকা কোনো কিছুই তাঁর নিবিড় পাঠের

Dhaka University Institutional Repository

বাইরে ছিল না। এমনকি বিদেশি সাহিত্যের অজস্র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ওই সময় ফরমাশি লেখা হিসেবে। কবি হওয়ার জন্য, লেখক হওয়ার জন্য জানাশোনা অপরিহার্য হলেও প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া যে কখনই খুব বেশি বড় বাধা হয়ে দেখা দেয়নি, তার দৃষ্টান্ত অন্যান্য সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যেও আছে অগণন। তবে কবি হিসেবে তিনি মাঝেমাধ্যে খ্যাতিমান লেখকদের লেখা নিয়ে দ্বিধায় পড়লেও সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোনো পরিচিত মুখকে প্রাধান্য দেননি।

'দৈনিক বাংলা'য় কর্মরত থাকাকালে কলকাতায় থাকা অবস্থায় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন—এমন কয়েকজনের লেখাও তিনি অমনোনীত করেছিলেন লেখার মান খারাপ বলে। এ প্রসঙ্গেও কবি নাসির আহমেদের বক্তব্য উল্লেখ করার মতো :

> ...আর একজন প্রবীণ নজরুল গবেষক—যাঁর সঙ্গে হাবীব ভাই'র পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা প্রায় ৪০ বছরের। কোলকাতা জীবনের বহু উজ্জ্বল স্মৃতি আছে তাঁর সঙ্গে। হাবীব ভাই তাঁকে মুরুব্বির মতো শ্রদ্ধা করতেন। বলতে দ্বিধা নেই—হাবীব ভাই তাঁর স্নেহ-ভালবাসার ঋণে ঋণী থাকার কথাও স্বীকার করেছেন। অথচ নজরুল বিষয়ে উনি একটি লেখা পাঠিয়েছেন। নজরুল জয়ন্তী সংখ্যা দৈনিক বাংলার জন্য। কিন্তু ছাপার যোগ্য নয় লেখাটি। বেশ কয়েকবার পড়লাম। শুনলেন তিনি। বড় অস্বস্তির ব্যাপার। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্, মাফরুহা চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করলেন। এ লেখা কী করে ছাপা যায়? যায় না। হাবীব ভাই অন্তর্দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে বললেন: ফাইলে রেখে দাও।...সেই প্রিয়জন একদিন হাবীব ভাইকে ফোন করেছিলেন লেখাটি ছাপা না হবার কারণ জানতে। হাবীব ভাই এত সুন্দরভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বললেন কারণগুলো, সেই প্রবীণ লেখকের মুখ না দেখেও আমার মনে হয়েছে তিনি আর রুষ্ট হতে পরেন না।[৩১]

'দৈনিক বাংলা'র সাহিত্যপাতা ছিল বাংলাদেশের সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে আহসান হাবীবের স্বেচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত লেখক তৈরি আর পরিশীলনের নির্ভরযোগ্য আশ্রম। পারতপক্ষে কোনো সম্ভাবনাময় লেখক বিমুখ হননি সেখান থেকে। বরং ওই সময়ের লেখকেরা সমকালের প্রেক্ষাপটে খাপ-খাওয়ানোর পাশাপাশি নিজেকে মেলে ধরার নিশ্চিন্ত প্ল্যাটফর্ম পেয়েছিলেন।

কবি শামসুর রাহমানও তরুণদের লেখা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আহসান হাবীবের কঠোরতা সম্পর্কে লিখেছেন :

> ...যে লেখকের মধ্যে তিনি শৈল্পিক গুণাবলীর পরিচয় পেয়েছেন তাঁর লেখা প্রকাশ করেছেন নির্দ্বিধায়, আনন্দিত চিত্তে, আর যাঁকে মনে হয়েছে নির্গুণ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন অকুণ্ঠ নিস্পৃহতায়।...আহসান হাবীব তখন ইত্তেহাদের সাহিত্য সম্পাদক। তিনি তরুণ কবির একটি কবিতা ছাপতে রাজী হননি, অথচ তিনি নিজেই তার কাছ থেকে কবিতা চেয়েছিলেন। কবিতাটি আহসান হাবীবের পছন্দ হয়নি। একথা তিনি সরাসরি তাকে জানিয়ে দিলেন। তরুণ কবির যশ কিংবা প্রতিষ্ঠার কথা তিনি আমলে আনেননি।...তিনি তরুণ কবির লেখার অনুরক্ত পাঠক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছে যে কবিতা অগ্রাহ্য মনে হয়েছে তা বাতিল করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি।[৩২]

'দৈনিক বাংলা'র সাহিত্যপাতার কাজটি যে তাঁর জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। নাসির আহমেদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় জেনেছি, তিনি শেষ জীবনে ক্রমান্বয়ে দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। তখন কবি নাসির আহমেদ প্রতিটি লেখা পড়তেন আর আহসান হাবীব শুনে শুনেই নিখুঁতভাবে লেখা বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করতেন। অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় নাসির আহমেদকে সাহিত্যপাতার মান যেন খারাপ না হয়, সে-জন্য বারবার তাগিদ দিয়ে গেছেন। এমনকি লেখকদের সম্মান যেন যথাযথভাবে রক্ষিত হয়, হাসপাতালে অবস্থানকালে সেই কথাটিও ভুলে যাননি আহসান হাবীব। কারণ সম্মানী আর পত্রিকার সৌজন্য কপি লেখকদের বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছানোর চেষ্টা তবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'নাসির লেখকরা অফিসে এসেই

Dhaka University Institutional Repository

টাকা নিক কি আর করা যাবে, তবে বিলটা যাতে কোনো মতেই দেরি না হয় দেখো।'[৩৩] এমনকি ১৯৮৫ সালের জুন মাসে লেখক-সম্মানীর বিলে সই করেছিলেন তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায়। নাসির আহমেদ স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন :

> ...ভাবতে গেলে এখনো চোখের পাতা ঝাপসা হয়ে আসে, হাসপাতালে যখন তাঁর নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে, তখনো প্রকাশিতব্য ১২ জুলাই ১৯৮৫ তারিখের 'সাহিত্য পৃষ্ঠা যেন খারাপ না হয়, যেন মেকাপ দেখে কেউ বুঝতে না পারে' তিনি মেকাপ করেন নি, এই সাবধানবাণী বার বার উচ্চারণ করেছিলেন আমার উদ্দেশে।...একজন পিতার মতো অভিভাবক আহসান হাবীবের জন্য মন হাহাকার করে ওঠে—যিনি সম্ভাবনাময় তরুণ লেখকটি দুপুরের খাবার হয়েছে কিনা, মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তার অর্থকষ্ট দূর করতেও চেষ্টা করতেন সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা দিয়ে। এমন সম্পাদক কি দশকে দশকে আসে সাহিত্যে?[৩৪]

চার

গোটা ষাটের দশক ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অস্থিরতার সময়। তার মাঝমাঝি (১৯৬৪) সময়ে সাহিত্যপাতার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে কবি কোলাহলমুক্ত থেকে নীরবে-নিভৃতে ভবিষ্যৎপ্রজন্মকে কলমসৈনিক বানিয়ে, ভাষা-সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল সমৃদ্ধিতে চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশমাতৃকার জন্য অভাবনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই সাহিত্যসেবার ব্রত পালনে তাঁকে নিজে নিজেই পথ নির্মাণ করতে হয়েছিল। আবার তাঁর দেখানো অকৃত্রিম পথে যে খুব বেশি কেউ হেঁটেছেন, এমন উদাহরণ দেখা যায় না। লেখক সৃষ্টিতে আহসান হাবীবের পদাঙ্ক কেউ অনুসরণ করতে পারেননি। অন্তত সাময়িকপত্রের ইতিহাসে তিনি এখনো অনুসরণ করার মতো কবি-সম্পাদক। কেননা, ওই সময় যাঁরা কবি আহসান হাবীবের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই পরে নিজেদের প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক এবং স্বাধীনতার পক্ষের প্রজন্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। আহসান হাবীবের হাতে গড়া বা 'দৈনিক বাংলা'র লেখক হিসেবে এখনো তাঁরা গর্ববোধ করেন; আহসান হাবীবের মতো ব্যক্তিত্বের অভাব বোধ করেন। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান একজন, যিনি একসময় আহসান হাবীবের 'সেক্রেটারি'র কাজ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারও আগে কলকাতায় তিনি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র, তখন প্রায়ই খায়রুল বাশার নামের এক বন্ধুকে নিয়ে কবির বাসায় যেতেন আড্ডা দিতে। অতটুকু বয়সী হলেও কবি তাঁদের খুব আন্তরিকতার সঙ্গে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। এমনকি নিজের লেখাসহ ছাপানো অনেক লেখা সম্পর্কে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানতে উৎসাহিত করতেন। মূলত প্রাবন্ধিক-গবেষক আনিসুজ্জামানের লেখক হিসেবে হাতেখড়ি আহসান হাবীবের হাতে গল্পলেখক হিসেবে। কিন্তু প্রবন্ধের হাত ভালো, তাই আনিসুজ্জামানের কাছ থেকে তিনি কৌশলে প্রবন্ধই লিখিয়ে নিয়েছেন। আহসান হাবীব সম্পর্কে স্মৃতিচারণায় আনিসুজ্জামান লিখেছেন :

> তিনি তখন 'আজাদ' পত্রিকার সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা করেন, খুব সম্ভব 'মাসিক মোহাম্মদী' সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত। ১৯৫১ সালে তিনটে টুকরো গল্প দিয়েছিলাম 'আজাদে', একই শিরোনামে। তাঁর মধ্যে দুটি ছেপে দিয়ে 'আজাদের' সাহিত্য পাতায় আমাকে পরিচিত করে দিলেন। লেখা ছাপা ছাড়াও মুখে অনেক উৎসাহ দিয়েছেন—আমার মতো আরও বহু নতুন লেখককে। এটা তাঁর বিশেষ গুণ ছিল। তাঁর এই গুণের জন্যেই অনেকে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।...কোলাহল এড়িয়ে আপন ধ্যানে মগ্ন থেকেছেন বেশির ভাগ সময়। তাই বলে সমাজকে ভোলেননি। আন্দোলিত হয়েছেন বড় ঘটনায়—মন্বন্তর থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক হিসেবে আহসান হাবীবের অন্যতম প্রধান গুণ ছিল লেখকের প্রতিভাকে পাঠ করার ক্ষমতা। কার দ্বারা কী লেখা সম্ভব হবে, ভবিষ্যতে সাহিত্যের কোন শাখায় একজন লেখক তাঁর সত্তাকে খুঁজে পাবেন, তা তিনি আগে থেকেই বুঝতে পারতেন। আবার কারো দ্বারা যদি কোনোদিনই লেখক হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তা-ও তিনি বুঝে ফেলতেন। এমন ব্যক্তিকে লেখালেখিতে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে অন্য কিছুতে সময় ব্যয় করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এমন ঘটনাও ঘটেছে, কেউ হয়তো গল্প দিয়ে গেছেন। গল্পটি মানসম্পন্ন বলে হয়তো ছাপাও হয়েছে, কিন্তু পরে হয়তো তিনি তাঁকে ডেকে বলেছেন প্রবন্ধ লিখতে। পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে তিনি ঠিক প্রাবন্ধিক হিসেবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। একজন সত্যিকারের ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো জীবনে এ রকম বহু ঘটনা ঘটিয়েছেন সাহিত্য-সম্পাদক কবি আহসান হাবীব। এমন একজন খ্যাতিমান প্রবন্ধিক-গবেষক আহমদ রফিক (জ. ১৯২৯)। যিনি কিশোর বয়স থেকে লেখালেখি শুরু করলেও নিজেকে 'দৈনিক বাংলা'র লেখক হিসেবে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এখনো। ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম এই সংগঠক ছোটবেলা থেকে নিয়মিত কবিতা লিখতেন। ঢাকায় আসার পরপরই লেখালেখির সুবাদে আহমদ রফিক কবির খুব কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পান। সম্পর্কটি ঘনিষ্ঠ হয়েছিল কবি 'দৈনিক বাংলা'য় সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত থাকার সময়ে। আহমদ রফিকের বহু লেখাই ছাপা হয়েছে 'দৈনিক বাংলা'র সাহিত্যপাতায়। কিন্তু কবিতা ছাপা হয়নি একটিও। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন :

> কবিতাও নিয়মিত লিখতাম। কিন্তু পত্রপাত্রিকায় তেমন ছাপা হতো না। কারণ আহসান হাবীব চাইতেন আমি প্রবন্ধ লিখি। এমনকি কবি ডেকে নিয়ে দেখাতেন, 'এই যে ড্রয়ার ভরা কবিতা। তার থেকে বাছাই করাই খুব মুশকিল। কাজেই আপনার কাছে কবিতা চাই না। আপনি প্রবন্ধ দেন।' সেই থেকে প্রাবন্ধিক পরিচিতি হয়ে গেল আমার। আর কবি পরিচিতিটা একেবারে বাইরে রয়ে গেল।[৩৬]

নীতির প্রশ্নে আপসহীন, ব্যক্তিত্বে দৃঢ়চেতা, সামাজিকতায় অমলিন আহসান হাবীব লেখক হিসেবে কোনোকিছুর মোহেই নিজের সাহিত্যপাতার মান খোয়াতে রাজি ছিলেন না। 'উমেদারী' লেখা প্রকাশে কোনো আগ্রহ ছিল না তাঁর। আর ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি দেখতেন অভিনব কৌশলে। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতায় জর্জরিত হলেও সে-সম্পর্কে তিনি কখনো মুখ খোলেননি। ব্যক্তিগত সুখের প্রত্যাশায় তিনি স্বপ্নও বুনতেন না। বরং তাঁর স্নেহধন্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলতেন, 'আমি সামান্য সুখকে অনেক বড় করে এবং অনেক বড় দুঃখকে লক্ষ লক্ষ দুঃখী মানুষের তুলনায় ক্ষুদ্র করে দেখার চেষ্টা করেছি। সেদিক থেকে এ জীবনে সুখীই বলতে পারি।' এমন একজন ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করার সাধ্য কার? এ সমাজে যখন প্রতিষ্ঠা আর আর্থিক প্রতিপত্তি নিয়ে চলছে অশালীন প্রতিযোগিতা, চলছে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতিমান হওয়ার নোংরামি, তখন আহসান হাবীবের জীবনচেতনা অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্তও। ষাটের দশকের অন্যতম খ্যাতিমান কবি মহাদেব সাহা (জ. ১৯৪৪) আহসান হাবীব সম্পর্কে লিখেছেন এভাবে :

> আমাদের সময় আহসান হাবীবই বোধ হয় সেই বিরল কবিদের একজন যিনি এই কপট সময়ের সকল মিথ্যা ও কপটাচার থেকে সযত্নে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। কোনো কিছুর বিনিময়েই তিনি নিজের আত্মাকে কলুষিত হতে দেননি।...বাইরে থেকে দেখলে তাঁকে হয়তো তেমন ঝাঁঝালো সংগ্রামী মনে হতো না, মনে হতো অনেকটা আত্মমগ্ন, প্রেমিক, অনেকটা নিরীহ, উদাসীন, বিষণ্ন। কিন্তু তিনি অন্তরে লালন করতেন সৎ কবির বিশুদ্ধ ও বিপুল আগুন। আর তা-ই তাঁকে নিজের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে এমন নিরন্তর সংগ্রামে উৎসাহ যুগিয়েছিলো। বড়ো হয়ে ওঠার জন্যে, বা অপরের প্রিয় হয়ে ওঠার জন্যে, কিংবা সর্বত্র পরিচিত হয়ে ওঠার জন্যে কখনোই ব্যগ্র ও তৎপর হয়ে ওঠেননি।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সর্বদাই ছিলেন কৌশল ও কপটতা থেকে দূরে। এজন্য প্রাপ্য সম্মান তাঁর জোটেনি সত্য, কিন্তু বহু হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বৃত হয়েছেন।[৩৭]

ব্যক্তিজীবন আর সাহিত্যজীবন একাকার ছিল আহসান হাবীবের। ব্যক্তিজীবনে যেমন কোনো কপটতা ছিল না, তেমনি তাঁর সৃষ্ট কবিতাতেও নেই কোনো ছলচাতুরী; নেই শব্দের আড়ষ্টতা বা ভাবের বাগাড়ম্বর। যা বলার, সহজেই প্রকাশ করেছেন তা। তাই স্পষ্টবাদিতাও ছিল তাঁর আচরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভালোকে ভালো আর মন্দকে সরাসরি মন্দ বলার সৎসাহস ছিল আহসান হাবীবের। ভুল বানান এবং ভুল শব্দপ্রয়োগ, সেটা যেখানেই হোক—দেখলে তিনি খুব ব্যথিত হতেন; সম্ভব হলে প্রতিবাদ করতেন। তা না হলে বুঝিয়ে বলতেন ভাষার অপপ্রয়োগের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে। ভেতরে ভাষা-আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মূলত তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মানুষকে এ বিষয়ে সজাগ করতেন। এ সম্পর্কে নিচের স্মৃতিচারণাটি খুব প্রাসঙ্গিক :

> শহীদ দিবসের বিক্ষোভকারীদের চোটে ষাটের দশকে রাজধানীর দোকানপাটে বাংলায় সাইনবোর্ড লেখা শুরু হয়। অনেক সাইনবোর্ডেই বানান ভুল। ঐগুলি দেখে হাবীব ভাই মনে বিছুটি লাগার জ্বালা অনুভব করতেন। দোকানের মালিককে গিয়ে অনুরোধ করতেন ভুল শোধরানোর জন্য। এমন একটি অনুরোধের কাহিনী একদিন বলেছিলেন। ঢাকা স্টেডিয়ামের দক্ষিণ দিকে একটি রেস্তোরাঁ। মালিক পাঞ্জাবী। রেস্তোরাঁর সাইনবোর্ডটি ভুল বানানে লেখা। হাবীব ভাই অভ্যাসবশত বানানটি শুদ্ধ করে লেখার অনুরোধ জানান মালিককে। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তো অবাক হাবীব ভাই-এর কথা শুনে মাতৃভাষার প্রতি তার ভালবাসা এবং বানান-নিষ্ঠা দেখে। তিনি শুদ্ধ করে লিখেছিলেন তার রেস্তোরাঁর নাম।[৩৮]

নির্লোভ-নিরহংকার আহসান হাবীব নীতি-আদর্শের প্রশ্নে সবসময় কলুষমুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। এ কথা বলাই বাহুল্য যে পাকিস্তান হওয়ার পর থেকেই পূর্ববাংলার ভাষা-সংস্কৃতি ও মানুষের ওপর নানা জুলুম-নির্যাতন চলেছে নতুন নতুন কায়দায়। এক্ষেত্রে এদেশীয় কিছু লেখক-কবি-সাহিত্যিক পাকিস্তানি সরকারের সব কর্মকাণ্ডেই সমর্থন দিয়ে গেছেন। এমনকি পাকিস্তান সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখার সিদ্ধান্ত নিলে ওই সিদ্ধান্তকেও স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁরা। এর মধ্যে কেউ কেউ সত্যিকার অর্থেই পাকিস্তানের নীতি-আদর্শ এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন। বাঙালি সংস্কৃতির ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ডের বিনিময়ে তাঁরা সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করেছেন। তাঁরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত পাকিস্তানের স্বপ্ন বুকে লালন করেছেন তখনো। সংগতকারণে সরকার যখন ১৯৬৭ সালের ২২ জুন বেতার ও টেলিভিশনে পাকিস্তানের স্বার্থবহির্ভূত বলে রবীন্দ্রসংগীত বন্ধের নির্দেশ দেয়, সঙ্গে সঙ্গেই (অনেকেই বলে থাকেন তাদের পরামর্শেই) এদেশীয় পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীরা তাকে স্বাগত জানান। শুধু তা-ই নয়, এই অপচেষ্টাকে সফল করতে সরকার ওইসব বুদ্ধিজীবীকে দিয়ে বিবৃতি লিখে তাতে সমর্থন আদায়ের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি চাকুরের কাছেও পাঠায়। সেখানে শর্ত ছিল এমন যে, সেই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে হবে, নইলে চাকরি হারাতে হবে। এ ছাড়াও জীবনের ওপর হুমকি তো ছিলই। 'দৈনিক পাকিস্তান' ছিল সরকারের ট্রাস্টের পত্রিকা। ওই হিসেবে এখানকার কর্তব্যরত সাংবাদিকেরাও ছিলেন সরকারি চাকুরে।

আহসান হাবীবের জীবনে ঘটে যাওয়া অনিচ্ছাকৃত এমন দুটি ঘটনা এখনো নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে। তার একটি হলো রবীন্দ্রসংগীত বন্ধ-সংক্রান্ত ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান। কিশোর বয়স থেকে শুধু নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আর কবি হওয়ার জন্য যে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেছিলেন, সেই জীবনসংগ্রাম সারাজীবনের জন্য হোক, সেটা তিনি চাননি। আর তা ছাড়া সেই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মতো মানসিক শক্তিও ছিল না তাঁর। সাতচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর ভাগ্যে জোটে প্রথম স্থায়ী চাকরি,

Dhaka University Institutional Repository

'দৈনিক পাকিস্তানে'। তখন চার সন্তানের জনক অর্থাৎ স্ত্রীসহ ছয় সদস্যের সংসার এবং ছোট ভাইবোনদের খরচ চালিয়ে যাওয়ার মতো উপার্জনের বিকল্প পথ পাওয়া তখন কবির পক্ষে দুরূহ ছিল বৈকি! পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা আর পরিবারের এতজন সদস্য নিয়ে কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে চাননি তিনি। একজন দায়িত্বশীল বাবা ও সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির তখন বিকল্প ভাবনা ভাবাটা বাস্তবিক পক্ষেই সম্ভব ছিল কি না, তা ভাববার বিষয়। তবে সেই পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের অনেক রবীন্দ্র-অনুরাগী লেখকের মতো আহসান হাবীবও অসহায় হয়ে ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। এ বিষয়ে কবির বড় পুত্র মঈনুল আহসান সাবেরের একটি বিশ্লেষণ খুব প্রাসঙ্গিক :

> প্রায় কিশোরকাল থেকে যারা জীবনসংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে, পদে পদে অনিশ্চিত অবস্থার মুখোমুখি হয়, অভাব হয় প্রায় নিত্যসঙ্গী, আমার ধারণা—মানুষ হিসেবে তারা হয় দু ধরনের। একদিকে তারা, যাদের ভয়-ডর কিছু থাকে না, ডাকাবুকো হয়, মেজাজি হয়, নদীভাঙা মানুষের মতো সাহসী হয়, জীবনে অনেক কিছুই অস্বীকার করতে শেখে। দ্বিতীয় দলে যারা, তারা সাধারণত হয় ভীরু, নির্বিরোধী, সংসারী, নিজ পরিবারের সামান্য সুখের জন্য কিছু অন্যায় মেনে নিতেও প্রস্তুত।...প্রথম জীবন থেকে অনিশ্চয়তা আর অনিশ্চয়তা, অস্থিতি আর অস্থিতি, অভাব আর অভাব তাঁকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে দেয়নি...। আর জীবনে প্রথম স্থায়ী চাকরি পাওয়ার পর সেটা হারানোর ভয়ও তাঁকে আচ্ছন্ন ও আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখতই বলে আমার মনে হয়।...ওই চাকরি সব সমস্যার সমাধান করেনি, পরিস্থিতি কিছুটা সহজ করেছিল শুধু। কিন্তু চাকরি না থাকলে? আমার পিতা চাকরি না থাকার ভয় অতিক্রম করতে পারেননি, আবার সেই অতি অনিশ্চিত জীবনে ফিরে যাওয়ার আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিতে পারেননি। তাঁর ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা এটুকুই এবং এই শঙ্কা, ভীতি আর সীমাবদ্ধতার কারণেই ওই বিবৃতিতে অংশগ্রহণ।[৩৯]

ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষরের দিনই অফিস থেকে ফেরার পথে কবির মানসিক অবস্থা জানা যায় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের আত্মজীবনী থেকে।

> এই বিবৃতিপ্রকাশের আগের সন্ধ্যায় অফিস-ফেরতা আহসান হাবীব এলেন আমার বাসায়। বললেন, 'আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি, তোমাকে না বলে শান্তি পাচ্ছি না।' তারপর ওই বিবৃতির কথা জানালেন। বললেন, প্রেস ট্রাস্টের কাগজে তিনি চাকরি করেন, সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট লোকেরা স্বাক্ষর চাইলে না দিয়ে পারেন নি, সই দিয়েই মনে হয়েছে আমি কী ভাববো! ছুটে এসেছেন আমার কাছে।...আমি তাঁকে বললাম, এই স্বাক্ষরের কারণে তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা বদলাবে না, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কও পালটাবে না।...আহসান হাবীবের মনোবেদনা আমাকে আপ্লুত করেছিল। তাঁর কথা রফিকুল ইসলামকে বলেছিলাম, কিন্তু তাঁর মনে দাগ কাটে নি। কিছুকাল পরে হাবীব ভাইয়ের মেয়ে কেয়া আমাদের বিভাগে অনার্সের প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে আসে। ভর্তি কমিটিতে রফিকুল ইসলাম ছিলেন। তিনি নাকি কেয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি যে বাংলা পড়তে চাও, এখানে তো রবীন্দ্রসাহিত্য পড়তে হবে—তোমার আব্বা আপত্তি করবেন না?' কেয়া বাড়ি গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এ-কথা বলেছিল বাবাকে, হাবীব ভাই আমার কাছে এসেছিলেন একইরকম অসহায় ভাব নিয়ে।[৪০]

আর ওই স্বাক্ষরের পর কবি যে অনুশোচনা আর আত্মগ্লানিতে ভুগেছেন তার দৃষ্টান্ত আছে তাঁর লেখাতেও। নিয়মিত দিনপঞ্জি বলতে যা বোঝায়, তা তিনি লেখেননি। তবে ওই বিবৃতি সম্পর্কে ১৯৭২ সালের জানুয়ারির প্রথম দিনে এক ডায়েরির পাতায় লিখেছিলেন :

> রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার ১৯৪০ থেকে শুরু করে একটা অভিযোগ মনে মনে এই ছিলো যে, আর যাই হোক জনকল্যাণ আর জনসংস্কৃতির সঙ্গে এবং দারিদ্র্যমুক্ত সুখী মানবসমাজ গঠনের প্রশ্নে রবীন্দ্রসংস্কৃতি সহায়ক নয়। রবীন্দ্রদর্শন সামগ্রিক মানবতা ও মানসিকতার কুয়াশায় জনমুক্তির সংগ্রামকথাকে বারবার আচ্ছন্ন করেছে।
>
> আমার এইসব ধারণা ও বিশ্বাসের ফলেই বাংলাদেশে রবীন্দ্রবিতর্কের সময়ে একটি লজ্জাজনক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। রবীন্দ্রবিরোধী বলে চিহ্নিত বিবৃতিটি যখন আচমকা আমার সামনে আসে স্বাক্ষরের জন্য, তখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

আমার উপরোক্ত ধারণা, বিশেষ বিভাগের পুলিশি হয়রানির ভয় (যেহেতু এই দলের সবচেয়ে প্রখ্যাত কবি বন্ধু আমাকে বহুবার বিপদের ইঙ্গিত দিয়ে ধমক দিয়েছে এবং বিশেষ কেন্দ্রে নাম পাঠিয়েছে বলেও খবর পেয়েছি) এবং সংশ্লিষ্ট বিবৃতিটির ভাষাভঙ্গি সম্পর্কে মনোযোগ না দেওয়া প্রভৃতিই আমাকে কেমন একটা বিভ্রান্তিকর দুর্বলতায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমি আচ্ছন্নের মতো স্বাক্ষর করি।

পরদিন সকাল থেকেই উপলব্ধি করি, স্বাক্ষর দেওয়া ঠিক হয়নি। কেবল তখনই আমি বুঝতে পারি—আমার পূর্ববর্তী ধারণার রবীন্দ্রনাথ এবং আজ বাংলাদেশে বিতর্কিত রবীন্দ্রনাথ এক নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার।

অতঃপর আমি যা নই, অনেকের কাছে আমি তাই বলে পরিচিত হতে লাগলাম। কেননা, একালে একটা গোটা মানুষের চেয়ে তার একটা স্বাক্ষরের গুরুত্ব বেশি। অথচ ব্যাপারটা একটা আকস্মিক মুহূর্তের। তবু সেই মুহূর্তের কাছে ৩০ কি ৩৫ বছরও মিথ্যে হয়ে যেতে দেখা যায়।[৪১]

পরের ঘটনাটি স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালের। তখনো আহসান হাবীবের কর্মক্ষেত্র 'দৈনিক পাকিস্তান'ই। যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা চেয়ে একটি বিবৃতি তৈরি করা হয়। সেই বিবৃতিতে স্বাক্ষরের জন্যও বেছে নেওয়া হয় সরকারি চাকুরেদের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের। তারা হয়তো বিবৃতিদাতার পরিচিতি দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিল। এখানেও ষড়যন্ত্রের শিকার আহসান হাবীব। তবে এ সময়ে স্বাক্ষর আদায়ের জন্য আরও বেশি আক্রমণাত্মক আচরণ করা হয় নির্ধারিত স্বাক্ষরকারীদের সঙ্গে। ভীতি-প্রদর্শনের মুখে আহসান হাবীব ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এতে স্বাক্ষর করেন কবীর চৌধুরী (১৯২৩-২০১১), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) প্রমুখ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীও।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চার-পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধাকে আহসান হাবীব আশ্রয় দিয়েছিলেন।[৪২] দিনের পর দিন তাঁরা থেকেছেন কবির মোহাম্মদপুরের বাড়িতে। এ ছাড়া 'বাংলাদেশের বিস্ফোরণোন্মুখ দিনগুলোতে তাঁর উদ্দীপনাময় কবিতার স্মৃতি কি সহজে ভোলার মতো? সরকারি পত্রিকায় চাকরি করেও আমাদের আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে তিনি যে একাধিকবার বাংলা একাডেমীতে কবিতা পাঠ করেছেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর—প্রথমদিককার খণ্ডগুলোতেই তার প্রমাণ মিলবে।'[৪৩] অথচ আমাদের ভাষা-আন্দোলনের ফসল বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*-এ আহসান হাবীব সম্পর্কে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের বিরোধিতাকারী, পাকিস্তানের সমর্থক আর স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থানকারী কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। চরিতাভিধানে লেখা হয়েছে, 'পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানের নীতি ও আদর্শের সমর্থক। ১৯৬৭-র ২২ জুন পাকিস্তান সরকার বেতার টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে বিবৃতি প্রদান।'[৪৪] তাঁর কবিতা ও অন্যান্য লেখায় পাকিস্তানের প্রতি কোনো দুর্বলতা লক্ষ করা না গেলেও এই তথ্যটি পরিবেশনার ঢঙ এবং এর ভাষা দেখে যে কেউ কবি আহসান হাবীব সম্পর্কে বিভ্রান্ত হতে পারেন, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের তরুণদের সেই ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। সমকালে সহকর্মী থাকা সত্ত্বেও যেমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছিলেন কবি শামসুর রাহমানও। তিনি লিখেছেন :

...একবার তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা আমার কাছে অনুমোদনযোগ্য মনে হয়নি। আমি খুব চটে গিয়েছিলাম। আমার উষ্মা লুকাতে কোনোরকম চেষ্টা করিনি, বরং খবরের কাগজের পাতায় প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। তিনি এমন একটি বিবৃতিতে সই দিয়েছিলেন যাতে তাঁর সায় থাকার কথা নয়, যা হোক, আমার আচরণ কর্কশ ও রূঢ় হওয়া সত্ত্বেও আহসান হাবীব আমার প্রতি বিরূপ হননি। আমার সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পরে যখন তর্কের তুফান

Dhaka University Institutional Repository

থেমে গেল, উত্তেজনা কমে গেল, তখন তাঁর কাছে গেলাম, খোলা মনে মার্জনা চাইলাম। সেদিন তাঁর চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল; তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এরকমই ছিলেন আহসান হাবীব।[৪৫]

আহসান হাবীব 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর মাধ্যমে যাঁদের লেখক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, সিদ্দিকুর রহমান তাঁদের অন্যতম। তিনিও দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিবৃতিতে আহসান হাবীবের স্বাক্ষরের বিষয়টি নিয়ে। বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি। তাই একদিন কবির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিলেন বিবৃতির বিষয়ে। তিনি লিখেছেন :

আমার মনে প্রশ্নটি তোলপাড় করছিল। তা দমন করতে না পেরে বোকার মতো বলেই ফেললাম—'ভাই, একটা কাজ কিন্তু ভালো করেননি। এখানকার কয়েকজন বুদ্ধিজীবী স্বাধীনতাযুদ্ধ-বিরোধী একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন। আপনিও তাদের মধ্যে একজন।' ভেবেছিলাম, আমার কথা শুনে তিনি রেগে যাবেন কিংবা প্রতিবাদ করবেন, অন্তত নিদেনপক্ষে ধমকের সুরে কথা বলবেন। তিনি সে সবের কিছুই করলেন না। গভীরকণ্ঠে বললেন, 'সৈন্যরা এসে একদিকে রাইফেল আরেক দিকে বিবৃতির কাগজটি রেখে দিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে আমি ভেবে দেখলাম আমার কর্তব্য—আমি কি সই করে আপাতত বাঁচবো, নাকি বিরোধিতা করে ভয়াবহ মৃত্যুর পথ বেছে নেবো? আমি প্রথম পথটি বেছে নেয়াই শ্রেয় মনে করলাম।'...সেদিন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়...।[৪৬]

আহসান হাবীবের কবিতা খুব বেশি চর্চিত না হওয়ার কারণ হয়তো ওই দুটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান। বিষয়টি নিয়ে কবির বড় মেয়েকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কবির বড় মেয়ে কেয়া চৌধুরী যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তির জন্য মনোনীত হওয়ার পর মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে যান, তখন মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের একজন শিক্ষকের কাছ থেকে তাঁকে শুনতে হয়েছিল কটূবাক্য। ওই শিক্ষক জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এখানে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পড়তে হবে, তোমার বাবা কি তোমাকে রবীন্দ্রনাথ পড়তে দেবেন? উত্তরে কেয়া জানান, কেন দেবেন না। উনি নিজে রবীন্দ্রনাথ পড়েন। এ কথা শুনে শিক্ষক রফিকুল ইসলাম টিটকারির ভঙ্গিতে বলেন, আচ্ছা, উনিও রবীন্দ্রনাথ পড়েন নাকি!...তবে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে ওই বিকেলে বাংলা বিভাগের ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত শিক্ষকদের কয়েকজন আমাদের বাসায় আসেন এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অমন মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।[৪৭]

পরবর্তী সময়ে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ সাহিত্য ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জীবিত নেই—এমন ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিপিবদ্ধ করে *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান* প্রণয়ন করে। সেখানে আহসান হাবীবের অংশে তাঁর বিশেষ অবদান হিসেবে স্রেফ দুটি বিবৃতিতে স্বাক্ষরের বিষয়টিই উঠে এসেছে ! অথচ সেটি যে ছিল অনিচ্ছাকৃত এবং জীবনের ওপর হুমকির জন্য তিনি তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে-সম্পর্কে পাঠক কিছুই জানতে পারে না। অর্থাৎ *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*-এর দৃষ্টিতে সত্যিকারের পাকিস্তানপন্থী লেখক-বুদ্ধিজীবী আর আহসান হাবীব সমান্তরাল চেতনার মানুষ! কিন্তু নতুন প্রজন্ম ঠিকই বিভ্রান্ত হচ্ছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অভিধানধর্মী প্রকাশনার অন্তর্ভুক্ত সকল ভুক্তি যথার্থ কার্যতালিকাসহ উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

পাঁচ

১৯৬৪ সাল থেকে মৃত্যুর (১৯৮৫ সালের ১০ জুলাই) আগ পর্যন্ত আহসান হাবীব 'দৈনিক বাংলা'য় সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শুধু 'দৈনিক বাংলা'র কর্মজীবনও কম ঘটনাবহুল ছিল না আহসান হাবীবের জন্য। এ সময়ের মধ্যে তিনি পার করেছেন পাকিস্তানের দুটি সামরিক শাসনামল, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

শাসন, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের বর্বর হত্যাকাণ্ড ও তার পরবর্তী ক্রান্তিকাল এবং স্বাধীন বাংলাদেশে দুটি সামরিক সরকারের শাসনামল।

তেমনি দৈনিক পাকিস্তান-এর প্রকাশনার পর থেকেই আহসান হাবীব সাহিত্য-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন—এ সময়পর্বে *দৈনিক বাংলায়* বেশ কয়েকজন সম্পাদকের দায়িত্বকালও তিনি পার করেছেন। অপরিবর্তনীয় ছিল তাঁর সাহিত্যপাতা সম্পাদনার দায়িত্ব। সম্পাকদের মধ্যে শুরুতে ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮)। এরপর ছিলেন আহমেদ হুমায়ুন, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান প্রমুখ। সর্বশেষ শামসুর রাহমানের সম্পাদনার সময়কালেই আহসান হাবীব মৃত্যুবরণ করেন। শামসুর রাহমান 'দৈনিক বাংলা'য় সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন প্রায় দশ বছর (১৯৭৭-১৯৮৭)। আহসান হাবীবের সুচারু সম্পাদনায় তখন 'দৈনিক বাংলা'র সাহিত্যপাতা তরুণ লেখকদের ভিড়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছিল। তখন 'রবিবাসরীয়' পাতা বের হতো চার পৃষ্ঠা। চার পৃষ্ঠার সাহিত্যপাতা কমতে কমতে যখন এক পৃষ্ঠায় পৌঁছায়, তখন আহসান হাবীব চিন্তিত হয়ে পড়েন, অসম্মান বোধ করতে থাকেন—এভাবে না জানি সাহিত্যপাতাটি একদিন বন্ধ হয়ে যায়! এ নিয়ে তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভ ও হতাশা ছিল।

বয়স ষাট পেরোনোর পর থেকেই আহসান হাবীব নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হতে থাকেন। চোখের দৃষ্টিশক্তিও লোপ পেতে থাকে। মাঝেমধ্যেই চিকিৎসকের কাছে যাওয়াটা জরুরি হয়ে পড়ত। তাঁর বসার কক্ষটি ছিল 'দৈনিক বাংলা' ভবনের চার তলায়। সিঁড়ি বেয়ে চার তলায় ওঠার মতো শারীরিক সক্ষমতা তখন ছিল না আহসান হাবীবের। অথচ তিনি যখন অফিসে যেতেন, তখন লিফটটা বন্ধ থাকত। তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি বিবেচনার জন্য বারবার তাগাদা দিলেও তাতে কোনো লাভ হয়নি।[৪৮] না থেকেছে লিফট চালু, না হয়েছে নিচতলায় একটি কক্ষের ব্যবস্থা। জীবনের শেষদিকে তিনি চোখে ভালো দেখতে পেতেন না বলে তাঁর সহকারী নাসির আহমেদ লেখা পড়ে শোনাতেন আর এভাবেই তিনি সুচারুভাবে সাহিত্যের পাতা সম্পাদনা করতেন। রোকনুজ্জামান খানের স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন :

> তাঁকে একদিন বিষণ্ন দেখলাম। তখন অসুস্থ তিনি। চোখেও ভাল দেখতে পান না। মাঝে মাঝে অফিস থেকে ছুটি নেন। সহকারী নাসির আহমেদ লেখা পড়ে শোনান। তা শুনে শুনেই তিনি লেখা বাছাই করেন। তাঁর বাসায় গিয়েছি কি এক প্রয়োজনে। বিষণ্ন মুখে জানালেন, তাঁর সাহিত্য-পৃষ্ঠার কলেবর ছেঁটে দুপৃষ্ঠা থেকে এক-পৃষ্ঠা করা হয়েছে। এতে তাঁর পরিশ্রম কম হওয়ার কথা। কিন্তু সেই অসুস্থ শরীরে অন্যের মুখে শুনে সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেও পরিশ্রম লাঘবের কথা তিনি চিন্তা করেন নি। তাঁর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত হেনেছে এ সিদ্ধান্ত। কর্তৃপক্ষের প্রতি তাই তিনি ক্ষুব্ধ।[৪৯]

আহসান হাবীব কখনো তোয়াজ-তদ্বির পছন্দ করতেন না। এই জন্যই তাঁর প্রাপ্যটুকু আদায় করতে সক্ষম হননি তিনি। সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে ছিলেন নির্মোহ। এমনকি পত্রিকার মূল সম্পাদকের সুপারিশে পাঠানো লেখাও তাঁর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হলে সেটি তিনি ছাপতেন না। এই জন্যই কি ছিল আহসান হাবীবের প্রতি দৈনিক বাংলা কর্তৃপক্ষের উন্নাসিকতা, অবজ্ঞা? কেননা, 'দৈনিক বাংলা'র নিয়মিত লেখক-পাঠকমাত্রই জানতেন, আহসান হাবীব বেঁচে থাকতে সাহিত্যপাতাই ছিল পত্রিকাটির সবচেয়ে জনপ্রিয় পাতা, এখানেই ছিল বেশিসংখ্যক পাঠকও। আর এই অর্জনটি বিনা পরিশ্রমে হয়নি। এর জন্য আহসান হাবীবকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করতে হয়েছে অনেক ত্যাগ, মেনে নিতে হয়েছিল নানা পেশাগত অবিচার। এমনকি কারো কারো ঈর্ষায় দগ্ধও হয়েছিলেন। কিন্তু এর পরও তিনি ছিলেন নীতি-আদর্শের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি অটল। আহসান হাবীবের এই অনমনীয়তাই হয়তো কাল হয়েছিল নিজের জন্যই। তাঁর প্রতি কর্তৃপক্ষের অবমাননাকর আচণের হেতু হয়তো তা-ই। বিষয়টি আরো বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল তখন, যখন কবি শামসুর রাহমান এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে সাহিত্যপাতার কলেবর হ্রাস পেয়েছিল।[৫০]

তবে বেশির ভাগ সহকর্মীদের কাছে আহসান হাবীব ছিলেন গুণীজন, অতিপ্রিয় আপনজন। তার পরও সহকর্মীদের মধ্য থেকে কারো আচরণে ক্ষতবিক্ষত হয়েও চুপচাপ থাকতেন তিনি। তাঁর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, সেটি তাঁর ব্যক্তিস্বার্থের কোনো আচরণের জন্য নয়। শুধু নীতি-আদর্শে অটল থাকার জন্যই তাঁকে কষ্ট পোহাতে হয়েছে, বিরূপ মন্তব্যও মেনে নিতে হয়েছে। তিনি কোনোদিন প্রতিবাদ করেননি। তাঁর শেষ দিককার কবিতাগুলোতে ছাপ পড়েছে ওইসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া। তিনি তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন অনেক কবি-লেখক-প্রাবন্ধিক—বিনিময়ে অর্জন করেছেন মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা।

১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে শেষবার হাসাপাতালে ভর্তি হওয়ার আগেও আহসান হাবীবকে বেশ কয়েকবার চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়েছিল এবং হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়েছিল। পত্রিকার নিয়ম অনুযায়ী তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রের খরচের নির্দিষ্ট অংশ পত্রিকা কর্তৃপক্ষের বহন করার কথা। সেখানেও সুবিচার করেননি পত্রিকার সম্পাদক। বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলেন আহসান হাবীব। প্রবল আত্মমর্যাদাবোধের কারণে সেই প্রাপ্য অধিকারটুকুও আর গ্রহণ করেননি তিনি।[৫১] এসব অভিমান, ক্ষোভ নিয়েই ১৯৮৫ সালের ১০ জুলাই আহসান হাবীব চলে যান না-ফেরার দেশে। কবিজীবন আর ব্যক্তিজীবন একাকার হয়ে গিয়েছিল আহসান হাবীবের ক্ষেত্রে। তাই পেশাগত জীবনের সুবাদে সমকালীন সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে কবিদের কবি হিসেবে, লেখকদের কাঙ্ক্ষিত দিক-নির্দেশক হিসেবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তিনি।

তথ্যনির্দেশ

১ আহসান হাবীব, "আমার প্রথম লেখা", *আহসান হাবীব রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা: ৩৭৯

২ আহসান হাবীব, "আমার প্রথম লেখা", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০-৩৮১

৩ আহসান হাবীব, "এক যে ছিলো বরিশাল", *আহসান হাবীব রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭২

৪ মঈনুল আহসান সাবের আমার এক প্রশ্নের জবাবে তাঁর বাবার কলকাতা জীবনের প্রথমদিককার সংকটের কথা তুলে ধরতে গিয়ে ওসব কথা বলেন।

৫ তুষার দাশ, *আহসান হাবীব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ১৫

৬ আবু জাফর শামসুদ্দীন, "প্রয়াত বন্ধু কবি আহসান হাবীব", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পা. রোকনুজ্জামান খান) আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৬

৭ তুষার দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

৮ রশীদ করিম, "হাবীব ভাই-এর কাছে আমার ঋণ", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

৯ সৈয়দ আলী আহসান, "কবি আহসান হাবীব", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

১০ সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

১১ রোকনুজ্জমান খান, "সম্পাদকের বক্তব্য", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত।

১২ রোকনুজ্জমান খান, "সম্পাদকের বক্তব্য", পূর্বোক্ত।

১৩ আবদুল হক, *বাঙালির জাগরণ* (আহমদ মাযহার সম্পাদিত), অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২১৫

১৪ নাসির আহমেদ "কবি আহসান হাবীব : তাঁর সম্পদনা" (আহসান হাবীবকে নিয়ে প্রকাশিতব্য গ্রন্থের রচনা)

১৫ ১৪ অক্টোবর ২০১১ তারিখে সন্ধ্যা ছয়টায় একান্তে সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট ভাষা-সংগ্রামী আহমদ রফিককে নানা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলন নিয়ে।

১৬ রাবেয়া খাতুন, "শেষ ফেরা", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, পৃ. ২৮৪

১৭ আবদুল হক, *বাঙালির জাগরণ* (আহমদ মাযহার সম্পাদিত), পূর্বোক্ত পৃ. ২১৬

১৮ রাবেয়া খাতুন, "শেষ ফেরা", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬

১৯ আবদুল হক, *বাঙালির জাগরণ*, পূর্বোক্ত, ২১৫

২০ আহসান হাবীব, "রোববারের সাহিত্য : দৈনিক বাংলা", *আহসান হাবীব রচনাবলী* ২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৬৬

২১ আহসান হাবীব, "রোববারের সাহিত্য : দৈনিক বাংলা", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭

২২ আহসান হাবীব, "আমার লেখা", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯

২৩ আহসান হাবীব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮

২৪ আবু কায়সার, *শৈলী*, সম্পাদক : কায়সুল হক, বর্ষ ৪, সংখ্যা ২২, ঢাকা, ১৯৯৯

২৫ ইকবাল আজিজ, "হাবীব ভাইয়ের কথা" (আহসান হাবীবকে নিয়ে প্রকাশিতব্য গ্রন্থ)।

২৬ মোস্তফা মীর, "আমাদের সম্পাদক", পূর্বোক্ত।

২৭ মোস্তফা মীর, পূর্বোক্ত।

২৮ নাসির আহমেদ, "কবি আহসান হাবীব: তাঁর সম্পাদনা", পূর্বোক্ত

২৯ নাসির আহমেদ, পূর্বোক্ত

৩০ পূর্বোক্ত

৩১ পূর্বোক্ত

৩২ শামসুর রাহমান, "তিনি ছিলেন তরুণের প্রতিদ্বন্দ্বী", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৩৩ নাসির আহমেদ, পূর্বোক্ত

৩৪ পূর্বোক্ত

৩৫ আনিসুজ্জামান, "আহসান হাবীব : ব্যক্তিগত স্মৃতি", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, ২৮১

৩৬ ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি তো কবিতা লিখতেন, কীভাবে প্রাবন্ধিক খ্যাতি পেয়ে গেলেন? সে-সময় আহমদ রফিক আমার কাছে এ-কথা বলেন।

৩৭ মহাদেব সাহা, "আমার স্মৃতিতে হাবীব ভাই", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

৩৮ সৈয়দ আবদুল কাহ্হার, "হাবীব ভাইয়ের যে নির্দেশ পালন করা হয়নি", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, ৭৫

৩৯ মঈনুল আহসান সাবের, "আহসান হাবীব ও একটি স্বাক্ষর", প্রথম আলো সাহিত্য সাময়িকী, ১৩ জুন ২০০৩

৪০ আনিসুজ্জমান, *কাল নিরবধি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩ (দ্বি. মু. ২০০৮), পৃ. ৪৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৪১ মঈনুল আহসান সাবের, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত

৪২ কবির বড় ছেলে মঈনুল আহসান সাবের ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় (১৫.০৯.১১) তাঁর বাবা কেন, কীভাবে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন—এই প্রশ্ন করলে একপর্যায়ে তিনি আমাকে এই তথ্য দেন। সেই মুক্তিযোদ্ধাদের একজন এখনো বেঁচে আছেন। তিনি এখন আমেরিকা-প্রবাসী।

৪৩ আবু কায়সার, "রাত্রি শেষের ছায়া হরিণ", আহসান হাবীবকে নিয়ে প্রকাশিতব্য গ্রন্থের রচনা।

৪৪ সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৮২

৪৫ শামসুর রাহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

৪৬ সিদ্দিকুর রহমান, "মানুষ আহসান হাবীব", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, পৃ. ১০১

৪৭ মঈনুল আহসান সাবের, "আহসান হাবীব ও একটি স্বাক্ষর", পূর্বোক্ত

৪৮ ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় মঈনুল আহসান সাবের প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন যে যখন তাঁর বাবার বয়স ষাটোর্ধ্ব ছিল, তখন তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মতো সুস্থ ছিলেন না। তিনি ফাঁকি দিতেন না বলেই প্রতিদিন অফিসে যেতেন। কিন্তু তাঁর অফিস সময়ে লিফটা চালু থাকত না। এমনকি পত্রিকার সম্পাদক চাইলেই তাঁর জন্য নিচতলায় একটি কক্ষের ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তিনি সে- ব্যবস্থা করেনি।

৪৯ রোকনুজ্জামান খান, "সম্পাদকের বক্তব্য", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত

৫০ শামসুর রাহমান সম্পাদকের দায়িত্বপালনকালে 'দৈনিক বাংলা'র সাহিত্যপাতা কলেবর কমল কেন—ভাষা-সংগ্রামী আহমদ রফিককে একান্ত আলাপচারিতার সময় এই প্রশ্ন করলে তিনি মন্তব্য করেন, 'শামসুর রাহমান নিজে একজন বড় কবি। তাঁর সময়ে আরেক প্রোথিতযশা কবি আহসান হাবীবের সম্পাদিত বহুল পঠিত পাতার কলেবর কমে যাওয়াটা দুঃখজনক, এটা অন্যায়। আসলে তাঁদের সম্পর্কটা ভেতরে ভেতরে ভালো ছিল না। শামসুর রাহমান ঈর্ষা করতেন।...তিনি চাইতেন, তাঁকে অন্যতম প্রধান কবি নয়, প্রধান কবি বলা হোক।' আহমদ রফিকের মতে, 'শামসুর রাহমান কখনোই আহসান হাবীবের চেয়ে বড় কবি হতে পারেন না। শামসুর রাহমানের বন্ধুভাগ্য খুব ভালো ছিল। কিন্তু আহসান হাবীব একে তো ছিলেন নিভৃতচারী, পাদপ্রদীপের সামনে আসতে চাইতেন না। আবার শামসুর রাহমানের মতো অত কবিবন্ধুও ছিল না আহসান হাবীবের। সেই কারণে রাহমানের কবিতা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, লেখালেখি হয়েছে। অন্যদিকে বিপরীত অবস্থানে রয়ে গেছে আহসান হাবীবের কবিতা। কারণ আহসান হাবীব বড় হয়েছেন কলকাতায়।'

৫১ ওয়েজবোর্ড অনুযায়ী সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত যে কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে চিকিৎসার মোট খরচের একটি বড় অংশ পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বহন করে। জুলাইয়ের আগে সর্বশেষ জুন মাসে তাঁকে সর্বশেষ হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল থেকে ফিরে আহসান হাবীব তাঁর অফিস সহকারী (পিয়ন) কালামের মাধ্যমে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তখনকার সম্পাদক শামসুর রাহমানের কাছে পাঠান টাকা ছাড়ের স্বাক্ষরের জন্য। শামসুর রাহমান মন্তব্য করেন, 'এভাবে কয়দিন পরপর মেডিকেল ফি দেওয়া লাগলে তো পত্রিকা চলবে না।' এ কথা শুনে আহসান হাবীব সেই স্বাক্ষর-সংবলিত অর্থছাড়ের কাগজটি ছিঁড়ে ঝুড়িতে ফেলে দেন। আহসান হাবীবের সাহিত্যপাতার সহকারী কবি নাসির আহমেদ একান্ত আলাপচারিতায় উপর্যুক্ত তথ্যটি জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহসান হাবীবের আবির্ভাব : পরিপ্রেক্ষিত

১

আহসান হাবীব কবি হয়েছিলেন সৃষ্টির তাড়না থেকে। তাঁর কবি হওয়ার পেছনে রয়েছে কষ্টাতীত নানা ঘটনা। ব্যক্তিকবির অবস্থান এবং কবিতা নিয়ে অবস্থান ও ভাবনা সম্পর্কে বলে গেছেন তিনি তাঁর সর্বশেষ কাব্যের আগে। তিনি বলেছেন, '...ক্ষুধাই সেই হননকারী শত্রু যে মানবজীবন থেকে কবিতাকামনা হরণ করে, তাকে কবিতাহীন নরকে অনবরত আছড়াতে থাকে। আরো বুঝতে পারি, অনির্বার ক্ষুধা মানুষই তৈরি করে মানুষের মধ্যে। এবং এই সময় থেকেই কবিতা আমার আক্রান্ত হতে থাকে ক্ষুধার হাতে, তার অর্থ কবিতা তার চরিত্র বদলাতে থাকে। ক্ষুধার সেই রাজ্যে কবিতা কিছু বলবার দায়িত্ব নিতে থাকে।'[১] একদিকে কবিতা লেখার ক্ষুধার দরুন ঘর থেকে পলায়নপর হয়ে ভিন দেশের অজানা পরিমণ্ডলে গমন, অন্যদিকে উদরপূর্তির চিন্তা—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বসূত্রেই আহসান হাবীবের আনুষ্ঠানিক কাব্যাভিযাত্রা শুরু। মৌলিক কাব্যপ্রতিভার স্বাভাবিক লক্ষণ তাঁর ভেতরে শিশুকাল থেকে পরিলক্ষিত হলেও কাব্যবীজের বাধাহীন অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য, ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে বিকাশ লাভের জন্য যে উর্বর পরিবেশের প্রয়োজন হয়, তার জন্য গৃহত্যাগের গত্যন্তর ছিল না। মূলত যেদিন থেকে তিনি কবি হওয়ার তাড়না অনুভব করেন আর ছন্নছাড়া অনিশ্চিত জীবন বেছে নেন কবি হওয়ার তীব্র বাসনায়, সেদিন থেকেই বাংলা কবিতার দুয়ার তাঁর জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় হয়তো কবির অজান্তে—অদৃশ্যেই। কিশোর বয়সী কবি আহসান হাবীবের তখনো সবকিছু বুঝে ওঠার সামর্থ্য হওয়ার কথা নয়। সময়কাল ১৯৩৬ সাল—ব্রিটিশ-ভারতের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সময় একজন গ্রাম্যজীবনে অভ্যস্ত কলেজপড়ুয়া কিশোরের কলকাতা মহানগরীতে গমন। সেটা আবার শুধু শুধু নয়, এখন পর্যন্ত সমাজে অকর্মণ্যের শখ বলে বিবেচিত—কবিতা লেখার পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহ করতে। কবিরা সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল মানুষ। আর দশটা মানুষের মতোই তাঁরাও সমাজেরই বাসিন্দা, রক্তমাংসে গড়া স্বাভাবিক মানুষ কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, ভাবনার জগৎ, দেখা আর উৎযাপন-উপলব্ধির পার্থক্যই তাঁদের সৃষ্টিশীল শিল্পের কারিগর হিসেবে আলাদাভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলে। প্রতিভাগুণেই তাঁদের থাকে ভবিষ্যৎদর্শনের ক্ষমতা বা সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে জীবন ও জগৎকে দেখার ছান্দসিক দৃষ্টি। সন্দেহ নেই আহসান হবীবের ভেতরও ছিল জগৎ ও জীবনকে দেখবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপারঙ্গমতা। নইলে না খেয়ে না ঘুমিয়ে, কোথাও কোনো সংস্থান না পেয়েও ওই বয়সে কেন যেতে চাননি ফিরে জন্মভূমিতে—কলকাতার সম্পূর্ণ অনিশ্চিত জীবন থেকে? এমনকি কীভাবে তিনি বলতে পারেন, 'পরাক্রান্ত ক্ষুধাকে আমি কবিতার ওপরে হুকুম চালাতে দিইনি। ফিরে যাইনি। পিরোজপুর বা শঙ্করপাশা, আপন বিবরে।'[২]

ব্রিটিশশাসিত ভারতের শেষদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসহ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা যখন তুঙ্গে, আহসান হাবীবের অবস্থিতি তখন কলকাতায়। ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার যাঁরা অগ্রনায়ক—রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে যাঁরা নতুন কবিতা উপহার দিতে সক্রিয় ছিলেন, সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী কবিরা তখনো আধুনিক কবিতার কাণ্ডারি। উচ্চমাধ্যমিকের পড়া ক্ষান্ত দিয়ে আহসান হাবীব যখন দেশ ছাড়লেন, তখন তাঁর অর্জন কেবল কলকাতার কয়েকটি পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে ছাপা কবিতা। কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যে অফুরন্ত স্বপ্ন তাঁর বুকে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, তা বাস্তবায়নের জন্য ওইটুকু

Dhaka University Institutional Repository

অর্জন যথেষ্ট ছিল কি না, সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। তবে কলকাতা-ভিন্ন অন্য কোথাও যে সে-ই কবি হওয়ার অস্থির পাগলামোটার মূল্যায়ন যথাযথ হবে না, সেটা বুঝতে পারাটাই ছিল কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে তাঁর দূরদর্শিতা। তা না হলে আজ হয়তো এই আহসান হাবীবকে বাংলা কবিতার উচ্চাসনে দেখা যেত না। কবিতার জন্য সংগ্রাম, জীবনের জন্য সংগ্রাম আর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম আহসান হাবীবের গোটা জীবনে একাকার হয়ে দৃশ্যমান। কিন্তু ওই সময় কবিতার আদর্শ হিসেবে তিনি যা পেয়েছিলেন, তার বেশির ভাগই ছিল ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষিত কবিদের আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

দশকের হিসাবে কবিতাকে বিবেচনা করা অনুচিত সত্ত্বেও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তা মাঝে মাঝে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিরিশের দশক নানা কারণে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মহাসমরের প্রভাব বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এ অঞ্চলের সমাজ-রাজনীতি সংস্কৃতির ওপরও পড়েছিল অনিবার্যভাবে। অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষামাধ্যমে সৃষ্ট সাহিত্যকর্মের ওপরও তার প্রভাবটা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বিশেষ করে নবীন কবিদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের প্রভাব প্রতিফলিত না হওয়া যেমন ছিল একধরনের চমক, তেমনি আবার তাঁর অমোঘ প্রভাব এড়ানোও ছিল নতুন কবিদের জন্য চ্যালেঞ্জ। এ সময়ের অনেক কবিই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করতে গিয়ে পাঠকের কাছ থেকে হারিয়ে গেছেন চিরদিনের জন্য—প্রতিভার দীনতায়। তাই কবিদের টিকে থাকার জন্য, কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য, নতুন পথ খোঁজার উপায়ান্তর ছিল না। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই বাংলা কবিতার শরীরে, ভাষায় এবং বিষয়েও পরিবর্তন আনাটা জরুরি ছিল বলে ওই সময়ের নবীন কবিরা মনে করেছিলেন। সেই চিন্তার বাস্তবায়ন ঘটাতেই ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ) 'কল্লোল' গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ। এরই ধারাবাহিকতায় 'পঞ্চপাণ্ডব'খ্যাত কবিদের কাব্যাভিযাত্রা বাংলা কবিতার পাঠকদের নতুন স্বাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। কবিতার বাঁক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক ও চৌকস পাঠকদের জন্য সেই প্রয়াসের বাস্তবরূপ গ্রহণযোগ্য হলেও সাধারণ পাঠক সেই স্বাদকে অনেকাংশে গ্রহণ করতে পারেননি। কেননা, রবীন্দ্র-নজরুল-জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় সাধারণ পাঠক যতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন, কল্লোল গোষ্ঠীর কবিরা সেইভাবে পাঠকের মন জয় করতে পারেননি। জীবনানন্দ দাশ ছাড়া অন্যরা তেমন পাঠকপ্রিয়তা না পেলেও, সন্দেহ নেই যে বাংলা কবিতার এই আধুনিকায়ন ছিল খুবই প্রয়োজনীয়। বিশ্বসাহিত্যের মানদণ্ডে টিকে থাকার জন্য এর বিকল্প ছিল না। তাঁদের কবিতাকর্মে পরিত্যাজ্য ছিল অন্ধ স্বাজাত্যবোধ—তাতে ছিল না দৈশিক-মানবিক ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক চেতনাবোধের চেয়ে তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন আহরিত বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ। অথচ সেই সময়ে বিরাজমান স্বাদেশিক-রাজনৈতিক সংকট ক্রমাগত মানবিক সংকটে পরিগণিত হচ্ছিল। তাই এসব কবির কবিতাপাঠে সাধারণ্যের প্রত্যাশা অপূরণীয়ই থেকে গেছে। তবে চল্লিশের দশকের বিষ্ণু দে এবং উপান্তরপর্বের জীবনানন্দ দাশ সম্ভবত ওই অনুপেক্ষণীয় ইতিহাসের বিরল ব্যতিক্রম।

অন্যদিকে বৈশ্বিক রাজনীতির প্রভাব এবং ভারতীয় রাজনীতির স্থানীয় সংকট মানুষকে ক্রমাগত স্বপ্নভঙ্গে বিপর্যস্ত করেছে। দ্বিতীয় মহাসমরের (১৯৩৯-১৯৪৫) সময়েই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সূত্রপাত। বাংলা কবিতার যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গাপীড়িত পাঠক যখন তাঁদের জীবন ও মাটিঘনিষ্ঠ কবিতার অভাব বোধ করছিলেন, তখন চল্লিশের দশকে কয়েকজন তরুণ কবি নতুন প্রতিশ্রুতি, সামাজিক দায়বোধ ও পাঠকের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে কাব্যচর্চা শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৪), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) প্রমুখ। বাংলা কবিতার নতুনতর এই পরিমণ্ডলে প্রবেশাধিকার-প্রত্যাশী ছিলেন আহসান হাবীব। ততদিনে

Dhaka University Institutional Repository

আহসান হাবীব কলকাতায় কাজের সন্ধান পেয়ে গেছেন জীবিকা নির্বাহের জন্য। বিভিন্ন পত্রিকায় চাকরির অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি কবি হিসেবেও পরিচিতি লাভ করছিলেন তিনি। দ্বিতীয় মহাসমরের সময় তিনি কাজ করছিলেন *সওগাত* পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে। কলকাতা তখনো ভারতীয় রাজনীতি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও আন্দোলনের সূতিকাগার বলে বিবেচিত। বাংলা সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র তখন একচ্ছত্রভাবে কলকাতাই। এ সময় বাংলা সাহিত্যে যতটুকু কবিতাচর্চা হয়েছে, তা কলকাতা থেকে এবং কলকাতাকে ঘিরেই। সুতরাং আহসান হাবীব যে সময় কাব্যচর্চা শুরু করেন, তকণ কাব্যজগতের অনেক সারথিকেই পেয়েছিলেন যাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন কলকাতার বাসিন্দা কিংবা আশপাশেই বেড়ে ওঠা। সমকালে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠাকামী মুসলমান কবিদেরও অম্বিষ্ট ছিল কলকাতাই। তবে পূর্ববাংলার তরুণ কবিদের মধ্যে আহসান হাবীব আর ফররুখ আহমদই ছিলেন সে সময় বাংলা কবিতার মূলসুরের অনুসারী। কবি আবুল হোসেনও ছিলেন, তবে তাঁর বেড়ে ওঠার প্রেক্ষাপটটা একটু ভিন্ন ছিল। যদিও কিছুদিনের মধ্যেই ফররুখ আহমদ ধর্মীয় ও চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর কবিপ্রতিভাকে ভিন্নপথে চালিত করেন। অর্থাৎ বাংলা কবিতার মূল ধারার সঙ্গে একমাত্র আহসান হাবীবই কলকাতায় অবিভক্ত বঙ্গের মুসলমান কবিদের মধ্যে তো বটেই পূর্ববঙ্গের কবি হিসেবেও 'নিঃসঙ্গ সারথি' হয়ে এগিয়েছেন এবং প্রতিনিধিত্ব করে স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বিশ্বব্যাপী যে রাজনৈতিক সংকট বিরাজ করছিল, তার প্রভাব সরাসরি পড়েছিল ব্রিটিশশাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে। আর ভারতে বিরাজমান রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংকট দ্বিতীয় বিশ্বসমরের সময় অনিবার্যভাবে মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনে। মূলত সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতা সাধারণ মানুষসহ কাব্যস্রষ্টাদের অনুভূতিকে ভিন্নমাত্রায় আন্দোলিত করে। পূর্বসূরি কবিরা তাঁদের কবিতায় বিচিত্রমুখী ভাবনা ও প্রকাশকৌশল উপস্থাপন করলেও উত্তরসূরিদের কাছে স্বকীয় ভাবনার পৃথক দ্যোতনা সৃষ্টি করাই ছিল প্রার্থিত। বাংলা কাব্যসাহিত্যে চল্লিশের দশকের কবিতায় এই পৃথক সুরের ধ্বনি শোনা যায়। এ সময়ের কবিরা তাঁদের সৃষ্ট কবিতার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন সময় ও জীবনের সামষ্টিক প্রয়োজনীয়তাকে। ফলে চল্লিশের কবিদের কাব্যযাত্রা বিষয় ও প্রকরণ—উভয় দিক থেকে অনিবার্য কারণেই বহুমাত্রিকতা অর্জন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, মন্বন্তর এবং উপনিবেশ-বিরোধী গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নানাভাবে সমাজচৈতন্যে আলোড়ন তোলে। উদার গণতান্ত্রিকতা ও ভারতীয় জাতীয়তার পাশাপাশি লাহোর-প্রস্তাবের প্রভাবপুষ্ট ধর্মীয় জাতীয়তা ও ঐতিহ্যিক আদর্শবাদিতার স্ফুরণও ঘটে এ সময়ে। সমাজ-রাজনীতির এই মিথস্ক্রিয়া চল্লিশের কবিতার বিষয় ও আঙ্গিকে মূর্ত হয়ে ওঠে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৪), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) প্রমুখ কবি এ সময়ের সামাজিক দায়বোধ থেকে রাজনৈতিক ভাষ্যের অন্যতম কবি হয়ে ওঠেন। এ ছাড়া আরও যাঁরা এ সময়ের কবি হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫), মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২১), দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫), অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০), আবুল হোসেন (জ. ১৯২০), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী (১৯২১-১৯৮৮), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২) প্রমুখ। তাঁদের কবিতা এই উভয়বিধ কাব্যপ্রবণতার শিল্পসাক্ষ্য।

তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই কবিতায় ভাষা-বিন্যাস ও শব্দ ব্যবহারে সংগ্রামুখরতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ রাজনীতি চর্চার মধ্য দিয়ে শিল্পিত কবিতা চর্চা করে মানুষের কল্যাণকামনাই ছিল তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য। তাই রাজনীতি-ঘনিষ্ঠ কবিতার শিল্প-বিন্যাসে কবি হিসেবে তাঁরা দায়বোধে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সেই দায়বোধ জীবন ও সমাজের প্রতি, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি। সমাজ ও দেশভাবনা আর শিল্পিত কবিতার অভিনিবিষ্ট পথ নির্মাণ করতে পেরেছিলেন বলেই চল্লিশের এই কবিরা পূর্বসূরিদের চেয়ে পৃথক কবিকণ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বেড়ে ওঠেন পূর্ববাংলার কবি আহসান হাবীব। জীবনসংগ্রামের কারণেই নানা ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে তিনি কবিতার চর্চা করেছেন। দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বোধ তাঁর কবিতায় অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে পরিবেশিত হলেও তা কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শকে অনুরসরণ করেনি। ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর অর্জিত অভিজ্ঞতাই শিল্পসৃজনে তাঁকে মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধে আগ্রহী করে তোলে। তাই পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিত-পরিমণ্ডল অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আহসান হাবীবের কণ্ঠস্বর সরাসরি চল্লিশের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত।

১.১

উপর্যুক্ত কবিরা চল্লিশের দশকজুড়ে কিঞ্চিৎ আগে-পরে আবির্ভূত হয়েছেন বাংলা কবিতার পরিমণ্ডলে। তবে তাঁরা সবাই যে একই সময়পর্বে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কবিতার অঙ্গনকে আলোকিত করেছেন, তা তাঁদের কবিতায় প্রতিফলিত শিল্পচিহ্ন দেখলেই অবহিত হওয়া যায়। মানুষের সাধারণ অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে, বিশেষ করে যে-কোনো রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হওয়াই সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির জন্য স্বাভাবিক ছিল। আর কবিরা তো সব সময়ই হবেন সাধারণ্যের মুক্তির পক্ষে। ওই সময়ের উত্তুঙ্গ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আগাগোড়া মার্ক্সবাদী কবিব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয় বিশ্বসমর আর এর বিধ্বংসী প্রভাবে মুক্তির উপায় হিসেবে মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ কর্মপ্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল মার্ক্সবাদ। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা অথবা প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতা—দুইই ছিল সে সময়ে কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মে বহমান। সামাজিক-রাজনৈতিক দিক থেকে এর চেয়ে জটিল সময় পৃথিবী আর খুব বেশি দেখেনি। তাই সময়ের সচেতন প্রতিনিধি হিসেবে কবিরা স্বকীয় বিচারভঙ্গি নিয়ে মানুষের মুক্তি খুঁজেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় শৈশবকাল থেকেই স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শ পেয়েছিলেন। রাজনীতি আর তাঁর বেড়ে ওঠা ছিল একে অপরের পরিপূরক। সমর সেনের হাত ধরে তাঁর মার্ক্সীয় রাজনীতির সঙ্গে পরিচয়। কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮-১৮৮৩) তত্ত্ব তাঁকে আশাবাদী রাজনীতিতে উৎসাহিত করে তোলে। স্বদেশী আন্দোলনের আহ্বান ও প্রেরণা বালক সুভাষের মনে স্বভাবিকভাবেই নানা রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শেশব থেকেই নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার ফলে একপর্যায়ে ১৯৪২ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন; স্থান পান ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘের সাংগঠনিক কমিটিতেও। পার্টির কার্যক্রমে সক্রিয় থাকায় তখন তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। এভাবে জনমানসের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই গড়ে উঠেছে তাঁর শিল্পমানস। এ অবস্থায় রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে সাহিত্যচর্চা ছিল দুরূহ ব্যাপার। তার পরও তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন নিরলসভাবে। রাজনৈতিক আদর্শ লালনের পাশাপাশি কবিতার সঙ্গে জীবনের মেলবন্ধন প্রতিষ্ঠা সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতার বিশিষ্টতা।

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সুভাষ মুখোপাধ্যায় কাজে লাগিয়েছেন শব্দ, ছন্দ, উপমা আর চিত্রকল্পের বহুমাত্রিক ব্যবহারে।[৩] রাজনৈতিক আদর্শ আর ব্যক্তিক আদর্শ তাই তাঁর কবিতায় অসাধারণ দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে। সংগতকারণে 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) থেকে শুরু করে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক অরুণ মিত্রের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে উঠেছিল। রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা সত্ত্বেও তাঁর প্রকাশিত কবিতা বোদ্ধামহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

সৃজনপ্রয়াসে ছিল মানুষের প্রাধান্য। কবিমানস আর রাজনীতি—দুই চেতনা একাকার হয়েছিল বলেই তাঁর কোনো সাহিত্যকর্মই বৃথা যায়নি। শেষ জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কংগ্রেসি রাজীনীতিতে আশ্রয় নিলেও সুভাষ মনে-প্রাণে ছিলেন বামপন্থী চেতনার মানুষ। সেই চেতনাবলেই কবিতার ভুবনে আবির্ভাবকালে মানুষ আর শিল্পকে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি। দু-একটি পত্রিকার প্রকাশিত কবিতা পড়ার মুগ্ধতার জন্য এবং 'কবিতা' পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা প্রকাশের সুবাদে পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হতে থাকেন ওই কালের নবীন কবি ও রাজনৈতিক কর্মী সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এরই একপর্যায়ে ১৯৪০ সালে বুদ্ধদেব বসু আর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৯৩) পৃষ্ঠপোষকতায় 'কবিতাভবন' থেকেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক* বের হয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সামাজিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার সদিচ্ছার দিকে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। রাজনীতিকে তিনি যেমন জীবনমুখী করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন, তেমনি কবিতাকেও জীবনমুখী করার প্রত্যয়ে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, জীবনের প্রতিফলন যদি রাজনীতিতে থাকতে পারে, তবে তার পরিস্ফুটন কবিতাতেও সম্ভব। তিনি রাজনৈতিক সংগ্রামে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কবিতাসৃজনে কাজে লাগিয়েছেন। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কবিতা তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হতো। সুভাষ উপলব্ধি করেছিলেন জীবনকে, জীবনের নানা সংকটকে সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতিনৈতিকতায় সাজানো সম্ভব ভেতরের উপলব্ধি থেকে। আর এসবের ওপরই নির্ভর করে শিল্প ও শিল্পীর সার্থকতা। একজন শিল্পী কখনো এই কাজে অনায়াস সফলতা লাভ করেন, আবার কখনো মনে হয় তিনি যেন জীবনের সত্যিকার স্পন্দনকে চিত্রিত করতে পারছেন না। এই শিল্পিত আর্তিই তখন জীবনঘনিষ্ঠ কবিকে জীবনের আরও গভীরে প্রবেশ করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। সৃষ্টির জন্য তখন তিনি পৌঁছে যান জীবনের সদর্থক প্রান্তে।[৪] গণমুখিতা, প্রগতিপন্থাকে সঙ্গে নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় শামিল হতে চান জনমুক্তির বৈপ্লবিক সংগ্রামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসোন্মুখ পরিস্থিতিতে তিনি স্বাধীনতা ও সাম্যের বৈপ্লবিক সংগ্রামের কথা বলেছেন কবিতায়—বলেছেন মার্ক্সীয় সাম্যবাদের মাধ্যমে মানবিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য প্রত্যাশিত আলোর কথা। এই আলোকিত সরণির এই প্রথম পদাতিক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রুশবিপ্লব দ্বারা। তাঁর শৈশবকালের সমানবয়সী রুশ বিপ্লবের প্রেরণায় তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। বিগত যুদ্ধের ধ্বংসচিহ্ন আর রুশ বিপ্লবের ইতিবাচকতা তাঁকে স্পর্শ করেছিল—একজন কবিপ্রতিভাসম্পন্ন শিশুর চেতনাকে দৃঢ় প্রত্যয়ে আবিষ্ট করতে তা ছিল অত্যন্ত ব্যতিক্রমী বাস্তবতা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বসমরের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হলেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভয়াবহ ঘাত-প্রতিঘাত তাঁকে নিবিষ্ট করেছিল প্রাতিস্বিক জীবনবোধের সন্ধানে।

বস্তুত ত্রিশের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবিদের পর চল্লিশের সমাজ-সচেতনামূলক কবিতা ছিল যুগ ও কালের দাবির প্রকাশ। সময়ের অনিবার্যতা সমকালীন কবিতাকে যেভাবে হতাশ ও নিরাবেগ করে তুলেছিল, তা থেকে উত্তরণের জন্য এবং কবিতাবিমুখ পাঠককে কবিতায় ফেরানোর দায়িত্বও পড়েছিল চল্লিশের কবিদের ওপর। তাঁরা পাঠকদের আকৃষ্ট করলেন তৃণমূল সংলগ্ন হয়ে; প্রকাশ ও প্রচার করলেন নিজেদের দায়বদ্ধতা, বাংলা কবিতায় ধ্বনিত হলো নতুন সুর—সাম্যবাদী জীবনাদর্শ। তবে তাঁরা ত্রিশের কবিদের নির্মিত আধুনিক আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন—বিশেষ করে ছন্দের মুক্তির ক্ষেত্রে। কবিতার আধুনিতাকে তাঁরা পেয়েছিলেন পূর্বসূরিদের হাত ধরে। নজরুল পরবর্তী কাব্যচর্চায় সমাজমুক্তির যে আবহ বিরাজ করছিল, চল্লিশের কবিরা যেন তাকেই জীবন্ত করলেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়সহ উপর্যুক্ত কবিরাই ছিলেন এই পথের নির্ভীক যাত্রী। মূলত চল্লিশের কবিতা সমাজ-সচেতনতারই বাস্তবানুগ শিল্পিত পরিবেশনা।

Dhaka University Institutional Repository

'জীবনের জন্য শিল্প' আর 'শিল্পের জন্য শিল্প'—এই দুটি প্রত্যয়ের প্রথমটিকেই মননে ধারণ করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাই শিল্প এবং সমাজ আর মানুষ সবই মুখ্যত ভাস্বর হয়ে ওঠে তাঁর কবিতায়। যেমন নিচের পঙ্‌ক্তিতে কাব্যশিল্পের পাশাপাশি নিজেকে মানবিক নির্ভীকতায় বড় করে তোলার প্রয়াস লক্ষণীয় :

আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে;
আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে।

("সকলের গান", পদাতিক)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন, সমাজ-সমকাল, ব্যক্তি, শিল্প-সাহিত্য—এর কোনোটিই নিরপেক্ষ নয়। আর সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হলো জীবনের সার্থকতাকেই অস্বীকার করা। তাঁর শিল্পচর্চার মর্মমূলে এই বিশ্বাসের বাস্তবতা দৃশ্যমান। জীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সংগ্রামমুখরতায় এবং এখান থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা তিনি প্রয়োগ করেছেন তাঁর নির্মিত কাব্যশরীরে। আপন উপলব্ধি থেকে তিনি শব্দের শক্তিকে রূপান্তরিত করেছেন তাঁর আলোকিত কাব্যের ভুবনে। তাই তো তিনি বলতে পারেন :

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।
আমি যেন আমার কলমটা ট্র্যাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি—
এই আমার ছুটি—
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।

("আমার কাজ", *কাল মধুমাস*)

সমাজের প্রতি অসম্ভব দায়িত্বপূর্ণ হার্দিক অবস্থান কবি সুভাষের। কিন্তু তীব্র ঘৃণা ব্যক্ত করেন সমাজের অব্যবস্থাপনার প্রতি। মিথ্যা, ভণ্ডামি আর প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর কাব্যভাষা সমকালীন আন্দোলনে প্রাণ-সঞ্চার করে। অসম্ভব শ্লেষাত্মক পঙ্‌ক্তি তিনি প্রকাশ করেন অচল, অসুস্থ ও স্বার্থপর মানুষের বিরুদ্ধে। তাই তিনি ফুলের চেয়ে আগুনের ফুলকিকেই বেশি ভালোবাসেন। কেননা, তা দিয়ে অন্তত মুখোশ বানানো যায় না। ফুলের মতো পবিত্রতার প্রতীক ব্যবহার করে মানুষ নিজের মুখোশ হিসেবে। আর তা-ই মানুষ ব্যবহার করে জিঘাংসা বাস্তবায়নে। সংগতকারণে ফুলের প্রতি কবি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেন। তাই তিনি বলেন:

ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনোদিনই আমার টান নেই।
তার চেয়ে আমার পছন্দ
আগুনের ফুলকি

Dhaka University Institutional Repository

যা দিয়ে কোনোদিন কারো মুখোশ হয় না।

("পাথরের ফুল", *যত দূরের যাই*)

তবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যভাষা ও শব্দবিন্যাস তাঁর নিজস্ব। পাশাপাশি এও সত্য যে চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতায় জনসংশ্লিষ্ট যে ভাষা প্রত্যাশিত ছিল, ঠিক তেমনই ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়সহ ওই সময়কার মূলস্রোতের কবিদের নির্মিত কাব্যভাষা।

১.২

চল্লিশের দশকের দুজন প্রধান কবি তিরিশের দশকে কবিতা লিখেছেন। তাঁদের একজন সমর সেন। অন্যজন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। দুজনই প্রথম থেকেই সমাজ-সচেতন কবিতা লিখেছেন। দুজনই তখনকার কলকাতা নগরের বাস্তবতায় কবি হয়ে উঠেছেন। চল্লিশের সামাজিক দায়বদ্ধ কবিতার সূত্রপাত ঘটেছে তাঁদের হাত ধরেই। সমর সেনের কবিতায় মাঝেমধ্যে রোমান্টিকতা উঁকি দিলেও তাঁর কবিতার প্রধান লক্ষণ ব্যঙ্গ ও শ্লেষের মধ্য দিয়ে সমাজের নানা সংকটের ভাষিক চিত্রায়ণ। কেননা, রাজনীতি-সচেতনতা, সমাজ-মনস্কতা, গণমুখিতা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি পক্ষপাত তাঁর কবিতায় প্রবল। আর এই ধারাটিই হলো চল্লিশের কবিতার প্রধান ধারা। এ ছাড়াও বাংলা কবিতায় মার্ক্সীয় সাম্যবাদী চেতনার প্রধান রূপকারদের মধ্যে তিনি একজন। পুঁজিবাদী সমাজ-সভ্যতার বিকৃত, বিকলাঙ্গ, অবক্ষয়ী চিত্র এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যন্ত্রণা নাগরিক জীবনকে তির্যক দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন তিনি। তথাকথিত আশাবাদের চেয়ে তাঁর কবিতায় সামষ্টিক হতাশা আর নৈরাশ্যই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ এবং জীবন ও সমাজে যা কিছু অন্ধকার, অশুভ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর, আত্মগ্লানি ও স্ববিরোধিতা—তার বিরুদ্ধে এবং প্রচলিত কাব্যরীতি ভেঙেচুরে নতুন রূপে সাজানো সমর সেনের কবিতার অন্যতম প্রধান প্রবণতা। তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নব নব রূপ, অপশাসনের ফলে সৃষ্ট সমাজের ওপর অহেতুক চাপ, বিবর্ণ নগরীর বিচ্ছিন্ন, অস্তিত্বহীন জীবন, নির্বাধ মধ্যবিত্ততা, বণিকসভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা, বৃহৎ সমাজ-স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধ এসবই তাঁর কবিতায় বিদ্রোহের উৎস।[৪]

সমর সেনের কবিতা যুগযন্ত্রণার নানা বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করলেও মূলত তিনি নাগরিক কবি। কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রথমদিকে মধ্যবিত্তসুলভ প্রবণতার কারণে রোমান্টিক স্বপ্নচারণার পথেও কবিতা নির্মাণ করেছেন তিনি। তবে এর মধ্যেও তিনি জীবনের কদর্য রূপকেই তুলে ধরেছেন কবিতায়; ব্যক্তিমনের পাশাপাশি রোমান্টিক ভাবনিমজ্জনের বিভোর চোখে দেখেছেন চারপাশ। সংগতকারণে ব্যক্তিমনের সহজাত কামনা-বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর শুরুর দিককার কবিতাবলিতে। বলা যায়, তাঁর ওই সময়ের কবিতায় অনুভূতিই প্রাধান্য পেয়েছে অভিজ্ঞতার চেয়ে। এমনকি এই সময়ের কবিতা নিয়ে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে তিনি নাগরিক কবি হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যান। কেননা, তাঁর কবিতায় তখনকার জীবনের ক্লেদ ও গ্লানির ধূসরতা চিত্রিত হয়েছে। নগর ও সাধারণ নাগরিকের যাপিত জীবনের দৃশ্যপটের পর্যবেক্ষণ, নৈরাশ্য, হতাশা, জীবনের ক্লান্তি—এসবই তাঁর স্মৃতি আর স্বপ্নে রূপময় হয়ে ধরা পড়েছে রোমান্টিক চোখে:

রাত্রির শেষে
রাস্তার ধুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে
ধাবমান মটরের উদ্ধত বেগ;
চারিদিকে ব্লিচিং পাউডারের তীক্ষ্ণ গন্ধ।
'তুমি কি আজ আসবে?'

Dhaka University Institutional Repository

নীল, নীল চোখে শরীরের শেষহীন প্রশ্ন
ভিজে ফুলের মতো নরম প্রেম—
'নিশ্চয়ই আসব'—
বিশ্বের প্রেম মৃত্যুহীন, তা ছাড়া একসঙ্গে রাত্রে শোবার দুর্লভ সুযোগ।

("বিতর্ক", *গ্রহণ*)

ওই সময়ে সমাজের ক্লেদ আর কদর্যতা, মানুষের নষ্টনীড়, বিষণ্নতায় বিগলিত স্বপ্ন, প্রতিদিন পত্রিকায় নারী ধর্ষণের খবর তাঁকে ক্রমান্বয়ে শানিত করে তোলে সাম্যবাদের আদর্শে। আর তাই তিনি নগর সভ্যতার এই বীভৎসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকাশের জন্য কবিতা লিখে গেছেন মার্ক্সীয় প্রত্যয় থেকে। কবিতায় তাঁর শব্দ ব্যবহার ও ভাষার গাঁথুনিতে বিষয়টি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের কবিতায় চল্লিশের দশকে বিশ্বজুড়ে ঘটে যাওয়া জিঘাংসার মাতম বেশি জায়গাজুড়ে স্থান পেতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং রাজনৈতিক আগ্রাসন-বিরোধিতায় তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিজেকে শামিল করেছেন। ভাষা এবং শব্দের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারে এর প্রমাণ মেলে। যেমন তিনি কবিতায় অনায়াসেই ব্যবহার করেন 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, বণিক বরবাদ' প্রভৃতি শব্দাবলি।

কারখানায় ধর্মঘট,
গ্রামে বাজনা বন্ধ করো,
জমিদার বণিক বরবাদ
ইনকিলাব্ জিন্দাবাদ
অর্থাৎ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
... ...
যতদূর চোখ যায়, লৌহরেখা প্রসারিত
নির্বিকার অদৃষ্ট রেখায়।
অন্নজলহীন মৃত্যু হয়ত,
ভবিষ্যতে হয়ত দুর্ভিক্ষ, চকিত প্লাবন।

("রোমন্থন", *নানাকথা*)

নিজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও এই শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে সমর সেন মোটেও আশান্বিত হননি। মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্য, ক্রমক্ষীয়মাণ চেহারা তাই তাঁর কাব্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি এই শ্রেণির আত্মসুখজনিত পিছুটান, স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদী প্রবণতা, সাধ্য ও প্রয়োজনীয় স্বপ্নবিভোরতা সমর সেনকে ক্রমাগত হতাশায় পর্যবসিত করেছে। তাই সমাজের সার্বিকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে, নিজ শ্রেণিকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করতে ছাড়েননি। এসব যখন তাঁর কবিতার বিষয়, তখন ভাষা ও শব্দের স্বকীয় ব্যবহার তাঁকে স্বতন্ত্র ও মৌলিক কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এমনকি কবিতার শরীরে অন্যান্য উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ ও বিশ্বপরিস্থিতিকে যে কষাঘাত তিনি করেছেন, তা তাঁকে চল্লিশের কবিতার মূল ধারার মধ্যে রেখেও আলাদা কবিকণ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, কূপের মণ্ডুক
ছাপোষা মানুষ,
কেননা আমার একান্ত কামনা
তিলকে তাল করার ভ্রান্তি পার হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আত্মকরুণার ক্লান্তি পার হয়ে
সহজ জীবনের সহজ বিশ্বাসে ফেরা।

("লোকের হাটে", *সমর সেনের কবিতা*)

কবিত্বের মৌলিকতার অন্যতম শর্ত যদি শব্দ ব্যবহারের স্বকীয়তার ওপর নির্ভর করে, তাহলে বলতে হবে, সমর সেনের কবিতায় তার প্রতিফলন যথোপযুক্তই রয়েছে। তিনি নিজস্ব শাব্দিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তার পরিচর্যা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। কবির ইন্দ্রিয়-সচেতনতা, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, জীবনবোধ, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির বিচিত্র মিথস্ক্রিয়ার সংশ্লেষ থাকে। সমর সেনও এর ব্যতিক্রম নন, তাঁর কাব্যভাষা ও কবিতার শব্দরূপ তাঁর চৈতন্যেরই অনুগামী। সমর সেন নাগরিক কবি, কলকাতার কবি, মার্ক্সবাদী কবি ইত্যাদি অভিধায় খচিত হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে মূলত তাঁর কবিতার শব্দরূপ এবং অন্যান্য অলঙ্কাররের ব্যবহার। রাজনীতির সংক্ষোভ, মতাদর্শের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দোলাচলে ব্যক্তিক মননজিজ্ঞাসায় তাঁর কবিতা প্রবলভাবে আন্দোলিত। শব্দ তাই তাঁর কবিতায় চেতনার ভাবানুষঙ্গে নবরূপ লাভ করেছে।[৫] যেমন:

এক
আমি রোমান্টিক নই, মার্ক্সীস্ট।
অনেকে জিজ্ঞাসা করে; গুরুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে
তোমার তফাৎটা কী? তফাৎটা এই:
বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বরাবর
অক্লান্ত বাউল, একই নৌকায়
একঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন
কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ-কবিকে বিপুল যশোদা
নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।

("সাফাই", *তিনপুরুষ*)

দুই
সময়ের চূর্ণ পাহাড়ে পিঙ্গল মানুষেরা মরে
কর্কশ কাকের কণ্ঠে শুনি ধ্বংসের গান

("ঘরে বাইরে", *গ্রহণ*)

তিন
চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই
নিবিড় মিতালী মহাজন ও শকুনে!

("২২ শে জুন ১৯৪৪", *তিনপুরুষ*)

মহাসমর মন্বন্তর আর সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়েও '৪৫-'৪৬-এর উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ কবিদের প্রতিবাদী হওয়ার রসদ যুগিয়েছিল। সমর সেনও ওই সময়েই সবচেয়ে বেশি সমাজবাদী কবি হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। দেশবিভাজনের ফলে এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সংকটের কারণে মানুষ খাদ্য ও কাজের সংকটে পড়ে উপায়ান্তর না দেখে অস্তিত্বের শেষ ভরসার স্থল হিসেবে শহরমুখী হয়। এতে বাড়তে থাকে উদ্বাস্তু-সমস্যা, যা পরে প্রকট আকার ধারণ করে। এই বিষয়গুলো সমর সেনের কবিতার শরীরে সরবেই স্থান দখল করে আছে। গত শতকে যন্ত্রশিল্পের সহসা-বিপ্লবের স্পর্শে গ্রামের চেয়ে শহর অতিমাত্রায় পরিবর্তিত হয়েছে। 'কর্মতৎপরতা বাড়াতে এবং জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে শহরের মানুষ যন্ত্রকে ডেকে এনেছে ঘরের আঙিনায়। যন্ত্রের সাহায্য নিয়েছে—কিন্তু যে দানব, এ বোধ অন্যান্য কবির মত সমর সেনকেও ব্যথিত করেছে। সভ্যতার গতি বৃদ্ধি পেয়েছে বাস, ট্রাক, ট্রাম, ট্রেনের গতিবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে; কিন্তু সাথে সাথে হারিয়ে গিয়েছে গ্রামের স্বাভাবিকতা। গ্রামের সেই প্রাণ

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টির উন্মাদনা যেন শহরের নেই। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধে পিষ্ট শহর কোলকাতা বন্ধ্যা নারীর মত শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য মেলে ধরেই খুশী।...সমর সেনের কবিতায় সে শহরই মূর্তিমান।'[৬]

১.৩

কবিতাচর্চার প্রথমদিকে ত্রিশের কবি বিষ্ণু দের কাব্যপ্রভাব থাকলেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অচিরেই তা কাটিয়ে উঠে স্বকীয় কাব্যভূমে নিজেকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। আর চল্লিশের দশকে কাব্যচর্চা শুরু হলেও তাঁর মৌলিকতার প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায় পঞ্চাশের শুরু থেকেই। তবু তাঁর কাব্যদেহে চল্লিশের মূল প্রবণতাই পরিদৃষ্ট হয়। সময়ের তাড়নায় যেসব প্রগতিশীল কবির মন-মানস ইতিবাচক দিকে পরিবর্তিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। দেশভাগের সচেতন দর্শক তিনি—দেখেছেন ওই সময়ের সাধারণ মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। মন্বন্তর, দাঙ্গা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়—এ সময়ের অন্যান্য কবির মতো তাঁকেও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় আকীর্ণ করেছিল। এ জগতের নানা প্রতিকূলতা তাঁকে বারবার আশাহত করেছে, বেদনাবিষ্ট করেছে। এমনকি তাঁর কবিতা কখনো কখনো বিষাদকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। তবু তিনি নিরাশ হয়ে যাননি। বরং তাঁর কবিতা আশাবাদী মনোভাবেরই পরিচায়ক। তাঁর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কাব্যভাষার বক্তব্যধর্মিতা। তবে বক্তব্যকে ছাপিয়ে বিষয়ের চিত্ররূপ নির্মাণেও তিনি পারঙ্গম। ফলে তাঁর কবিতায় ন্যারেটিভ-এর সঙ্গে মিশেছে চিত্রধর্মিতার বিরল মিশেল। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনীতি সচেতনতা উত্তরকালে আরো সংহত হয়েছে। কবিতায়ও পড়েছে তার ছাপ।

চল্লিশের কবিতার মূল সুর সাম্যবাদ ও রাজনীতি-ঘনিষ্ঠতাকে, আত্মস্থ করেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অর্জন করেছিলেন স্বাতন্ত্র্য। এই স্বতন্ত্রতা তাঁর প্রকাশকৌশল ও ভাষা ব্যবহারের মুন্সিয়ানায় নির্মিত। 'প্রেম হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায় আত্ম-উপলব্ধির এক অনিবার্য শক্তি। প্রেমের শিখায় তিনি জ্বলতে দেখেছেন জীবনকে, পুড়ে যাওয়া স্বপ্নকে, বিপ্লবের সম্ভাবনাকে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখেছেন প্রেমের আগুনে। সেই জন্য চল্লিশ দশকের কাব্য-স্রোতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থান একটু স্বতন্ত্র। কারণ তিনি সমকালীনতার জোয়ারে কখনো ঝাঁপ দেন নি। বীরেন্দ্র প্রশ্নহীন, অনুগত পার্টির কর্মী হওয়ার বদলে, সময়ের প্রথানুযায়ী স্রোতে গা না ভাসিয়ে, লিখেছেন প্রত্যক্ষ কবিতা। চল্লিশের নানা আন্দোলন তাঁকে আলোকিত করলেও তিনি সংহত থেকেছেন সাম্যবাদী চেতনার মানবিক প্রত্যয়ে।'[৭] দ্বিতীয় মহাসমরোত্তর মন্বন্তরের চিত্র, অন্ন ও মানবিক সংকট উঠে এসেছে তাঁর নিম্নোক্ত কবিতায় :

সর্বত্রই এক ক্লান্তি, শোলক ফুরুলে
চুলের আবীর নিয়ে ঘুমায় স্বপ্নের শিশু ঠাকুরমার কোলে
আকাঙ্ক্ষায় পুড়ে যায় রূপকথার নক্ষত্রের অদৃশ্য কপাল
একাকী যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা ট্রেনে চুরি করে
দুর্ভিক্ষের চাল।

("দোল ও পূর্ণিমা", *রাণুর জন্য*)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার একটি মুখ্য বিষয় হলো দুর্ভিক্ষ। অত্যন্ত মানবিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন কবি হিসেবে তিনি সচেতন ছিলেন বিষয় অনুযায়ী শব্দ প্রয়োগেও। মন্বন্তরের স্মৃতি তাঁকে পীড়িত করেছে, এর মারণান্তিক প্রতিক্রিয়া তিনি উপলব্ধি করেছেন সাধারণের কাতারে এসে। যেমন:

অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা
অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র আরাধনা।

Dhaka University Institutional Repository

সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস করো ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।

("অন্নদেবতা", *মুখে যদি রক্ত ওঠে*)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় নির্দিষ্ট অর্থের পাশাপাশি শব্দকলার যথোচিত ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতায় অনায়াসে প্রাধান্য পেয়েছে জীবন-সংগ্রাম—যেখানে জীবনের সংঘাতই স্ফুরিত হয়। ওই সময়ের সাপেক্ষে তিনি ছিলেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজের কবি। তাই তাঁর কবিতায় মূর্ত জীবনের রূপরচনার লক্ষ্যটি সুনির্ধারিত; সংঘাতময় জীবনচেতনার প্রকাশ-বাসনায় গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতার প্রার্থিত শব্দজগৎ। তাঁর ছন্দকাঠামোর ভেতরেই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে করেন শব্দের স্বকীয় ব্যবহার। যেমন :

১. আসমানী ওড়নার মেঘজরি পরীর পাখার মতো সে
দেখেছি তাকে
কেঁপেছে আলতা-গলা সমুদ্দুরে, হেসেছে লাল পলাশ-ছেঁড়া বাতাসে,
দেখেছি তাকে;
আবিরের মতো রাঙা কৃষ্ণচূড়ায়।

("মাতলামো", *তিন পাহাড়ের স্বপ্ন*)

২. আয় কালবৈশাখী হাওয়া, উড়িয়ে নে
শুকনো আবর্জনা, ধূলো, মৃত্যু, অপমান !
আন বুকে স্পর্ধা, কণ্ঠে জীবনের গান
অন্ধ, বোবা আমার স্বদেশ

("মে-দিন ১৯৬৫", *মহাদেবের দুয়ার*)

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৃথিবী শ্রেণিহীন সমাজের স্বাপ্নিকতায় গড়া। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন শ্রেণি-বিভেদহীন এক মানবতাবাদী সমাজের—যেখানে থাকবে 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে' অবস্থান মানবতার জয়গান।

১.৪

চল্লিশের দশকের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য সমকালীনতা, গণমুখী চেতনা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, প্রতিবাদী ধারা ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ধারণ করেছিলেন তাঁর কবিতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারত বিভাগ—এসব অনিবার্য ও যুগচঞ্চল ঘটনার ছাপ তৎকালীন অন্যান্য কবির মন-মানসের মতো মঙ্গলাচরণের ওপরও তীব্র প্রভাব ফেলেছিল। তিনিও ওই সময়ের শ্রেষ্ঠ সমাজ-সচেতন কবিদের একজন। ছেচল্লিশের হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রক্তবন্যা বয়ে দিয়েছিল, তা ছিল ভয়াবহ। মন্বন্তর এবং এই দাঙ্গার ফলে স্বদেশে সৃষ্ট বিপর্যস্ত পরিস্থিতি দেখে হতাশায় বিমর্ষ হয়েছিলেন মঙ্গলাচরণ। পাশাপাশি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন চল্লিশের কবিতার চৈতন্যময় উজ্জ্বলতার কথাও। বুদ্ধিসংবেদী কবিতা নয়, ব্যাপ্ত সমাজের অখণ্ড জীবনবোধসম্পন্ন কবিতাকেই মঙ্গলাচরণ মহৎ ও তাৎপর্যময় কবিতা হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। আর এটি চল্লিশের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যও। তাই দেশের মাটি আর মানুষের ভালোবাসাই হয়ে উঠল তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় ভাব। শ্রেণিবৈষম্য, সমাজদ্বন্দ্ব, গণমুখী চেতনাসহ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে রূপায়িত করতে গিয়ে মঙ্গলাচরণ বিপন্ন স্বদেশকেই চিত্রিত করেছেন। যেমন :

আমি কি জানি তোর কত দুঃখ? দুঃখী দুয়োরাণী

Dhaka University Institutional Repository

মা তোর থমথমে মুখে কোন অশ্রুসমুদ্র বিস্তার?
আমিই কি বুঝি বুকে কী আগুন বন্দিনী সীতার!
বিবস্ত্রা দ্রৌপদী কেন ছিন্নমস্তা আমিই কী জানি!
... ...
মিথ্যে এই কাকবাসা ভেঙেচুরে একবার আয়
আমার দগ্‌দগে বুক মাড়িয়ে, ঘা দিয়ে পায়ে পায়ে
ঝরিয়ে দরদর রক্ত, যন্ত্রণায় জারিয়ে মহিমা
আয় জন্মদুঃখিনী মা, রক্তে আলতা পরাই দু'পায়ে।

("হায় জন্মদুঃখিনী মা", *মেঘবৃষ্টিঝড়*)

মঙ্গলাচরণ সাম্রাজ্যবাদী শোষণে বিপর্যস্ত দেশমাতৃকার অবয়বকে কবিতায় প্রয়োগকৃত শব্দে এক অনুপম ভাবানুষঙ্গ যুক্ত করেছেন। এখানে মায়ের সঙ্গে সন্তানের গভীর, নিবিড় সম্পর্ক হেতু 'তোর' এবং দুঃখ 'মোচানো' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা লোকজ জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ ছাড়া 'দুঃখী দুয়োরাণী', 'অশ্রুসমুদ্র', 'বুকে কী আগুন বন্দিনী সীতার', 'বিবস্ত্রা দ্রৌপদীর ছিন্নমস্তা'—এমন মিথ ও পুরাণঘনিষ্ঠ শব্দাবলি ব্যবহার তাঁকে অনেক জনঘনিষ্ঠ ও ঐতিহ্যঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন। ছিন্নমস্তা দেবীর অলক্ষে এখানে 'দগদগে' বুক 'দরদর রক্ত' ঝরানো শব্দসমূহ তিনি ব্যবহার করেছেন আন্দোলন-সংগ্রাম ও জীবনগন্ধী করে। সাম্যবাদী জীবনচেতনাকে যে মঙ্গলাচরণ গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে পরিচর্যা করেছেন, উপর্যুক্ত শব্দাবলির স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারই তার প্রমাণ।

সমকালীন রাজনৈতিক সংঘাতে সৃষ্ট শ্রেণিদ্বন্দ্বের বিষয়গুলোকেও মঙ্গলাচরণ কবিতায় রূপায়িত করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। সাঁওতাল বিদ্রোহ, বাংলার নীলচাষ, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে কবিতায়। আর সমাজমনস্কতা ও সাম্যবাদী জীবনবোধ কবিতার মূল সুর হওয়ায় তাঁর কবিতায় বরাবরই স্থান করে নিয়েছে নির্যাতিত, বঞ্চিত, শ্রমজীবী মানুষ, অসহায় কৃষকের জীবনচিত্র। সমকালীন রাজনীতির জটিল আবর্ত, দেশবিভাগ, যুদ্ধ, দাঙ্গা, স্বার্থসর্বস্ব দলীয় রাজনীতির আপসকামিতার বিপরীতে মঙ্গলাচরণ কবিতায় জনসংগ্রাম, ব্যাপ্ত সমাজবোধ ও সাম্যবাদী চেতনার প্রতি অবিচল আস্থা রেখেছেন। আর এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা। যেমন :

জন্মে মুখে কান্না দিলে, দিলে ভাসান ভেলা
একূল-ওকূল দু'কূল মজা কালনাগিনীর দ'য়
জলকে দিলাম সাঁতার দিলাম ঢেউকে হেলাফেলা
ভয়কে দিলাম ভরাডুবি-কান্না আমার নয়।
... ...
একটি আশা অনেক মুখের পাপড়িতে মুখ মেলে:
এক নামে যেই ডাকলে—অ-নে-ক হলাম যে একজনা।
ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা।

("জননী যন্ত্রণা", *কটি কবিতা ও একলব্য*)

মূলত একদিকে ব্রিটিশ আগ্রাসন, অন্যদিকে বিশ্ব ফ্যাসিবাদ—বিবেকী মঙ্গলাচরণ এই তিমিরময় চক্রাবর্তে ঠিক করে নিয়েছিলেন তাঁর কাব্যাদর্শ। তিনি ওই সময়ের একজন হয়ে দেখতে পেয়েছিলেন, মানুষ তার অন্তরের ঘনিষ্ঠ উত্তাপ দিয়ে যে দেশ রচনা করে চলেছে, এই দেশ সেই কাঙ্ক্ষিত নবজন্ম পাচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বহির্বিশ্বের পরিস্থিতিতে জীবনের গতিপথে হঠাৎ চমক লাগে, হঠাৎ তা বদলেও যায়। সমাজ-সভ্যতা হয়ে ওঠে অহংকারী। তাই এই সভ্যতার বিপর্যয় অনিবার্য। তাই তাঁর কবিতার শব্দ নির্বাচন থেকে শুরু করে ভাষার কারুকার্য নির্মাণ, ছন্দ ব্যবহার থেকে শুরু করে কাব্যশরীরে প্রযুক্ত উপমা ও চিত্রকর্মের ব্যবহারেও আছে স্বাতন্ত্র্যের ছাপ, যা সহজেই সাধারণ মানুষের চেতনার সঙ্গে যোগাযোগ-সক্ষম। আর তাই এ কবির কবিতায় মানুষ নিবিষ্ট চিত্তে অবলোকন করতে পারে নিজের ইতিহাসকে, ইতিহাসের উপাদান ও চরিত্রকে। এ প্রসঙ্গে এবং কবি মঙ্গলাচরণ সম্পর্কে গবেষক জহর সেনমজুমদারের বক্তব্য স্মরণীয়:

> ... মঙ্গলাচরণের কবিতার প্রধান সম্পদ মর্মমূল থেকে উঠে আসা বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ। বৈপ্লবিক জাগরণ-এর সলতে-পাকানো। আর তার জন্য হাসনাবাদ থেকে ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর থেকে কাশ্মীর সর্বত্র মানবিক শিখা ছড়িয়ে দেবার দরকার। গণমানুষকে সংগ্রামী প্রাণশক্তিতে ভরপুর করে তোলা দরকার।...মঙ্গলাচরণের কবিতায় তোরাপ আসে, তিতুমীর আসে, স্বপ্ন নিয়ে। আর সেই স্বপ্ন সামনে রেখেই ভুখা জখ্‌মি মানুষেরা পরবর্তী প্রজন্মের লালঝাণ্ডা হয়ে ওঠে। লাঠি-গুলি-কাঁদানে গ্যাসের মধ্য দিয়ে তোরাপ-তিতুমীরদের স্বপ্ন প্রবল হয়ে বেঁচে থাকে। ১৯১৭ সালে নভেম্বর (sic) বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানব-ইতিহাসে যে পালবদলের বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, সেই বিপ্লবের সূত্রে তারা উপলব্ধি করতে শিখলো আমি-তে আবদ্ধ থাকার মানে মৃত্যু। 'আমরা'-র মধ্যেই গতিশীলতা ও জাগরণ। সমকালের রাজনীতিকে মঙ্গলাচরণ জীবনের গভীরে স্থাপন করে 'আমি' থেকে 'আমরা' হয়ে লিখেছেন।[৮] যেমন :
>
> ...জমি চাই, কাজ চাই এ-জীবনে বাঁচতে চাই
> শান্তিতে বাঁচার অধিকার,
> শান্তি চাই আমি।
> প্রাণখোলা হাসি চাই, প্রাণ চাই, গান চাই
> স্বাধীন চিন্তার শান্তি
> শান্তি চাই আমি।
> আমার স্বদেশকে চাই, স্বাধীন বাংলাকে চাই,
> বাপ-মা-বোনের শান্তি
> শান্তি চাই আমি।
>
> ("শান্তির মশাল", *তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা*)

১.৫

বাংলা সাহিত্যের ক্ষণজন্মা গুরুত্বপূর্ণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। বিশেষ করে, গত শতকের চল্লিশের দশকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিদের একজন তিনি। নজরুল-পরবর্তী সময়ে সুকান্তই কাব্যজগতের বিরল বিদ্রোহী, যিনি পরাধীনতার বিরুদ্ধে, ক্ষুধা-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, সমকালীন রাজনীতি-সমাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধে ছিলেন মুখর। কিশোর কবিখ্যাত সুকান্ত মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হয়ে মানুষকে খুব আপন করে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের স্থায়ীত্বকালের সমানবয়সী কবিজীবন ছিল তাঁর। মাত্র ছয় (১৯৪১-১৯৪৭) বছরের সাহিত্যজীবনে তিনি যা সৃষ্টি করে গেছেন, তা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য, ভারতীয় উপমহাদেশের মুক্তিকামী মানুষের জন্য, সর্বোপরি বিশ্বের অধিকারবঞ্চিত ও শোষিত মানুষের জন্য চিরদিনের অনুপ্রেরণা। তাই নজরুলের মতো সুকান্তও সাম্যের কবি, সাম্যবাদের কবি। তবে সাম্য ও সাম্যবাদের তাত্ত্বিক উপলব্ধিতে দুজন কবির মনোলোক অভিন্ন নয়। চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতার অঙ্গনে যেসব কবির অংশগ্রহণে সাম্যবাদী ধারা প্রতিষ্ঠা পায়, তাঁদের মধ্যে সুকান্তের ছিল

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রণী ভূমিকা। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে বেড়ে ওঠা, কৈশোরেই মার্ক্সবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অনুপ্রেরণায় গণসাহিত্য রচনায় উৎসাহ, কিশোর ও শ্রমিক সংগঠনের কর্মী হিসেবে সক্রিয়তা, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ, মন্বন্তরের সময় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা, বাল্যবয়সেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ (১৯৪৪)—এই সব ঘটনা সুকান্তের মনে নতুন জগৎ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মন্বন্তরপীড়িত ক্ষুধার্ত জনতাকে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনব্যবস্থায় সহায়তা করতে তাঁর নিষ্ঠা ও সততা ওই সময় সবাইকে মুগ্ধ করেছিল।

শোষকের বিরুদ্ধে মারণবাণী উচ্চারণ হয়তো মাঝেমধ্যে কবিতার মূল শক্তিতে ব্যাঘাত ঘটায়, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে গত শতকের জনমুখী আন্দোলনে সুকান্তের কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা বিশাল জনসমাজকে তাদের দাবি আদায়ে সোচ্চার করে তুলেছিল। যেমন *ছাড়পত্র* কাব্যের 'বোধন' কবিতাটি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

শোন্ রে মালিক , শোন্ রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাঁড়—
হিসাব কি দিবি জমা তার?

প্রিয়াকে আমাকে কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।

("বোধন", *ছাড়পত্র*)

সুকান্ত ভট্টাচার্য বুঝতে পেরেছিলেন, শোষিত, সুবিধাবঞ্চিত, শ্রমজীবী মানুষের জাগরণ ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয়। সময়ের বাস্তবতার উপলব্ধিই তাঁকে সংগ্রামমুখর জনতার মাঝে অধিষ্ঠিত করেছিল। তা ছাড়া তাঁর ধ্যান-জ্ঞানে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্য। তাঁর লেখা একটি চিঠিতে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন, 'আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হবো, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তাছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই।'[৯]

আকাল, মহামারী, অবক্ষয় আর মৃত্যু-উপত্যকায় পর্যবসিত ভারতবর্ষের জনঘনিষ্ঠ কবি ছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাই সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে তিনি যেসব কবিতা সৃষ্টি করে গেছেন, সেসবের শরীরেও তিনি বিষয়ানুগ ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ করেছেন। শুধু বিষয় নির্বাচনে নয়, কবিতায় ভাষা ও শব্দপ্রয়োগে তিনি অকৃত্রিমতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। প্রতিটি কবিতায় তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা অবশ্যই জনমুখী শব্দের গাঁথুনিতে মানবিক চেতনাকে উচ্চকিত করেছে। যেমন:

এক আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে
জমে ভিড় ভ্রষ্ট নীড় নগরে ও গ্রামে
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।

("বিবৃতি", *ছাড়পত্র*)

Dhaka University Institutional Repository

দুই কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময়:
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।
("হে মহাজীবন", *ছাড়পত্র*)

প্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য হার মানে মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি ক্ষুধার কাছে। শোষক-শোষিত আর ক্ষুধা-দারিদ্র্যের চিত্র সুকান্তের কবিতায় স্পষ্ট। সময়ের বাস্তবতায় তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে একদিকে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-মহামারি, অন্যদিকে ধনিক-বণিক-জোতদার, কালোবাজারি ও অতি মুনাফালোভীদের কারসাজিতে সৃষ্ট দুর্বিসহ সামাজিক পরিস্থিতির চিত্র।

সুকান্তের কবিজীবনের বাস্তবতা আর তাঁর কবিতায় শব্দপ্রয়োগ একাকার হয়ে গেছে। তাঁর কবিতার শব্দরূপের মধ্যে রয়েছে প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, ঋজু বক্তব্য, শ্রমিক ও শ্রমজীবনের অনুষঙ্গময় শব্দ, সাম্যবাদী সমাজভাবনা। আর কবিতার ছন্দকাঠামো ও শব্দের রূপবন্ধনে সমাজ ও সমকালের ছাপ স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। সুকান্তের কবিতার শব্দ তাঁর বক্তব্যের অনুগামী, পরিবেশ-প্রতিবেশ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা-মন্থিত। ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে সংগ্রাম ও বিপ্লবের রক্তিম বাসনা, স্পৃহা, শব্দের প্রথাগত অর্থ ভেঙে দিয়ে পুরোনো অপ্রচল শব্দকে ব্যবহার করেছেন সম্প্রসারিত ও নতুন অর্থ-তাৎপর্যে।[১০] যেমন :

১. আমার দৃষ্টিতে লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা
("শত্রু এক", *ছাড়পত্র*)

২. এখানে সেখানে রক্তের ফুল ফোটে
("একুশে নভেম্বর : ১৯৪৬", *ঘুম নেই*)

৩. ক্রমশ এদেশে গুচ্ছবদ্ধ রক্তকুসুম
ছড়ায় শত্রুশবের গন্ধ, ভাঙে ভাত ঘুম
("বিভীষণের প্রতি", *পূর্বাভাস*)

এভাবে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহযোগে দৃষ্টি ও শ্রুতিগ্রাহ্য উপস্থাপনায় 'রক্তকুসুম', 'রক্তের ফুল', 'লাল প্রতিবিম্ব', 'ভাত ঘুম' প্রভৃতি শব্দের ভাবার্থে তিনি সংগ্রামের অকৃত্রিম প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। শব্দসচেতনতা ও শব্দানুষঙ্গের আদর্শে কবিতা বিনির্মাণে সুকান্তকে প্রায়ই নিরীক্ষার আশ্রয়ও গ্রহণ করতে হয়েছে। এমনকি বস্তুবিশ্বের সঙ্গে সহজে সম্পর্ক স্থাপনে এবং চিত্ররূপ নির্মাণে তিনি মাঝেমধ্যেই বর্ণ বা রং ও প্রতীকের ব্যবহার করে কবিতাকে শিল্পিত করেছেন। এ ছাড়া সুকান্তের কবিতায় রঙের বহুমাত্রিক ব্যবহার কবিতার গায়ে প্রয়োগকৃত শব্দকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। যেমন :

১. কলঙ্কিত কালো রক্তের মতন
অন্ধকার হানা দেয় অতন্দ্র শহরে
("সেপ্টেম্বর '৪৬", *ছাড়পত্র*)

২. বাদুড়ের মত কালো-অন্ধকার
ভর করে গুজবের ডানা
উৎকর্ণ কানের কাছে
সারারাত ঘুর পাক খায়।
("সেপ্টেম্বর '৪৬", *ছাড়পত্র*)

Dhaka University Institutional Repository

৩. অশ্বত্থ শাখায় কালো পাখি
দুশ্চিন্তা ছড়ায় অবিরত
("সহসা", *পূর্বাভাস*)

৪. দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে
পূর্বকোণ
("বিদ্রোহের গান", *ঘুম নেই*)

১.৬

কাব্যচর্চা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধী-সুভাষ দুজনের বিপরীত চেতনাকেই দিনেশ দাস আদর্শ হিসেবে মানতেন। যদিও প্রথমদিকে তিনি গান্ধীবাদী আদর্শকেই লালন করে কবিতা চর্চা করেছেন। আবার মাস্টার দা সূর্য সেনের বিপ্লবী আন্দোলন দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি, ছিলেন স্থানীয় বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্তও। দিনেশ দাস কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন স্কুলজীবন থেকেই; বাল্যবয়সেই কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সুবাদে তাঁকে সইতে হয়েছে পুলিশি নির্যাতনও। কিশোর বয়সেই তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল স্বদেশী ভাবনা। তিনি যখন চোখ মেলে দেখলেন তাঁর স্বদেশভূমিতে ঔপনিবেশিক শাসন চলছে এবং বুঝতে শিখলেন জাতি হিসেবে তাঁরা শৃঙ্খলিত ও পরাধীন, মানুষ হিসেবে নির্যাতিত ও অধিকারবঞ্চিত, তখন থেকেই তাঁর সৃষ্টিশীল চেতনা শানিত হতে থাকে বিপ্লবীদের পক্ষে। তবে দিনেশ দাসের কবিজীবন শুরুর পেছনে পরাধীনতার গ্লানিই অন্যতম প্রধান কারণ বলে পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেই বলে গেছেন।[১১] কিন্তু যখন বুঝতে শিখলেন, গান্ধিবাদী অহিংস নীতি মানুষকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারছে না। বরং বিপরীত চিত্রই লক্ষ করলেন। কুলি-শ্রমিক থেকে শুরু সবাই নির্যাতিত–সাধারণ মানুষও তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত, সেই সময়টাতে—১৯৩৬ সালের দিকে তিনি কমিউনিজমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পুরোপুরি সাম্যবাদী ধারার কবি হয়ে ওঠেন। এ সময়েই গঠিত হয় প্রগতি লেখক সংঘ (১৯৩৯)। সেই সময়ের লেখদের একটি বড় অংশ এই প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের কর্মকাণ্ড বিশেষত লেখালেখি বা সৃষ্ট সাহিত্যকর্মের একটি বৃহৎ অংশের বিষয়জুড়ে ঠাঁই পেত ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা। শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অভিপ্রায় ছিল প্রগতিপন্থীদের অন্যতম অভীপ্সা। ওই সময়ই—১৯৩৭ সালে দিনেশ দাস "কাস্তে" কবিতাটি লেখেন। ওই সময় রাজরোষের ভয়ে কেউ ছাপাতে না চাইলেও পরের বছর—১৯৩৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় কবি অরুণ মিত্র কবিতাটি প্রকাশ করেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা সমমনা কবি ও পাঠকদের আন্দোলিত করে। সেই সুবাদে কবি ও কবিতা অসম্ভব পরিচিত পেয়ে যায়। জীবনের শুরুতেই জাতীয় সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ায় দিনেশ দাসের কবিতায় সামাজিক দায়বদ্ধতার চিত্র ধরা পড়ে প্রবলভাবে। যেখানে সাম্রাবজ্যবাদ-বিরোধিতা আর নিপীড়িত মানুষের অধিকারের কথাই ছিল প্রধান বিষয়। আর তাই "কাস্তে"র পাশাপাশি সাম্যবাদী আরও কিছু কবিতা প্রকাশের জন্য তাঁকে রাজরোষে পড়তে হয়েছিল। দিনেশ দাস ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে অশোককুমার মিশ্র বলেন :

> 'কাস্তে' কবিতাটিতে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রকাশ এত স্পষ্ট যে কবিতাটি এবং তাঁর কবি অচিরেই রাজরোষে পড়েন। মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তাধারায় দীক্ষিত কবির 'কাস্তে' কবিতায় কৃষিবিপ্লবের জয়গান গাওয়া হয়েছে। রাশিয়ার সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের গণজাগরণে ঘটে যাওয়া বলশেভিক বিপ্লব কবিকে নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ফলে সর্বহারার সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কবি।[১২]

আসলে গভীর সমাজমনস্কতা ও রাজনৈতিক সচেতনতাই চল্লিশের দশকে কবি দিনেশ দাসকে ভিন্নমাত্রিক স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অন্যান্য কবির মতো দিনেশ দাসও সমকালীন সংকটময় পরিস্থিতির কারণে এবং নিজে সাম্যবাদী রাজনীতির অংশীদার হওয়ায় সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। সেজন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন : 'লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে আলোড়িত আসমুদ্র হিমালয়/উত্তাল তরঙ্গে এক বুদ্বুদের মতো, সত্যাগ্রহী আমি।/অকস্মাৎ পুলিশের 'মৃদু সঞ্চালনে' মাথায় নিমেষে,/করুণ রক্তের ধারা চুঁয়ে চুঁয়ে/ছুঁয়েছে আমার ঠোঁটের দাঁতে। চমকে উঠেছি আমি, পরিচিত লবণের স্বাদে/আমরা কি পৃথিবীর লবণ? জীবন?' ('লবণ', *দিনেশ দাসের কাব্যসমগ্র*)

কেবল শ্রমজীবী মানুষের দ্রোহচেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না দীনেশ দাসের কবিতা, ছিল পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণের বিরুদ্ধেও সোচ্চার। ধনতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্ট কৃত্রিম নাগরিক পরিবেশে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ। কলকাতা নগরকে তাই তিনি কালো সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কলকাতা কালোসাপ লেজ যার লেকে
ফণা যার হাওড়ার পোলে :
মাঝরাতে দেখি তার মাথার উপর
পূর্ণিমা-চাঁদ জ্বলজ্বলে।
মনে হল ঘুম ঘুম চোখে,
চাঁদ নেই–
সাপের ফণায় জ্বলে মণি চকচকে।

("কলকাতা", *দিনেশ দাসের কাব্যসমগ্র*)

এ ছাড়া তিনি দ্বিতীয় মহাসমরে বিশ্বব্যাপী যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার ফলে মানুষের মনে যে শঙ্কা, ভীতি, হতাশা কাজ করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেসব চিত্রিত করেন তাঁর কবিতায়।

ভাবনা এবং বিষয় এক হলেও সৃষ্টিশীল যে কোনো সাহিত্যকর্মে শব্দ ব্যবহারের নিপুণতাই স্রষ্টাকে আলাদাভাবে খ্যাতি এনে দেয়। কবিতার শরীর গঠনে শব্দ ব্যবহারের কৌশলটি অনিবার্যভাবে কবির চেতনা থেকেই উৎসারিত হয়। কবি দিনেশ দাসের কবিতাকর্ম সেদিক থেকে অবশ্যই সফলতার পরিচায়ক। শব্দের বিচিত্রগামিতায় তিনি তাঁর চেতনালব্ধ জ্ঞানকে পুরোপরি কাজে লাগিয়েছেন বলেই কবিতার শব্দ প্রয়োগে তিনি অকৃত্রিমভাবে ভাবকে বিষয়াভূত করতে পেরেছেন। সেটা করতে পেরেছেন বলেই জাতীয় জীবনের সংকটকালে অতি সাধারণ মানুষের কথা ভেবে ধারালো 'বেয়নেট'কে তিনি কাস্তে দিয়ে মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। 'চাঁদের সাদা ফালি'র সৌন্দর্য তাই তাঁর কাছে নস্যি কাস্তের প্রয়োজনের চাইতে। "কাস্তে" কবিতা থেকে এর উপযুক্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরা সম্ভব। যেমন :

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু
শেল আর বোম হক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!
বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি

Dhaka University Institutional Repository

তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে।

("কাস্তে", *শ্রেষ্ঠ কবিতা*)

উপর্যুক্ত কবিতাংশে প্রযুক্ত শব্দগুলো একদিকে যেমন সংগ্রামী চেতনার প্রতীক, অন্যদিকে তেমনি শ্রমজীবী অতি সাধারণ মানুষের কর্মযজ্ঞের হাতিয়ারকে কবিতার উপজীব্য করার দৃষ্টান্ত। কবিতার রক্তে তখন আসন্ন সংগ্রামে তেজী স্রোত প্রবাহিত, তাই শ্রেণিহীন মানুষের ন্যূনতম ব্যবহার্য জিনিসকে তিনি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে পরিগণিত করে কবিতাকে আলাদা মাত্রায় অভিষিক্ত করেছেন।

১.৭

চল্লিশের কাব্যধারার স্বভাব ও পরিবেশে অগ্রজ কবিদের পাশাপাশি তৎকালীন পূর্ব বাংলার কবিদের মধ্যে যাঁরা সক্রিয়ভাবে কবিতাচর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন উল্লেখযোগ্য। এর বাইরে বিলম্বে কাব্য প্রকাশিত হলেও সৈয়দ আলী আহসানও কবিতাচর্চা শুরু করেন এই দশক থেকেই। এ ছাড়া তুলনামূলক কম পরিচিত অথচ চল্লিশের দশকের পূর্ববঙ্গের একমাত্র কবি রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী (১৯২১-১৯৮৮), যিনি সরাসরি চল্লিশের কাব্যচেতনার মূল প্রবণতা—সংগ্রামী ধারার কবিতা রচনা করেছেন, তাঁর নামও উল্লেখযোগ্য। রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী চল্লিশের মূল কাব্যচেতনার কবি—যিনি সমকালের প্রায় সব বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকায় নিয়মিত কবিতা প্রকাশ করলেও কোনো কাব্য-সংকলনে তাঁর কোনো কবিতা স্থান পায়নি। শুধু সাহিত্য কিংবা সাহিত্য-সাধনায় লিপ্ত না থেকে বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকাও তাঁর কবিতার সংকলন অপ্রকাশিত থাকার একটি অন্যতম কারণ। কবি ও রাজনৈতিক কর্মী তো বটেই, তিনি ছিলেন চতুর্মুখী কর্মধারার মানুষ। কেননা 'সাহিত্যপত্র সম্পাদনা, লোক হিতকরী উদ্যম, রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন আর খণ্ডকালীন সৃজন ও মূল্যায়ন-প্রয়াস—এই চতুর্মুখী কর্মধারায় বিভক্ত হয়েই চল্লিশের দশক এবং উত্তরকালের জীবন অতিবাহিত করেছেন তিনি। তাঁর জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ চতুর্মুখের কোনোটিই গৌণ নয়, সবকটিরই অভিমুখ মানবিক দায়বদ্ধতার দিকে, জীবন-জগৎ ও মানুষের কেন্দ্রে।'[১৪] তাই কলকাতায় থাকাকালে কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীর কবিতায় মানুষ আর মানবিকতাই প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে ঠাঁই পায়। আর সামাজিক দায়বদ্ধতা ও তাঁর কবিচেতনার শিল্পিত ও সুশৃঙ্খল বিন্যাস অল্প পরিচিত হলেও চল্লিশের প্রধান কবিদের সারিতে তাঁকে বিবেচনা করা অযৌক্তিক নয়।

তবে এই দশকের প্রধান কবি হিসেবে মূলত প্রথম তিনজনই বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। চল্লিশের দশকের উচ্চকিত গতিময়তায় ও উত্তপ্ত পরিবেশে কাব্যযাত্রা শুরু হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের শিল্পী-মানস ওই আবহের যে কাব্যিক প্রভাব একটি সাধারণ সূত্রের মতো আত্মস্থ করেছে, সেটি হলো সমাজ-সচেতনতা—সামাজিক দায়বদ্ধতা। উল্লেখ্য, তৎকালীন বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীর প্রধান অংশে ঐতিহ্য-নির্ভর অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে সম্প্রদায়-নির্ভর রাজনীতির দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ফলে দুই বঙ্গের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের অসাম্য এবং সেই সূত্রে উদ্ভূত রাজনৈতিক পার্থক্য তুমুল আকার ধারণ করেছিল। এই পরিস্থিতিতে সেই সময় কোনো-কোনো বাঙালি মুসলমান লেখক প্রগতির পথ ত্যাগ করে সাম্প্রদায়িক চেতনায় সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। তাঁদের মধ্যে ফররুখ আহমদ ছিলেন অন্যতম। অসাধারণ কবিপ্রতিভা সত্ত্বেও কাব্যচর্চার জগৎকে ধর্ম-নির্ভর সীমানায় আবিষ্ট করায় পরে তিনি বিশেষ আদর্শবাদী কবি হিসেবে পরিচিত হন। সে-সময়কার জীর্ণ সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থার ক্ষয়িষ্ণু ক্রম-অবনতির বাস্তবতা শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের চৈতন্যে যে আঘাত দিয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন রূপ নিয়েছে। তাই কেউ নিষ্ক্রিয় জড়তায় আত্মরতিতে আত্মরক্ষার পথ খোঁজেন, কেউ বা প্রত্যাঘাতে উদ্যত হন, কেউ বা ব্যঙ্গবিদ্রূপের হালকা শরসন্ধানে নাগরিক চেতনায় মুক্তির সন্ধান করেন। এই মনোভঙ্গি নিয়ে আবুল হোসেনের বিক্ষত নাগরিক চেতনা যেখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে (১৯০১-১৯৬০) পাশ কাটিয়ে বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) বা সমর সেনের নাগরিক তীক্ষ্ণতার সমীপবর্তী হয়, আহসান হাবীব সেখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *পদাতিক*-এর চেতনাতেই মুক্তি খোঁজেন স্বকীয় ঢঙে। অন্যদিকে ফররুখ আহমদ ব্যক্তিক আবেগের পথে ঐতিহ্যবাদী ধর্মীয় চেতনার বিশেষ সাংস্কৃতিক রূপের মধ্যে মুক্তি খোঁজেন। তাই কবিতা-পাঠক তাঁকে চেনেন পুঁথি-কাহিনী কিংবা সেখানকার নায়ক-নায়িকার অনুরূপ ভুবনের চরিত্র রূপায়ণের জন্য। প্রধানত এই পথেই তাঁর কবিসত্তা অন্বেষা সমর্পিত হয়েছে মরু-পুরাণের স্বাপ্নিক অতীতে ফিরে যাওয়ার বাসনায় 'বার দরিয়া'র নাবিক-বৃত্তিতে। কাব্যচর্চার প্রথম জীবনে সৈয়দ আলী আহসানও ছিলেন ধর্মীয় চেতনা-নির্ভর কবিতাচর্চার পক্ষপাতী। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আস্তে আস্তে তিনি আধুনিক-মনস্ক কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে স্বীকৃতি পান। আর আবুল হোসেনের কবিতা স্ব-কাল ও সমাজচেতনার হাত ধরে এগিয়ে যাওয়ার প্রসাদে তিরিশের নান্দনিকতার ওপর ভর করে ক্ষণিক বিচরণ শেষে এমন এক জায়গায় স্থিত হয়, যেখান থেকে চোখে পড়ে নাগরিক রিক্ততার পুঁজরক্ত-মাখা ছবি, জনমানসের বিবর্ণ রূপ এবং আপন সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ রক্ষণশীল চেহারা।

২

উপর্যুক্ত কবিবর্গ এবং তাঁদের কাব্য-অভিযাত্রা, কবিতায় প্রতিফলিত ভাব-বিষয় এবং সময়চিত্রই চল্লিশের সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে চিনিয়ে দেয়। ওই সময়ে তাঁদের মতো প্রায় সব কবিই বাংলা কবিতাকে নতুন আঙ্গিকে নতুন কাঠামোতে নির্মাণের প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের কবি আহসান হাবীবের ছিল বিশিষ্ট অবস্থান, যাঁর কবিতা শাশ্বত জীবনের কথা, হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের কথায় মুখর। আহসান হাবীব পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় গিয়ে কাব্যচর্চা করেছেন—পাশাপাশি টিকে থাকার জন্য জীবনসংগ্রামেও ছিলেন তৎপর। একই সময়ের কবি হওয়া সত্ত্বেও আহসান হাবীব সমসাময়িক কবিদের মতো লেখেননি, লিখেছেন নিজের মতো করে। যেখানে স্থান পেয়েছে তাঁর জন্মস্থল, নিজস্ব মানুষ, প্রতিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা আর তাঁদের স্বাভাবিক আনন্দ-বেদনার কাব্যভাষ্য। অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি রাজনৈতিক, দৈশিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন কবিতায়, অথচ তা কখনো কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শে সীমায়িত থাকেনি। তবু তাঁর কবিতা স্নায়বিক সুস্থিরতায় শৈল্পিক-ভাষ্যে মানুষকে দহন করে আর জাগিয়ে তোলে কালের প্রাসঙ্গিকতায়। শিল্পই আহসান হাবীবের কাছে প্রধান আয়ুধ, তবে তা সমাজসচতেনার মধ্য দিয়েই। চল্লিশের সমাজসচেতনা তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে—এটি ওই সময়ের অন্যান্য কবির মতো তাঁর ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তবে সে সময়ের সমাজ আর রাজনীতি তাঁকে মানবিক বোধে চিরন্তনতাকেই মূর্ত করে তোলে। ব্যক্তিজীবনে কোনো রাজনীতি কখনোই তাঁকে স্পর্শ করেনি। তবুও তিনি সাধারণের কথা বলেছেন, সাধারণের কীর্তি, মনোবেদনা ও অনুভবময়তাকে গেঁথে দিয়েছেন কবিতার শব্দে, চিত্রে ও প্রতিমায়। ফলে রাজনৈতিক সংগ্রাম-আন্দোলন এবং স্বধর্ম তথা সম্প্রদায়গত অবস্থান—এর কোনোটাই তাঁর কবিতায় স্থান পায়নি। শিল্পিত কবিতাই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। সেই কারণেই বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তিনি যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়-দিনেশ

Dhaka University Institutional Repository

দাস-সমর সেনের মতো কবিতা লিখতে কোনো মতাদর্শিক সাধনা করেননি, তেমনি ফররুখ আহমদ-তালিম হোসেনের মতো সাম্প্রদায়িক অন্ধত্বও তিনি বরণ করেননি। ওই সময়ে সাম্রাজ্যবাদী জিঘাংসার ফলে সৃষ্ট কৃত্রিম সংকটে সর্বত্র যখন মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তখন তিনি ব্যথিত হয়েছেন, মানুষের পক্ষাবলম্বন করেছেন। ন্যায়ের পথে মানুষকে আশান্বিত করেছেন প্রতীকাশ্রয়ী কবিতায়। তিনি যেমন চল্লিশের সংগ্রামী কবিতা লেখেননি, তেমনি লেখেননি সাম্প্রদায়িক চেতনার কোনো কবিতাও। আহসান হাবীবের কবিতায় সবকিছুই ধরা পড়েছে কিন্তু তা স্লোগানের মতো মুখরিত নয়। তাঁকে বুঝে নিতে হয় জ্ঞানের গভীরতা দিয়ে, ভাবনার সাবলীলতা দিয়ে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক আহমদ রফিকের বক্তব্য খুবই সংগতিপূর্ণ:

> ...প্রচলিত অর্থে তিনি বিশেষ কোন শিবিরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ছিলেন না নির্দিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত কবি-সাহিত্যিকদের সহযাত্রী। এমন কি রাজনৈতিক প্রকাশেও তাকে কখনও প্রগলভ হতে দেখিনি বরং এক ধরনের নির্বিকারত্ব বজায় রেখে চলাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তা সত্ত্বেও সমাজচেতনার শিকড় যে তার শিল্পীসত্তার গভীরে প্রথম থেকে অবস্থান নিয়ে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল তার কবিতাই সেই প্রমাণ করে। এমনকি শেষ বয়সের চিন্তাভাবনা ও লেখালেখিতেও দেশ কাল ও সমাজচেতনার প্রতিভাস স্পষ্ট। অথচ এ বয়সে জড়বাদী কবিদেরও অনেককে আধুনিকতার পাট চুকিয়ে বা নব্য আধুনিকতার নামে ভক্তিমার্গে বিচরণ করতে দেখা গেছে...। রক্ষণশীল পশ্চাদচেতনার ঢেউ তুলে নতুন করে জনপ্রিয়তা অর্জনরে চেষ্টা দেবা গেছে। বাংলা সাহিত্যে এমন উদাহরণ মোটেই বিরল নয়।[১৫]

আহমদ রফিক আরো বলেছেন যে, আহসান হাবীব সর্বশেষ কবিতাগ্রন্থ *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* পর্যন্ত চল্লিশের চেতনাবোধ লালন করেছেন। এমনকি কবি সম্পর্কে তিনি 'শিল্পীর দায় বা সামাজিক অঙ্গীকার' প্রশ্নে টলস্টয়, গোর্কি ও র‍্যাঁবোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। কেননা, আহসান হাবীব কবিতাকে রাজনীতি দ্বারা আক্রান্ত হতে দিতে চাননি। তিনি বরং কবিতাকে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

> কবিতার নির্মাণ আর উপস্থাপন যদি সার্থক হয় সেই-ত বলিষ্ঠতা, বরং অসার্থক কবিতায়ই থাকতে পারে চীৎকারের প্রাধান্য। রাত্রি শেষেই ছিলো কিন্তু শ্লোগান-চরিত্রের উচ্চারণ। তাকে আমি সচেতনভাবেই সরিয়ে রেখেছি আমার পরবর্তী কবিতা থেকে। কবিতাকে বক্তৃতা করে তোলার পক্ষপাতী নই বলি। বরং কবিতা হোক রাজনৈতিক মঞ্চের বিশুদ্ধ প্রেরণা, আমি পেয়েছি। ("পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

আহসান হাবীব যে শেষ পর্যন্ত চল্লিশের কাব্যচেতনা লালন করেছেন, তার কারণ বোধহয় সামাজিক প্রেক্ষাপটই। তবে কবি *রাত্রিশেষ* সম্পর্কে 'শ্লোগান-চরিত্রের' যে কথা বলেছেন, তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কারণ চল্লিশের দশকে স্লোগান-মুখর কবিতার চর্চাও করেছেন কোনো কোনো কবি। সে-সবের সঙ্গে তুলনায় গেলে আহসান হাবীবের নিজের কবিতা সম্পর্কে এ-ধারণা পাঠককে খানিকটা দ্বিধান্বিত করে তোলে।

চল্লিশের দশকে পরাধীন ভারতবর্ষে মানুষ ছিল অধিকারবঞ্চিত—সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক কোনো নিরাপত্তাই ছিল না জনসাধারণের। এতগুলো বছর পেরিয়ে তিনি দেখেছেন ক্ষমতার দাপট—শোষকের হাতবদল হয়েছে মাত্র। মানুষের ভাগ্যের কোনো বদল হয়নি। অথচ তিনি ক্রমাগত বদলেছেন, এগিয়েছেন সময়ের সঙ্গে, বদলিয়েছেন তাঁর কবিতা। এমনকি কবিতার বিষয়ের রূপান্তর ঘটিয়ে তিনি আরো মাটিঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন। ফেলে আসা অতীতকে তিনি প্রেরণার জায়গা হিসেবে নির্মাণ করেছেন কবিতার শরীর গঠনে। তাই শুরু থেকেই তিনি নাগরিক চেতনাকে ধারণ করলেও ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত আপন করে। করে কবিতার অবয়ব নির্মাণে তিনি আধুনিকতাকেই আশ্রয় করেছেন। যেমন :

Dhaka University Institutional Repository

মনের ফাটলে স্মরণাশ্রিত স্বপ্নের কণাগুলি
জন্ম দিয়েছে লক্ষ বীজাণু কুটিল মৃত্যুদূত।
নীল অরণ্যে এল অপঘাত অকস্মাৎ
যুগের চিতায় জ্বলে জীবনের প্রিয় প্রভাত।
অন্ধ নয়নে দিনের কামনা আজিও উর্ধ্বায়িত
মনের অশ্ব ভ্রস্ব চরণ বঞ্চনা-বিক্ষত।

("দিনগুলি মোর", *রাত্রিশেষ*)

সেই সময়, চল্লিশের দশকে বেশির ভাগ কবি যেখানে ব্যস্ত ছিলেন রাজনৈতিক মতাদর্শে সমাজকে প্রভাবিত করতে, সেখানে আহসান হাবীব সমাজের বিপর্যস্ততার চিত্র সুচারু কারিগরের মতো অঙ্কন করেছেন, যাতে তৎকালীন কাব্যপ্রবণতার শৈল্পিকতা এবং মানুষের প্রতি অসম্ভব দায়বোধই প্রাধান্য পেয়েছে। এর জন্য বড় ভূমিকা ছিল হয়তো তাঁর যাপিত জীবন আর খাঁটি কবি হওয়ার প্রতিজ্ঞা। আর মানবিকতাকে তিনি কতটা উঁচুতে স্থান দিতে পারেন, তার একটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হলো :

চেনা পৃথিবীকে ভালোবাসলাম জানাজানি ছিল বাকী,
জানতাম নাতো সে পরিচয়তে ছিলো অফুরান ফাঁকি।
জানতাম নাতো নিত্য অজস্র ডানা জ্বলে—
যে দীপশিখারে ভালোবাসলাম তারি দহনের তলে।
জানতাম না যে সূর্যমুখীর নয়নের আলো কেড়ে
তারি ছায়া তলে কোটি কোটি কীট দিনে দিনে ওঠে বেড়ে।

("এই মন—এ মৃত্তিকা", *রাত্রিশেষ*)

মহাযুদ্ধের কাল থেকেই কবি হিসেবে আস্তে আস্তে বড় হয়েছেন আহসান হাবীব। তাই তিনি যতই নিরাসক্ত থাকুন না কেন রাজনৈতিক আদর্শ থেকে, একজন সচেতন কবি হিসেবে তাঁর সৃষ্টিতে সেসবের কোনো ছোঁয়া লাগবে না—এমন নয়। যুদ্ধ সাধারণ মানুষকে বিপন্ন করে তুলেছিল। কবিও দৈনন্দিন জীবনে নিজেকে পর্যুদস্ত মনে করেছেন। যুদ্ধের নির্মম কশাঘাতে প্রকৃতির সৌন্দর্যও বিলীন হয়েছে। তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠা চিত্র দেখলে মনে হয় যেন ঋতু তার স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ফলে পরিবর্তন ঘটেছে বাংলার ঋতুবৈচিত্র্যে। মানুষের জীবন যেন অতিনশ্বর পদ্মের দল অথবা শিউলি ফুলের মতোই ঝরে পড়ছিল—মানুষেরই অমানবিক কর্মকাণ্ডে। যেমন :

এবার শরৎ রাত্রে পানপাত্রে মানুষের খুন ;
আসিতেছে উড়ন্ত আগুন
আমাদের আকাশের ক্ষুব্ধ সীমানায় ;
নতুন পদ্মের দল ঝ'রে ট্রেঞ্চেতে লুকায় !
এবার শরৎ রাত্রে শ্যাম শষ্পে হানিয়া চরণ,
রক্তপায়ী প্রেতসম ক্রূর হাস্যে নাচিবে মরণ !
স্তব্ধ রবে বনতল হাতে রবে বাঁশরী নিরেট,
চারিদিকে উঁচু হ'য়ে ঝলকিবে তীক্ষ্ণ বেয়নেট।

("শরৎ", *রাত্রিশেষ*)

তাই যে শরৎ পবিত্রতার প্রতীক, সে শরৎ হয়েছিল শ্রীহারা। মানুষ স্বপ্ন দেখার পরিবর্তে উদ্যত সংগীনের আতঙ্কে দিশেহারা হয়েছিল। ওই সময় প্রকৃতি যেন ধারণ করেছিল রিক্ততা আর হিংস্রতার মূর্ত প্রতীক

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে। যুদ্ধ বা মহামারী কিংবা মানবিক বিপর্যয়ের চিত্র আঁকতে চেয়েছেন আহসান হাবীব বিশেষ এক কুশলতায়। তবে কোনো রাজনৈতিক শব্দাবলি দিয়ে তিনি সাজাননি তাঁর কাব্যবাসর। কোনো বিশেষ শ্রেণির প্রতিও ছিল না তাঁর পক্ষপাতিত্ব। অথচ তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা হয়ে উঠেছে মানুষ আর প্রকৃতির স্বভাববিরুদ্ধ চিত্র।

এমন অসংখ্য কবিতায় আমরা লক্ষ করব, যদি তুলনা করা যায়, সুভাষ, সুকান্ত, দিনেশ দাস অথবা সমর সেনের সঙ্গে, তবে দেখব, এমন সাবলীল আটপৌরে শব্দপ্রয়োগ করেননি কোনো কবি। যেখানে মাটি আর মাটিঘনিষ্ঠ মানুষেরই সহাবস্থান। তারাই আহসান হাবীবের কাব্যনির্মাণের মূল অনুপ্রেরণা। সেই কারণে তাঁর কবিতায় স্থান পায় মক্তব আর পাঠশালার ছেলেরা, যারা এই সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের সন্তান। তারা এই মানবতাবিধ্বংসী যুদ্ধের করাল গ্রাসের কারণে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। আর তাই তাদের সামাজিক অবস্থান হয়েছে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বদের কাতারে। শহরে অধিবাস করা কবি তখন শ্রমিক বা শহুরে পুঁজিপতিদের চেয়ে নিজের শিকড়ের দিকে তাকিয়ে অনুভব করেছেন—কীভাবে তাঁরই আশপাশের মানুষ জীবিকার তাগিদে ঘরছাড়া হচ্ছে আর বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে অন্ধকার পথ। আহসান হাবীবের এই নিভৃতচারী কবিদৃষ্টি সমসময়ের অন্য কবিদের চেয়ে তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থান নির্দেশ করে। যেমন :

তোমার হাসি ঘুরে বেড়ায় দেখেছি
গোধূলির আবছা আলোয়
কার্জন পার্কের গলিতে।

... ...

তোমার হাসি দেখেছি—
কুঞ্চিত অধরের প্রত্যন্তে
হঠাৎ ঝিলিক মেরে আবার যায় মিলিয়ে
হয়ত ভয়ে তোমার বুক কাঁপে।
ক্ষীণাভ তোমার হাসি
তবু নিরাবরণ তীক্ষ্ণ।

("হাসি", *রাত্রিশেষ*)

চল্লিশের দশকেও বর্তমানের মতো মেকি রাজনীতি বিরাজিত ছিল। হয়তো কবি সে কারণেই কোনো বিশেষ আদর্শে নিবিষ্ট হননি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর ফররুখ আহমদ—চেতনাগত কারণে দুই কবি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করলেও দুজনের মধ্যে যেমন ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের কোনো কৃত্রিমতা ছিল না, তেমনি এই দুজনের সঙ্গেই কবি আহসান হাবীবেরও ছিল বন্ধু-সহযাত্রীর সম্পর্ক। এ-সত্ত্বেও কারো আদর্শই কবি আহসান হাবীবকে তাঁর নিজস্ব জগৎ থেকে চ্যুত করতে পারেনি। তিনি চলেছেন তাঁর মতো, ধারণ করেছেন রোমান্টিকতাকে সঙ্গে নিয়ে অকৃত্রিম মানবিকতা। হয়তো তাঁর সংশয় ছিল রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় আশ্রয়ের কৃত্রিমতা সম্পর্কে। তাই তিনি সর্বৈব মানবিকতা আর রোমান্টিকতা দিয়ে তাঁর কাব্যসৌন্দর্যকে প্রকাশ করেছেন। যেমন :

এই নিয়ে বারবার নতুন দিনের বাসনায়
বেঁধেছি অনেক বাসা মৃত্যুমুখী দিনের সীমায়।

এবার আবার সেই দিন!

সেই ঝরা পলাশের দিন!

Dhaka University Institutional Repository

তবুও মাটিতে জাগে মৃদুগন্ধ কামনার ভার
তাই নিয়ে হৃদয়ের অসহ্য প্রয়াস বার বার
বাসা বাঁধবার !
... ...
যে পলাশ ঝ'রে গেছে আজ তার প্রতিটি পল্লব
শাণিত খড়্গের মত হানে যদি বাসনার শব
অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস ছিন্ন ক'রে যদি নেয় ভার
ইস্পাত-কঠিন এক রচনার—
সে কি ভালো নয়,
হে হৃদয়, হে মোর হৃদয় ?
("ঝরা পলাশ", *রাত্রিশেষ*)

এ ছাড়া মধ্যবিত্ত জীবনের নানা দিক তিনি খুব স্পষ্ট করে কবিতায় প্রতিফলিত করেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়েনের ফলে মানুষের মনে সৃষ্ট দ্বিচারিতাও তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে—বিশ্বযুদ্ধকালে বিরাজমান রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে। সমাজে তখন স্থূল সমস্যাগুলোর পাশাপাশি জীবনকে দেখার পেছনে স্বার্থপরতা, অকৃত্রিমতাকে প্রকাশে সৎসাহসের অভাব–সর্বোপরি, মানুষের ভেতরে বাস্তবতা আর চরম সত্যকে আড়াল করে ব্যক্তিস্বার্থে সুখের স্বর্গ গড়ার প্রত্যয় কবিকে ব্যথিত করে তোলে। আহসান হাবীব শ্লেষের সঙ্গে কবিতায় তা ব্যক্ত করেন এভাবে :

আমাদের উলঙ্গ বক্ষের
আমাদের ঘূণধরা (sic) পাঁজরের
চারপাশে অহরহ ওড়ায় অনেক ধূলি
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আরবী ঘোড়ার।
জংধরা মগজের নীলকোষে অসহ তুফান।
... ...
আমাদের দুইমুখো মন।
একমুখে উদ্ধত বন্ধকী জীবনের সুবিপুল ঋণ।
তারিপাশে ভাঙাচোরা আধপোড়া ইঁটের গাঁথুনি।
আকাশেতে সেতু বাঁধবার।
("কনফেশান", *রাত্রিশেষ*)

আহসান হাবীবের এই সমাজচেতনা প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে শেষাবধি অটুট ছিল। তবে কাব্যান্তরে প্রকাশভঙ্গি বিবর্তিত হয়েছে। *রাত্রিশেষ*-এ প্রকাশিত সমাজ-সচেতনতা 'কখনো উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত, কখনো কেবল বর্ণনামূলক, পরবর্তী কাব্যগুলোতে সেই ভঙ্গী ক্রমশ ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ শাণিত হয়ে উঠেছে। বিদ্রূপ এবং পরিহাসে সমাজ সংসারের অসগংতিগুলোকে কবি চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চেয়েছেন।'[১৬] কেননা, তাঁর প্রথম কাব্যটি ত্রিশের শেষ থেকে দেশবিভাগের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লেখা। এ সময়ের মধ্যে তিনি দেখেছেন নির্মম সময়কে, বুঝেছেন যুগের প্রভাবকে, অনুভব করেছেন একেবারে সাধারণের মতো এবং সহমর্মিতায় ন্যুব্জ হয়েছেন, তবে তা কাব্যকলা নির্মাণের প্রত্যয়ে। এ প্রসঙ্গে আহমদ রফিকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

Dhaka University Institutional Repository

তিনি কবিতাকে যুগচেতনার পরিণত ফসলরূপে দেখতে চেয়ে আপন বৈশিষ্ট্যের আলোকে জনচিত্তের দিকে কাব্যিক ভালোবাসার হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন।...আহসান হাবীবের কবিতায় চল্লিশের কাব্যচেতনার মূল সুর নানাভাবে ধ্বনিত। স্বকাল-চেতনা তথা দেশকালের চেতনা তাঁর কবি মানসে কার্যকরী ছিলো বলেই তাঁর কবিতার বয়ান ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অবসান-কল্পে যেমন সহজ ও সচ্ছন্দ, তেমনি সমকালীন বিপর্যয় থেকেও সরে যায়নি। প্রসঙ্গত কিছু বহু পরিচিত শব্দাবলীর সার্থক প্রয়োগ চোখে পড়ে। যেমন উদ্ধত মুঠি, ইস্পাত কঠিন, মশাল মিছিল, প্রতিরোধ, সীমান্ত, প্রতিজ্ঞা, পলাতক অন্ধকার ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার একটি বিশেষ যুগ চরিত্রের আভাস আনে।[১৭]

সমকালীন কবিদের মধ্যে সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যুগ-সচেতন ও রাজনৈতিক আদর্শ লালনকারী কবির কবিতায় এসব শব্দ বেশি লক্ষ করা যায়। তবে তাঁদের আর আহসান হাবীবের প্রকাশকৌশলের পার্থক্যই তাঁকে চল্লিশের পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্যক্তিত্বশীল ও স্বতন্ত্র কবিপ্রতিভার অধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। বাংলা কবিতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিতার খোলস থেকে বেরিয়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো শুরু করল উপর্যুক্ত কবিদের হাত ধরে। সমাজকে শৈল্পিক উদারতায় কবিতায় ধারণ করারও সূত্রপাত ঘটতে থাকল এই চল্লিশের দশক থেকেই। আমরা জানি, এর আগে কবিতায় দেশ-মাটি-মানুষ-রাজনীতি ছিল গৌণতর একটি বিষয়—মুখ্য বিষয় হিসেবে কখনোই মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে উল্লিখিত বিষয়গুলো কবিমন ও কবিতার অবয়বে ঠাঁই করে নিতে পারেনি।

তথ্যনির্দেশ

১ আহসান হাবীব, "পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ", *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৫,
পৃ. ৩৪৯

২ আহসান হাবীব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯

৩ তারেক রেজা, *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিমানস ও শিল্পরীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০১০, পৃ. ২৮

৪ আহমেদ মাওলা, *চল্লিশের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১২৯

৫ আহমেদ মাওলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

৬ অশোককুমার মিশ্র, *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০০০)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৮৫

৭ আহমেদ মাওলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

৮ জহর সেনমজুমদার, *বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৬৮

৯ চুয়াল্লিশ নম্বর পত্র, *সুকান্ত সমগ্র*, (সম্পা. সুভাষ মুখোপাধ্যায়), সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ৩০১

১০ আহমেদ মাওলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮

১১ দিনেশ দাস, "আমি এদেশের মার্কসবাদীদের কথা শুনতে প্রস্তুত নই", 'গঙ্গোত্রী', শারদীয় সংখ্যা, (সম্পা. শান্তনু দাস),
পৃ. ৫২

১২ অশোককুমার মিশ্র, *আধুনিক কবিতার রূপরেখা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৪২

১৩ ১৯৩৫ সালে কবি দীনেশ দাস যখন হিমালয়ের কাছাকাছি একটি অঞ্চল কার্শিয়াং খয়াবাড়ি চা-বাগানের ব্যবস্থাপকের বাড়িতে শিক্ষকতার কাজ করতেন, ওই সময় চা-শ্রমিকদের ওপর ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নির্মম অত্যাচার-নিপীড়ন চালানো
হয়েছিল। এরপরই তিনি গান্ধীবাদের প্রতি সংশয়াপন্ন হয়ে পড়েন এবং কমিউনিজমে দীক্ষিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

১৪ রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, *অভ্যুদয়* (সম্পা. ভীষ্মদেব চৌধুরী), "অনুবন্ধ", ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা, ২০১২

১৫ আহমদ রফিক, "আহসান হাবীব : কবি কবিতা", *আহসান হাবীব রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ষোলো।

১৬ মাহবুবা সিদ্দিকী, *আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজ সচেতনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৯৪

১৭ আহমদ রফিক, "আহসান হাবীবের কবিতা : কয়েকটি সূত্র", (সম্পা. রোকনুজ্জামান খান) *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আহসান হাবীবের শিল্পীচৈতন্যের স্বরূপ

সময়-সমাজ-প্রতিবেশ আর পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল সর্বদা কবি-সাহিত্যিকদের নিজ নিজ চৈতন্য গড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া স্বকীয়তার পরিচায়ক হয় তখনই, যখন তাঁদের শিল্পীচৈতন্য প্রতিভাত হয় ব্যক্তিত্বশীল হয়ে। কেননা, একই পরিবেশ-প্রতিবেশে বেড়ে উঠলেও কবি-শিল্পীরা শিল্পচিত্তকে উদ্ভাসিত করেন স্বকীয় মহিমায়। আহসান হাবীব তেমনই একজন কবি, যিনি সমাজচৈতন্যকে কবিতা-মাধ্যমে শিল্পচৈতন্যে রূপ দিতে গিয়ে স্বভাবধর্মে আদিষ্ট ছিলেন। তাঁর শিল্পীচৈতন্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন, 'কবি আহসান হাবীব ধূমকেতু এবং উল্কার মতো আকস্মিকভাবে বাঙালির আকাশকে আলোকিত করে আবির্ভূত হননি। তিনি ঊষার আলোর মতো একটু একটু করে আপনাকে উন্মোচিত করেছেন এবং সেই সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছেন কাঁঠালচাঁপার স্নিগ্ধ-সুগন্ধি।'[১] শুধু কবি হওয়ার উদ্দেশ্যে যে মানুষটি ঘর ছাড়তে পারেন, তিনি তিলে তিলে নিজেকে প্রস্তুত করেই যে পথে নামবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখি, তখনকার সময় এবং পরিস্থিতি কোনোটিই অনুকূলে ছিল না—প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অল্পশিক্ষিত মানুষের পক্ষে জন্মভূমি ছেড়ে অন্য ভূমিতে ঠাঁই নিয়ে অন্তত কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ক্ষেত্রে। একটি মহাযুদ্ধকালে (১৯১৪-১৯১৯) জন্ম (১৯১৭) নেওয়া এই কবি বেড়ে উঠেছিলেন নিজভূমের আলো-হাওয়ায়। তখনো তিনি জানতেন না, নগর[২] কাকে বলে কিংবা জীবনযুদ্ধের আরেক পরিচয়টাই বা কেমন। কিন্তু ১৯৩৮ সালে, ততদিনে তিনি বুঝতে শিখেছেন পারিবারিক বন্ধন কাকে বলে, কাকে বলে প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কিংবা কোথায় গেলে নিজের সৃজনপ্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন পাওয়া সম্ভব। তাই পুনরুল্লেখ বলতে হয়, তিনি পরিবার ও প্রতিবেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন অজানা এক নাগরিক পরিবেশের উদ্দেশে—একটাই কারণ, কবি হতে হবে। বাংলা ভাষায় সাহিত্য-শিল্প চর্চা করার জন্য একমাত্র অনুকূল পরিবেশ তখন কলকাতা নগরকে ঘিরেই আবর্তিত। কিন্তু তাঁর জীবন কীভাবে আবর্তিত হবে, তা নিয়ে ছিল না কোনো পূর্ব প্রস্তুতি। তাঁর সহায় হিসেবে ছিল শুধু প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর কবি হওয়ার অদম্য বাসনা।

এ সম্পর্কে কবির বক্তব্য, 'পিরোজপুর ছেড়ে বরিশাল বি-এম কলেজ। দেড় বছর পরেই কলেজটি বললে, পারবো না, তুমি বেরিয়ে পড়ো। বেরিয়ে এসে সেই যে পা রাখলাম মহানগরী কোলকাতায় তারই নাম জীবন সংগ্রাম। ইতিমধ্যে দেশ, মোহাম্মদী, বিচিত্রা প্রভৃতির লেখক/আমি যে কোনো পত্রিকায় সম্পাদকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু-একটি সার্টিফিকেটের উল্লেখ এখন সম্ভব। কিন্তু থাকি কোথায় খাই কী?'[৩]

কলকাতায় গমনকে যদি কবির দ্বিতীয় জন্ম বা তাঁর জীবনের বড় রকমের বাঁক-পরিবর্তন কিংবা একজন আহসান হাবীব হয়ে ওঠার মূল এবং একমাত্র অগ্রবর্তী সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করা যায়, তবে সেখানেও দেখা যাবে, আরেকটা মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিকেই তিনি দ্বিতীয় জন্মের আশ্রয়স্থাল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এবার পারিবারিক অধীনতা এবং স্নেহ-মায়া-মোহ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে তিনি নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠলেন। শুরু হলো জীবনসংগ্রাম—মুখোমুখি হলেন মায়া-মমতা-বিবর্জিত শহুরে পরিবেশের। জীবিকার তাগিদে, কাজের আশায় তখন তিনি ছুটেছেন এক অফিস থেকে অন্য অফিসে। অভিজ্ঞতা আর যোগ্যতার ঝুলিতে রয়েছে কয়েকটি সাহিত্য-সাময়িকীতে দু-চারটি ছাপানো কবিতা আর বোধিসত্তায় কবিতা লেখার সক্ষমতা। আজ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে প্রায় সাড়ে সাত দশক আগে ব্রিটিশ উপনিবেশের একটি পরাধীন দেশে একজন মানুষের পক্ষে কর্মসংস্থান খুঁজে পাওয়া কতটুকু দুর্লভ ব্যাপার ছিল, তা বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে বসে অনুভব করা কঠিন কিছু নয়। বিশেষ করে লেখালেখির মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে—এই বাস্তবতা সমাজের সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তো বটেই, সৃষ্টিপ্রতিভার অধিকারী, সাহিত্যিক পরিমণ্ডলেও বিরল দৃষ্টান্তের পরিচায়ক।

সত্যিকার অর্থে, একদিকে উদরপূর্তির তাড়না, অন্যদিকে কবিতাসৃষ্টির তাগিদ—এই টানাপোড়েন আহসান হাবীবের জীবনে তখন সমশক্তিতে সক্রিয়। তবু, কবিতাকে কবি উদরের ক্ষুধার কাছে হার মানতে দিতে চাননি। কারণ কবিতা তাঁর অস্তিত্বেরই অংশ। কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে তিনি ছিলেন আত্মগর্বী। তিনি বলেছেন, 'আজ আমি বলি, অহংকার করে বলছি, পরাক্রান্ত ক্ষুধাকে আমি কবিতার ওপরে হুকুম চালাতে দিইনি। ফিরে যাইনি। পিরোজপুর বা শঙ্করপাশায়, আপনবিবরে। তবে এই সময়ে ক্রমান্বয়ে বুঝতে পারি, ক্ষুধাই সেই হননকারী শত্রু যে মানবজীবন থেকে কবিতাকামনা হরণ করে, তাকে কবিতাহীন নরকে অনবরত আছড়াতে থাকে।...ক্ষুধার সেই রাজ্যে কবিতা কিছু বলবার দায়িত্ব নিতে থাকে।'[৪] ব্যক্তিগত সংকট, ক্ষুধা নিবারণের তাগিদ আর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার সংগ্রাম কবিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। দ্বিতীয় মহাসমরের করাল গ্রাস বিশ্বব্যাপী মানবতাকে বিষিয়ে তুলেছিল, সেই বাস্তবতার প্রত্যক্ষদর্শী কবি—সেই উত্তাপেরই এক স্বজনবিরহিত দর্শক। পারিপার্শ্বিক এই সংকট আর ব্যক্তিক সংকটের মধ্য দিয়ে কবিমনে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ*-এর প্রেক্ষাপট নির্মিত হতে থাকে। কবির ভাষায়, 'প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* তৈরি হতে থাকে এই পরিবেশে।'[৫] আর আমরা বলতে পারি, আহসান হাবীবের কবিমানস অর্থাৎ শিল্পীচৈতন্যও গড়ে উঠতে থাকে এমন পরিবেশ-পরিস্থিতিকে সামলে নিয়েই।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, প্রথম মহাসমর শুরুর আগে থেকেই এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ে নানা তৎপরতা শুরু করেছে। এর মধ্যে বড় দুটি রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতৃত্বে থাকা নেতাদের অদূরদর্শিতা এবং স্বার্থবুদ্ধির কারণে অবিভক্ত ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে, যেটা ছিল ব্রিটিশদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি'রও প্রতিফলন। তবে বিশের দশকের সূচনায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ছিল সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার অকৃত্রিম প্রয়াসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমসময়ে (১৯২২) কাজী নজরুল ইসলামের *অগ্নি-বীণা* কাব্যের প্রকাশও ছিল আমাদের কাব্যসাহিত্যের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অন্যদিকে ১৯২৩ সালে (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করে বাংলা কবিতার প্রথাভাঙার উদ্দেশ্যে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ, ১৯২৬ সালে পূর্ব বাংলায় 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' গঠন সাহিত্যের পালাবদলের স্মারক হয়ে উঠেছিল। কল্লোল গোষ্ঠীর কবিরা মূলত রবীন্দ্র-বলয় থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াসে পাশ্চাত্য কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা কবিতায় যে আধুনিক ধারার সূত্রপাত ঘটান—কবিতার শরীর গঠনে, এমনকি বিষয়-প্রয়োগে, তা-ই পরবর্তীকালে আমাদের আধুনিক কবিতার রীতিপদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তৎকালের বিশ্বরাজনীতি এবং ভারতীয় উপমহাদেশে চলমান রাজনীতির কারণে কিংবা এর প্রভাবে ব্যক্তিমনে যে নৈরাশ্য-হতাশা বিরাজমান ছিল, তা-ই ছিল মূলত এ-গোষ্ঠীর কবিকুলের প্রধানতম কাব্যপ্রবণতা। তবে এ-গোষ্ঠীর কবিরা জনমনের কোনো সংকটকেই কবিতায় শিল্পিত করে তুলতে পারেননি। ফলে কবিতা দূরে সরে যেতে থাকে সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

স্মরণীয় রবীন্দ্রযুগ তখনো বিরাজমান। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দ্রোহচেতনা অনেকটা অবসিত হয়ে প্রেম-বিরহের আর্তি প্রকাশে উন্মুখর। তিরিশের প্রধান পাঁচজন কবির কাব্যসাধনা রোমান্টিক সংবেদনার মধ্যেই ছিল আবর্তিত। তাই একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, চল্লিশের কবিকুলের আবির্ভাবের আগপর্যন্ত আধুনিক কবিতা ছিল জনবিচ্ছিন্ন এবং তৃণমূল পাঠকের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত। একমাত্র জীবনানন্দ দাশের কবিতাই ছিল সে সময়ের কবিতার মধ্যে দুর্লভ ব্যতিক্রম, সেটা অবশ্য আবহমান বাংলার নানা অনুষঙ্গ কবিতায় চিত্রিত হওয়া এবং সংকটময় চিত্ররূপায়ণের কারণে।

চল্লিশের গোড়ায় শুরু হওয়া আরেকটি মহাসমরের সময় পাশাপাশি চলেছে ভারতের রাজনীতির ময়দানে নানা রকম হিসাব-নিকাশ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে ১৯৪০ সালের পর জনমনে যে স্বাধীনতার চেতনা অঙ্কুরিত হতে থাকে, তা নিয়েই সরগরম ছিল স্থানীয় রাজনীতি—বিশ্বরাজনীতির দূরপ্রসারী প্রভাব তো ছিলই। এর মধ্যে লাহোর প্রস্তাবে হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতার নামে যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত হয় এবং যে সাংস্কৃতিক বিভাজন চাপিয়ে দেওয়া হয়, তার কুফল থেকে এ অঞ্চলের মানুষ আজও মুক্ত নয়।

উপর্যুক্ত কালিক পটভূমিকায় দিনেশ দাস, সমর সেন, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিগণ সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনাবোধে সোচ্চার হয়ে যে কবিতাচর্চা শুরু করেন, তা-ই চল্লিশের মূল কাব্যপ্রবণতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে একমাত্র আহসান হাবীব সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের চেতনাবোধে বা কোনো মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে কাব্যচর্চা করেছেন। তিনি সামাজিক নানা সংকটকে তাঁর কবিতায় প্রাধান্য দিয়ে এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অবলোকন করে সাধারণ মানুষের সংকট উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন তাঁর মতো করে, শিল্পবোধ ও সৃজন ছিল তাঁর অন্বিষ্ট।

প্রায় দুই শতাব্দী কালের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের প্রাক্কালে—১৯৪৭ সালে কবি আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* প্রকাশিত হয়। এ কাব্যের কবিতাগুলো তাঁর কলকাতায় যাওয়া (আগস্ট, ১৯৩৬) থেকে শুরু করে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সময়পর্বে রচিত। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকেই আমরা অবগত আছি যে, কেমন কঠিন জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর ব্যক্তিক সংকট-সংগ্রাম আর সাধারণ মানুষের জীবন ও শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রাম যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল ওই সময়টাতে। তাঁর উপলব্ধিতে দুঃখময় বিভাবরীর অবসানই সংকেতিত হয়েছে 'রাত্রিশেষ' অভিধায়। এবার আলোকিত প্রভাতে স্বপ্নের বুননের ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের অপেক্ষা।

বিশ্বরাজনীতি সাপেক্ষে ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট কবি আহসান হাবীব বাস্তবানুগ অভিজ্ঞতা থেকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই অনুমান করেছিলেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আসন্ন অবসান। তিনি এ বিশ্বাসে স্থিত হয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের ফলে মানবিক বিপর্যয়ের সময়কালও শেষ, এখন শুধু প্রভাতের প্রহর গণনার অপেক্ষা। সেই সময় তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, ব্রিটিশদের ফাঁদে পা দিয়ে যে সাম্প্রদায়িক বিভীষিকাময় রাজনীতির সূত্রপাত, তারও বুঝি অবসান হচ্ছে। এসব ছাড়াও স্বার্থপরতার দরুন মানুষে মানুষে যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, ব্রিটিশদের বিদায় দেখতে পেয়ে তিনি সেসবেরও শেষ দেখে ফেলেছিলেন তাঁর রোমান্টিক-স্বাপ্নিক চোখে। এত কিছুর মধ্যে তিনি যে ব্যক্তিপর্যায়ে কাব্যিক উপলব্ধিতেও নতুনত্ব আনয়ন করার মানসে নিজেকে তৈরি করছিলেন, তার প্রতিফলন ঘটেছে প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর *রাত্রিশেষ* কাব্যের চারটি বিভাজনের মধ্যেও লক্ষ করা যায়, কবির কাব্যচেতনার রূপান্তর এবং ধারাবাহিক বিকাশ; তাঁর স্বকীয়তা ও সম্ভাবনা। 'প্রহর', 'প্রান্তিক', 'প্রতিভাস', 'পদক্ষেপ'—নতুনতর মাত্রায় প্রতিভাসিত আমাদের সামনে। ওই চার স্তরের কবিতাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কীভাবে ক্রমান্বয়ে তাঁর কবিসত্তার বাঁক পরিবর্তন ঘটেছে একই গ্রন্থের অভ্যন্তরে। যেমন, প্রথমদিককার কবিতায় তিনি বলেন :

মনের ফাটলে স্মরণাশ্রিত স্বপ্নের কণাগুলি
জন্ম দিয়েছে লক্ষ বীজাণু কুটিল মৃত্যুদূত।
নীল অরণ্যে এল অপঘাত অকস্মাৎ
যুগের চিতায় জ্বলে জীবনের প্রিয় প্রভাত।
অন্ধ নয়নে দিনের কামনা আজিও উর্ধ্বায়িত
মনের অশ্ব হ্রস্ব চরণ বঞ্চনা-শিক্ত আর্তনাদ।

("দিনগুলি মোর", *রাত্রিশেষ*)

যখন তিনি স্বপ্নের বীজ বুনবেন বলে ভাবছেন, তখন পুরোপুরি তৈরি ছিল না প্রত্যাশার ফসলি জমিন। খানিকটা ঘোর অন্ধকারে ভোরের স্বপ্ন দেখার মতোই। এ কারণেই *রাত্রিশেষের* প্রথম কবিতাতেই তিনি সাবলীলভাবে লেখেন, 'অন্ধ নয়নে দিনের কামনা আজিও উর্ধ্বায়িত'। তার বড় কারণ হলো তিনি সবই দেখছেন, পর্যবেক্ষণ করছেন, সবকিছুর মধ্যে দিনাতিপাতও করছেন কিন্তু কোনোকিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না। তিনি যখন অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা বেতারে প্রথম শ্রেণির শিল্পী হিসেবে কাজ করতেন, তখন বাংলা ভাষায় সাহিত্য-শিল্প-কবিতা চর্চাকারী অনেকের সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। তাঁরা আসতেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। অনুষ্ঠান শেষে তাঁরা বিশেষ করে, কবি-সাহিত্যিকেরা আড্ডায় মিলিত হতেন কলকাতা বেতারের কার্যালয়ে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সরোজ কুমার রায় চৌধুরী, বিমল চন্দ্র ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রণেন আচার্য প্রমুখ। কোনো কোনো দিন তাঁরা তুমুল রাজনৈতিক আড্ডায় মেতে উঠতেন। এমনকি তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হতেও ছাড়তেন না কেউ কেউ। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও আহসান হাবীব নির্লিপ্ত থাকতেন। কোনো ধরনের অংশগ্রহণই থাকত না তাঁর। প্রাসঙ্গিকভাবে সৈয়দ আলী আহসানের একটি স্মৃতিচারণার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো :

> আহসান হাবীব বিদ্যার্থীদের আসরের পরিচালক ছিলেন। গল্পগুজবে সরোজ কুমার প্রায়ই রাজনীতি নিয়ে আসতেন। একদিন হঠাৎ বললেন, 'আলী সাহেব, জানেন জিন্নাহ হচ্ছেন ব্রিটিশের একজন এজেন্ট।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি জানলেন কি করে?' তিনি...বললেন, 'আমি তো সাংবাদিক, আমার কাছে খবর আছে।' আমি বললাম, 'এজেন্ট অর্থাৎ দালাল তাহলে আপনি কাদের দালাল?'...তিনি প্রবল প্রতিবাদে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বিমল চন্দ্র ঘোষ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'জিন্নাহ, গান্ধী, নেহেরু সকলেই দালাল—পুঁজিপতিদের দালাল। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এরা কেউ জনগণের প্রতিনিধি নন।' এমন সময় বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র বলে উঠলেন,...'এ দেশের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস। তিনি একদিন আসবেন এবং দেশকে মুক্ত করবেন।' এত সব তীব্র সমালোচনার মধ্যে আহসান হাবীব নির্বিকার বসে নিজের কাজ করতেন, অংশগ্রহণ করতেন না। রাজনীতির প্রতি তিনি ছিলেন নিরাসক্ত উদাসীন। তাঁর নির্লিপ্ততার জন্য তাঁকে প্রায় চেনা যেত না।[৬]

এটা ঠিক যে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আহসান হাবীবের পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল মানুষের প্রতি, রোমান্টিকতার প্রতি, নিসর্গের প্রতি, হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির প্রতি,

Dhaka University Institutional Repository

ফেলে আসা ঐতিহ্যের প্রতি। পরিবেশ-প্রতিবেশ মানুষকে তিল তিল করে গড়ে তোলে আর পরিস্থিতি মানুষের চিন্তাকে নতুনত্ব দান করে–প্রতিভাকে শানিত করতে সহায়তা করে। আহসান হাবীবও সময়ের পরিস্থিতির আনুকূল্যে শানিত ও প্রাণিত হয়েছেন কিন্তু থেকেছেন নিরাসক্ত। তাঁর শিল্পীচেতনা তাই স্বকীয়তার কাঠিন্যে আঁটসাঁট। তবে, 'কবিমানসে স্বকাল ও স্বদেশচেতনার প্রভাব গভীর ছিল বলেই *রাত্রিশেষ*-এর পর্ব বিভক্ত কবিতার যাত্রা আবেগময় 'প্রহর'-শেষে দ্বিধাহত 'প্রান্তিক' পর্যায় থেকে ইতিহাস-চেতনার অভিব্যক্তিময় পথের 'প্রতিভাস' পর্যায় পেরিয়ে সমাজচেতনার 'পদক্ষেপ' নিশ্চিত করতে পেরেছে।'[৭] তাঁর এই কাব্যপ্রচেষ্টার মধ্যে সমাজ-রাজনীতি-মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমানভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এমনকি তাতে তাঁর কাব্যচিন্তার প্রতিফলনও ঘটেছে আধুনিক উপায়ে। যেমন "আজকের কবিতা"য় যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, সেখানে তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার ভাঙনধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন। আর এ দেশের মানুষও যে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বারবার প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছিল এবং সেই বিঘ্নতা অতিক্রম করতে, অধিকার আদায়ে, মানুষের জীবন বাজি রাখা ছাড়া কোনো উপায় নেই—সে বিষয়টিই কবি প্রধান উপজীব্য করে তুলেছেন কবিতাটিতে। তাই দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি উচ্চারণ করেন :

তোমার আমার দিন ফুরায়েছে যুগটাই নাকি বৈপ্লবিক—
গানের পাখিরা নাম সই করে নীচে লিখে দেয় রাজনীতিক
থাকতে কি চাও নির্বিরোধ ?
রক্তেই হবে সে ঋণ শোধ।
নীড় প্রলোভন নিরাপদ নয় বোমারু বিমান আকস্মিক
আরব্ধ গান এইখানে শেষ আজকে আহত সুরের পিক।

("আজকের কবিতা," *রাত্রিশেষ*)

অভিজ্ঞতা ও বাস্তব বোধের তাগিদে আমরা বুঝতে পারি, স্বপ্ন ও সংগ্রামের মধ্যে রয়েছে অতি নিকট-সম্পর্ক, যা ইতিহাস ধারণ করে। এই সন্ধি-সূত্রেই ইতিহাসচেতনার ইতিবাচক পথে কবি দেখতে পান নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন। বিশ্বাসের দীপ্তি নিয়ে ভালোবাসার আলো জ্বেলে তাই কবি ইতিবাচক চিন্তার গান গাইতে চান। মনে হয় তিনি অনেক কণ্ঠের সমস্বরের জন্যই কবিতার আয়োজন করেন:

আমাদের দিন মৃত্যু-তুহীন দীর্ঘায়ু হবে শ্যেনবিধান,
মৃৎ-পিপাসা ও শান্তিহরণ চিরদিন রবে বিদ্যমান।
জঠরের জ্বালা চিরন্তন
চির ক্লেদান্ত এই জীবন
যুগ নিষাদের কপিশ নয়ন হানবে সেখানে দৃষ্টিবাণ।
আজকের দিনে এই ত কবিতা গানের পাখির এই ত গান !

("আজকের কবিতা", *রাত্রিশেষ*)

আহসান হাবীবের কবিপরিচয়ের মূল সূত্র নিহিত রয়েছে *রাত্রিশেষ* কাব্যের কবিতাবলির গভীরে। কেননা, তাঁর কবিসত্তার উদ্ভাসন বিকাশ ঘটেছে এই কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে। উত্তরকালে যদিও তিনি প্রতিনিয়ত কবিতাকে রূপান্তরিত করেছেন, কবিতার বাঁক ফিরিয়েছেন। তবু তাঁর কাব্যধারার মূল সুর ধ্রুবকের মতোই অপরিবর্তনীয় থেকেছে। তাঁর কবিভাষা এমনই নিজস্ব যে সচেতন পাঠকমাত্রই কবিতার স্বাদ

Dhaka University Institutional Repository
নিয়ে সহজেই আবিষ্কার করতে পারেন কবিতাটি আহসান হাবীবের। এই স্বকীয়তা একজন মৌলিক কবিকে চিরকালীন করে তুলতে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বহন করে।

আহসান হাবীবের কবিতা সম্পর্কে কবি-প্রাবন্ধিক আহমদ রফিক বলেছেন, 'আহসান হাবীবের প্রধান কবি-কর্মে ব্যক্তি মানুষ ও সামাজিক মানুষ (এখানে শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষ) স্বদেশ ও সময়ের প্রেক্ষাপটে আপন চরিত্রে চিত্রিত হতে পেরেছে, এবং এটাই আহসান হাবীবের কবিকৃতি সম্পর্কে প্রধান কথা। এই নিচুস্বরে কথা, তাৎপর্যময় কথা বলা তার কাব্যমানসিকতার স্বভাবধর্ম বলে মনে করি। তাঁর কবিতার চরিত্রধর্মে সমাজচেতনার সঙ্গে রোমান্টিকতার এক ধরনের সমন্বয় ঘটেছিল এবং সেখানে সমাজচেতনা ও মানবিক চেতনা খুব ঘনিষ্ঠ সমঝোতায় পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে গেছে। তার কাব্যবোধ এই দুইয়েরই অনুশাসন মেনে চলেছে।'[৮] কোনো সচেতন শিল্পীর অকৃত্রিম সৃষ্টিশীলতা দেশজ ঐতিহ্য-ইতিহাস থেকে নিজেকে ছিন্নমূল দেখতে চায় না, চায় না সমাজ স্বদেশ চেতনার সঙ্গে দূরবর্তী শিল্পচর্চা। এই না-চাওয়ার প্রবণতা আহসান হাবীবের সব পর্বের কবিতায়ই কম-বেশি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কবিতার সাবলীল, স্বচ্ছন্দ প্রকাশ কবির স্বভাবধর্মের অনুকূল ছিল বলেই কবিতার উৎকর্ষে রোমান্টিক-সমাজচেতনা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই কবিতায় তিনি সহজ উপস্থাপনার কঠিন সাধনাটি আজীবন করে গেছেন। কেননা, তাঁর এই অন্তর্মুখী কবিবৈশিষ্ট্য এবং মাটিঘনিষ্ঠতা মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এমনকি এভাবেই তাঁর কাব্যস্বভাব গড়ে উঠেছে। যে কারণে রাজপথের প্রতিবাদী কবিতা নির্মাণের ক্ষেত্রেও একই ধরনের চৈতন্য দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। আর তাই একই বিষয় নিয়ে কবিতা লিখলেও সুভাষ-সুকান্ত প্রমুখের সঙ্গে তাঁর কাব্যচারিত্র্যে স্পষ্ট অমিল পরিলক্ষিত হয়। যেমন "রেড রোডে রাত্রিশেষ" বিষয়গুণে শাসন-শোষণবিরোধী এবং সামাজিক সচেতনতার ধারক হয়েও উচ্চকণ্ঠ আবেগী চারিত্র্যের বদলে সংহত শিল্পিত এবং দৃঢ়তার প্রকাশক :

এখন সাপের দেহ নড়বে
তারপর আকাশ থেকে ঝরবে
তীক্ষ্ণ তির্যক বর্শা—
আর উড়বে অনেক দূরে
ছিন্ন ভিন্ন কালো সাপের দেহাংশ,
মিলিয়ে যাবে
রেড্ রোডের বুক থেকে,
এগিয়ে যাবে কেল্লার মাঠ পেরিয়ে
তারপর আরো এগোবে।
... ...
এরা সেই আপনি গড়া খেয়া নৌকোয় হয়তো—
পেরিয়ে যাবে গঙ্গা
মিলিয়ে যাবে পশ্চিম সীমান্তে,
নদীর জলে ঝলকে উঠবে মুক্তি,
বন্যা আসবে রেড্ রোডের প্রান্তে
কেন না
এদিকে আবার জাগবে নতুন সূর্য!

("রেড রোডে রাত্রিশেষ", *রাত্রিশেষ*)

Dhaka University Institutional Repository

'রাত্রি শেষ' আর আসন্ন প্রভাতের সন্ধিক্ষণে স্বপ্নবিভোর কবি ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনে চলেন। সেই স্বপ্নে তিনি গড়বেন নতুন বসতি। ওই বসতি গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত থেকেই তিনি রচনা করেন পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *ছায়া হরিণ*। প্রথম কাব্য প্রকাশের প্রায় পনোরো বছর পর তাঁর দ্বিতীয় এই কাব্যের দেখা মেলে। তত দিনে আহসান হাবীব কবিতায় যে মাটি-হাওয়ার মানুষকে খুঁজে বেড়িয়েছেন, যে পলল মাটির জন্য বুকে একধরনের শূন্যতা অনুভব করেছেন, সেই দেশে প্রত্যাবর্তন করে স্থিত হয়েছেন। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে সৃষ্ট বিভক্তির পর কবি আর বেশি দিন কলকাতায় থাকতে চাননি। অন্য অনেক সহকর্মী-বন্ধু-শুভানুধ্যায়ীর মতো তিনিও তাঁর জন্মভূমে ফিরে আসেন। সংসার-সমেত বসতি শুরু করতে হয়েছে পূর্ববাংলার প্রধান নগর ঢাকায়। জন্মভূমিতে এসে কবিকে নতুনভাবে জীবন ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করতে হয়েছিল। কেননা, তখন তিনি আর একা নন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর স্বসৃষ্ট পরিবার এবং পরিজনেরাও। সুবিধার চেয়ে সংকটই সে সময়ে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। আগের পরিচিত কর্মস্থল-কর্মপথের সঙ্গে এখানকার অমিলটাই ছিল বেশি। এ অবস্থায় পরিবর্তিত পরিস্থিতির জীবনসংগ্রাম আহসান হাবীবকে নতুন করে সংকটাপন্ন করে তোলে। কিন্তু শূন্য পাথেয় নিয়ে অজানার পথে জীবন শুরু করা আহসান হাবীব জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়ার মতো মানুষ ছিলেন না। তাই তিনি লড়েছেন সময়ের বিরুদ্ধ স্রোতে। যে রাত্রিশেষে স্বপ্নের ভোরের আভাস তিনি পাচ্ছিলেন, তাঁর খুব সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছিল বাস্তবে। বরং এ সময় রাত্রিশেষের ক্লান্তিই যেন বেশি পেয়ে বসে তাঁকে। তাই তিমির নিবারণের নতুন পথ অনুসন্ধানের জন্য কবিকে প্রস্তুতি নিতে হয়। পার্থিব বাস্তবতা কবিকে সে সময় বিমূঢ় করে তুলেছিল। তাই আরেকটি রাত্রির শেষ দেখতে তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুত হতে হয় *ছায়া হরিণ* (১৯৬২) কাব্যের জন্য।

আহসান হাবীবের কবিতা মৌলিক ভাবনার ফসল। তাই তাঁর কাব্যগুলো জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নয়। অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রাজনীতি আর বৈষম্যময় সমাজনীতির স্বরূপ তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়েছে। আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন একদিকে আনন্দোজ্জ্বল, অন্যদিকে বেদনাময় তিমিরের সংকেত। তাই সেই সময়ের সমাজব্যবস্থায় কবির মন স্বস্তি পায়নি। এ-সমাজ যেন চারদিক থেকে শুধু শোষণ আর নিষ্পেষণ করতেই জানে। সমাজের স্বরূপ তিনি বুঝেছিলেন নির্মোহভাবে কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকায় তিনি সমাজের অবক্ষয়িত রূপের কার্যকারণ সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞাত। কেননা, যে সমাজব্যবস্থার পরিপোষণে তিনি লালিত-পালিত এবং যে প্রতিবেশ থেকে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, সেখান থেকে জীবন ও সমাজের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চোখ মেলা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাই কাব্যচর্চার প্রথম জীবনে সমাজ-ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তাঁর কাছে ছিল অপরিচিত। তবে তিনি শেষ অবধি অনেক প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল এবং জীবন-জিজ্ঞাসার অনেক প্রাচীর অতিক্রম করে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসচেতনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। সে কারণে একদিক থেকে তাঁর কবিতা ব্যক্তি ও তাঁর মনোজগতের রূপান্তরের শৈল্পিক ইতিহাস।

আমরা জানি, দেশবিভাগের পরপরই তৎকালীন পূর্ব বাংলায় আহসান হাবীবের মতো কবির কর্মসংস্থানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। বরং শুরু থেকেই এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানের বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার হয়েছিল, যা ক্রমান্বয়ে তীব্র হতে থাকে। তাদের শাসন-শোষণের ক্রমাগত নতুন কূটকৌশল এখানকার জনমানসকে বিচলিত করে তুলেছিল। ওই সময় পূর্ববঙ্গবাসীদের দ্বারা পরিচালিত কলকাতার কিছু বাংলা পত্রিকা ঢাকায় নতুন করে তাদের প্রকাশনা শুরু করলে আহসান হাবীবের মতো আরও অনেকে সেখানে অস্থায়ীভাবে কাজের সুযোগ পেয়ে যান কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository
বেতন বা আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ছিল খুবই কম। কাজেই কবিকে প্রতিনিয়ত তটস্থ থাকতে হয়েছে উপার্জনের জন্য, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য। এ অবস্থায় তাঁকে নতুন কাজের খোঁজে সচেষ্ট থাকতে হয়েছে। এর মধ্যে কোনো কোনো পত্রিকা কর্মী ছাঁটাই করলে এক-দুবার ছাঁটাইয়ের কবলেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। সুতরাং ঢাকায় ফিরেই সাধ থাকলেও কবিতার প্রতি সুবিচার করার সাধ্য ছিল না তাঁর। সংসার ও ব্যক্তিজীবনের ভার আর কর্মজীবনের অনিশ্চয়তার কারণে তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মপ্রক্রিয়া মসৃণভাবে চলতে পারেনি। কারণ কলকাতার প্রথম জীবনের মতো একক জীবন আর তখন ছিল না তাঁর। তিনি তখন সংসারী—তাঁর উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ পরিবারের সবাই।

যখন কলকাতা বেতার আর 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার সাহিত্যপাতা সম্পাদনার সুবাদে তাঁর পরিবার কেবল সচ্ছলতার স্বস্তি পেতে শুরু করেছিল, তখনই দেশে ফিরতে বাধ্য হন কবি। ঢাকায় ফেরার প্রেক্ষাপটটা যেমন ছিল ভিন্ন, তেমনি ঢাকায় নতুন কলেবরে 'ইত্তেহাদ' প্রকাশিত হলেও তা আগের জৌলুসে ফিরতে পারেনি। এমনকি 'মাসিক মোহাম্মদী', 'সওগাত' প্রভৃতি পত্রিকা দ্বিতীয় পর্যায়ে ঢাকায় প্রকাশনা শুরু করলেও এখানে আর আগের মতো সুযোগ-সুবিধা ছিল না কবি-কর্মীদের জন্য। তাই অনেকের মতো আহসান হাবীবকেও ছুটতে হয়েছে এ-অফিস থেকে সে-অফিসে। অনুভব করা যায় যে কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকলেও কবিতার জন্য নিজের মতো সময় তিনি দিতে পারেননি। *রাত্রিশেষ*-এর পর *ছায়া হরিণ* প্রকাশে পনেরোটি বছর বিলম্বের অন্যতম কারণ হতে পারে হয়তো সেটা। কেননা, এই সময়ে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে অনুবাদসহ নানা ফরমাশি কাজে। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর ভাবনার রূপান্তর যেমন লক্ষণীয়, তেমনি রাত্রি শেষ হওয়ার আশাবাদ পূর্ববর্তী গ্রন্থে ব্যক্ত হলেও পরবর্তী গ্রন্থে দেখি কবির তা নিয়ে শঙ্কাও সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের আশাভঙ্গের নতুন নতুন কারণকে আমরা এর জন্য চিহ্নিত করতে পারি। যে স্বপ্ন নিয়ে কবির মতো সাধারণ মানুষ নতুন দেশের সার্বভৌম সত্তা দেখতে পেয়েছিলেন, ওই স্বপ্ন দেখে কবিও চেয়েছিলেন শোষণমুক্ত সমাজ—চেয়েছিলেন মানুষে মানুষে সম্প্রীতির এক দৃঢ়বন্ধন। কিন্তু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে প্রত্যাশার বিপরীত চিত্রই অবলোকন করতে হয় তাঁকে। যে নিসর্গমণ্ডিত জমিনে কবি জন্ম নিয়েছিলেন, সেই জমিনটা তখন তাঁর কাছে অসহায় মায়ের প্রতিমূর্তির মতো মনে হয়। আরও মনে হয়, এই মায়ের তো কোনো দোষ নেই, অথচ যুগের পর যুগ অসহায়ত্বের ছাপ নিয়ে, নানা শোষণ আর অত্যাচারের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে এই দেশজননী টিকে রয়েছে। তাঁর কবিতায় ও লেখালেখির অনুঘটক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে দেশমাতার। তাই এই দেশমাতাকে নিয়ে বিচলিত কবির কলম থেকে নির্মিতি পায় নিজে কিছু না-করতে-পারার আহাজারি-সংবলিত কবিতা। তবে এই দেশের আলো-হাওয়ায় গড়া শরীরের রক্তপ্রবাহে বয়ে যাওয়া ঋণ একজন সুসন্তান হিসেবে জননীর অপরিশোধ্য ঋণের মতোই অকপটে স্বীকার করেন কবি :

একদা মায়ের মুখের সেই তৃষ্ণার আঁধার
অতঃপর আলো হয়ে আমার অধরে
রেখেছে চুম্বন; আমি মা বলে ডেকেছি মাকে
আমি তোমাকে পেয়েছি আর মাকেও পেয়েছি।
যৌবনের সব তৃষ্ণা একটি মুখে যখন খুঁজেছে
পৃথিবীকে, ক্লান্ত দিনে আশ্রয় চেয়েছে;
ফুল পাখি আকাশের চাঁদ
দু' হাতে যখন তার তুলে দিতে চেয়েছি, তখন
তুমি ছিলে সঙ্গী, তাই সহজেই তাকে

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছি ; কেননা তারো আগে তোমার বুকে

হীরে নিয়ে তারই জন্যে মালা গেঁথেছি।

("তোমাতে অমর আমি", *ছায়া হরিণ*)

কতটুকু নিভৃতচারী হলে এভাবে—এমন দৃঢ়কণ্ঠে গর্ভধারিণীর অনুষঙ্গে দেশমাতার কথা তুলে ধরা যায়, তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপর্যুক্ত কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো। আমরা দেখেছি, চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে কেউ কেউ অনেক উঁচুস্বরে দেশের কথা, মানুষের সংকটের কথা কবিতায় প্রতিফলিত করেছেন। কিন্তু আহসান হাবীবের ধরনটা ভিন্ন। তিনি 'হীরে নিয়ে' মায়ের জন্য মালা গাঁথেন কিন্তু তাঁর স্বপ্নের কথা কাউকে বলেন না। কবিতার পঙ্‌ক্তি দিয়ে এমন সাববীল প্রকাশের জন্য কবিকে নিরাসক্তভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের উত্তুঙ্গ রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এ কাব্যের কিছু কবিতা আগের রচিত হলেও বেশির ভাগ কবিতাই দেশভাগের পরবর্তী সময়ে রচিত। ওই সময়ে সাধারণ মানুষের একজন প্রতিনিধি হয়েই তিনি তাঁর কবিতায় দেশপ্রেমের কথা বলেন। কীভাবে এই 'সোনার দেশের' প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ আবেগ ব্যক্ত হয়েছে, তা "তোমাতে অমর আমি" কবিতার আরও কিছু চরণ উদ্ধৃত করলে স্পষ্ট হবে। দেশমাতৃকা যে কবির অনুভূতিকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল এবং কবিকে আরো বেশি সৃষ্টিশীল ও দৃঢ়কণ্ঠ করে তুলেছিল, তা আমরা লক্ষ করি যখন তিনি বলেন, 'মায়ের মত বুক পেতে রাখা এই/দেশকে আমি ভালোবাসি...'। দেশের প্রকৃতির সঙ্গে ঐকাত্ম্য প্রকাশ করে তিনি আরো বলেন :

মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই
দেশকে আমি ভালোবাসি সে কথা সে সোনার দেশের
আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে।
লিখেছি আপন মনে একা আমি আমার দিনের
সারা পথে ; মাকে আর প্রেয়সীকে আর এই দেশকে
আমি ভালোবাসি এই ছোট কথাটি প্রত্যহ
নানা রঙে
এঁকেছি তোমার বিচিত্র রঙের তুলি হাতে নিয়ে
... ...
আমাকে দিয়েছো এক মহত্তম শিল্পীর মহিমা।
আজন্ম লালনে তুমি আজীবন সমৃদ্ধ হয়েছো
আছো তুমি সমগ্র সত্তায় ;
... ...
এই দেশ দেশের মানুষ
মানুষের সুখদুঃখ ভালোবাসা
তুমিই করেছো মূর্ত এবং তুমিই
আমার আত্মার এক অনবদ্য প্রতিমার মত
... ...
তোমাতেই মূর্ত দেখি সভ্যতার অমর মিনার।

("তোমাতে অমর আমি", *ছায়া হরিণ*)

Dhaka University Institutional Repository

এ কাব্যের আরও একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো "জল পড়ে পাতা নড়ে"। বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যের পাশাপাশি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কিছু চিত্র এখানে কবি তুলে এনেছেন, যা এখন আর নেই আগের মতো। কারণ কবি তখন থেকে আরও অনেক বছর আগেই নিজের জন্মস্থানটি ছেড়ে এসেছিলেন। তিনি কেবল স্মৃতি আর কবিতার মধ্যেই তাঁর শৈশবের নিসর্গ-প্রকৃতি আর 'ঘুঘুর ডাক', 'মোরগ-ভোর', 'ধান কুড়োবার দিন', 'হাটুরে তার মন' খুঁজে বেড়ান। নদীবিধৌত মানুষ, বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের জীবিকা-নির্বাহের চিত্র আমরা এখানে প্রতিফলিত হতে দেখি। এসবই ফেলে রেখে কলকাতায় গিয়েছিলেন কবি; পরে আবার আরেক নগর ঢাকায় খুঁজে নিয়েছিলেন বসতি। তাঁর প্রশ্ন, যেসব রেখে গিয়েছিলেন কৈশোরে, সেসব কি আছে আগের মতো?

পুকুর ঘাটের শেষে
গলাজলে বুক রেখে
এখনো কি দুই চোখ ছলছল করে
আর জল ঝরে?
এখনো কি মাঝে মাঝে
বিকেলে ঘুঘুর ডাকে বুক ভরে কান্না পায়
মনে হয়—
সুমুখের মাঠ-বন
পেরিয়ে যে নদী বয় তার বুকে
শপ্ শপ্ বৈঠার আওয়াজ ;
আর পাখির ডানায় মন ভর দিয়ে
ভরা গাঙে উড়ে গিয়ে
এখনো কি সেই মুখ খোঁজ করে,
("জল পড়ে পাতা নড়ে", *ছায়া হরিণ*)

ছায়া হরিণ কাব্য এবং উপর্যুক্ত কবিতা দুটি প্রসঙ্গে আহমদ রফিকের বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, 'চরিত্রবিচারে এ বইয়ের "তোমাতে অমর আমি" এবং "জল পড়ে পাতা নড়ে" কবিতা দুটো বিশেষ তাৎপর্যবহ। বুঝতে কষ্ট হয় না, অন্বেষার মধ্য দিয়েও কবির দ্বিতীয় যাত্রা ঐতিহ্যাশ্রয়ী পথের নিশানায় এগিয়ে যেতে আগ্রহী। দেশকালের চৌহদ্দিতে পরিস্ফুট ভালোবাসা নামক বহুমাত্রিক শক্তিমান আবেগ রোমান্টিকতার স্পর্শ সত্ত্বেও সচেতনতার যাত্রায় মুক্তি খোঁজে; যে আবেগ মা, প্রেয়সী ও মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে শৈল্পিক বিক্রিয়ায় একাকার হয়ে যায়।'[৯]

কিছুটা দ্বিধা সত্ত্বেও এ কাব্যের কবিতার মধ্য দিয়ে কবি যেন আপন ভুবনকে খুঁজে বেড়ান। নিজের মাটি, মাতৃভূমি, নিসর্গের খণ্ড খণ্ড রূপ ধরা পড়েছে এ কাব্যের প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই। পলিমাটির স্নেহভরা বহমান নদী তাঁকে যে কবি করে তুলেছে, সেই কবিসত্তাকে তিনি জীবনের সমার্থক করে তুলতে চেয়েছেন। কবি মূলত নদী ও জলস্রোতের ঐতিহ্যিক বাতাবরণে নিশ্চিন্ত হয়ে পথ চলতে চেয়েছেন কবিতার নতুন মাত্রা সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে। যেমন :

ঐতিহ্যের ডানা বেয়ে নামে
কী অতল সমুদ্রবিস্তার
ঢেউয়ে ঢেউয়ে উচ্ছ্বসিত নিত্য নব প্রাণ-সবিতার
সোনারঙ।
... ...
রাত্রির আকাশ ঘিরে জেগে থাকে চাঁদ

Dhaka University Institutional Repository

আশা জাগে ভাষা পাই মনে পাই গভীর আশ্বাস।
লিখি ইতিহাস
আগামী দিনের এক পৃথিবীর প্রাচুর্যের গান
অনাগত মানুষের প্রাণ
পৃথিবীর পথে পথে দিয়ে যাই সহজে জাগিয়ে
মনের মাধুর্য আর হাতের মুঠি দিয়ে।

("জীবন", *ছায়া হরিণ*)

এ কাব্যে আহসান হাবীব মূলত বিশ্বব্যাপী শান্তি খুঁজেছেন। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্যই তিনি তাঁর সমকালের সমাজকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। তিনি চিত্রিত হরিণের ছায়ায় সাধারণ মানুষের শ্রী কামনা করেছেন যৌক্তিকভাবে। তবে এর জন্য যে বিশ্বব্যাপী শুদ্ধতা প্রয়োজন, তা ভোলেন না তিনি। সমাজ রাষ্ট্র, সর্বোপরি মানুষের বিবেক আর চেতনার সুষ্ঠু বিকাশ কামনা করেছেন তিনি কবিতার মধ্য দিয়ে। ইতোমধ্যে শ্রেণিসচেতন একটি মন তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছে; তিনি নির্ণয় করতে শিখেছেন ধনবাদী সমাজব্যবস্থার শোষণ-কৌশল ও সংকটের সূত্রাবলি। এ সমাজে সাধারণ মানুষ যে শোষণ-নিপীড়নের বলয়ভুক্ত হয়ে ক্রমাগত ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে চলে—এমন প্রত্যভিজ্ঞানের মুখোমুখি হয়ে যান স্বভাব-একাকী নৈঃসঙ্গ্যপ্রিয় কবি আহসান হাবীব। মানুষের এই অস্তিত্বগত সংকটের বন্দিদশা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর "ছহি জঙ্গনামা" কবিতায় :

খোদার ফরজন্দ এই হুজ্জত্ সরদার
বেইমানীর কোনোকালে ধারে নাই ধার।
যেখানে দেখেছি কিছু বে-এনসাফির
মওত কবুল করে করেছি ফিকির।
আতশী নজর দেখে কেঁপেছে বেইমান,
সেকান্দার শা'র মত ছিল মোর শান।
... ...
একদিন দেখা গেল নুন নেই ঘরে
দেখা গেল পরদিন বৌয়ের ছতরে
ইজ্জত বাঁচার মত তেনাটুকু নাই
আচম্বিতে শরমেতে নজর নামাই।
... ...
দেখেছি কেমন করে বাঁচাতে ইজ্জত
ঝি-বৌ নিয়েছে বেছে মওতের পথ,
মওতের হাত থেকে বাঁচার আশাতে
দেখেছি কেমন করে নিজেদের হাতে
ইজ্জত করেছে বিক্রি দেশের মা বোন
চতুর্দিক ছেয়ে গেলো সফেদ কাফন।

("ছহি জঙ্গনামা", *ছায়া হরিণ*)

এই কবিতায় কবি মৃদু তিরস্কারে অকৃত্রিমভাবে সমাজের নিষ্ঠুর চিত্র তুলে ধরেছেন। কবিতায় সচরাচর শব্দের অহেতুক সমাগম তিনি ঘটান না, এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রয়োজনীয় আরবি-ফারসি শব্দের সুমিত বিন্যাসে তিনি সমাজের বিকৃত অথচ যুদ্ধের প্রভাবে বিরাজমান প্রকৃত চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দুই

আহসান হাবীবের শিল্পীচেতনার স্বরূপ অনুধাবনের জন্য তাঁর সমকালের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাচরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। কারণ তিনি আমাদের সাহিত্যের সেই বিরলপ্রজ কবি, যিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রত্যক্ষ করেছেন; দেখেছেন মানবসৃষ্ট বর্বতার নিষ্ঠুর চিত্র। তেমনি তাঁকে দেখতে হয়েছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অদূরদর্শী ফসল দেশবিভাগ এবং তৎপরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলার মানুষের পাকিস্তানি বর্বরতার প্রতিবাদে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের আন্দোলন। কাল-পরিক্রমায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগের মহিমা আবার স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে জাতির জনকের বর্বর হত্যাকাণ্ড থেকে সামরিক শোষণের জাতাকলে পিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জীবন। সেই সঙ্গে তিনি চালিয়েছিলেন তাঁর জীবনযুদ্ধও। চল্লিশের দশকজুড়ে চলা স্থানীয় রাজনীতির জিঘাংসা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষ সাক্ষীও তিনি। আর সাতচল্লিশে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে কবিকে ফিরতে হলো মাতৃভূমিতে—বাধ্য হয়েই। কিছুদিন পরই তিনি দেখেছেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভক্ত পাকিস্তানের একটি অংশ—পূর্ব বাংলার ওপর কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন পাকিস্তানিরা ক্রমান্বয়ে কেমন নৃশংস হয়ে উঠেছিল। শুরু থেকেই যে অত্যাচারী মনোভাব ছিল তাদের, তার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় বাহান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারি। তারপরের রাজনৈতিক ঘটনাবলিও সাধারণ সচেতন মানুষের মতো কবির কাছে সুখকর ছিল না। যদিও ১৯৪৭ সালেই তিনি পরাধীনতা নামক 'রাত্রি'র 'শেষ' দেখে ফেলেছিলেন। কিন্তু আসলে ওই সময়ে শুধু শোষকের হাতবদল হয়েছিল মাত্র—ইতিহাস আমাদের তা-ই অবগত করে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মানুষের অধিকার আদায়ে সংঘটিত আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে চল্লিশের দশকের বৃটিশবিরোধী আন্দোলনকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ, স্থূল অর্থে তখন মূলত চলছিল ব্রিটিশ হটাও আন্দোলন আর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকজুড়ে চলে স্বাধিকার আন্দোলন, যা ওই কালের শেষ সময়ে পাকিস্তানিদের হটানোর আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মূলত এটি ছিল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তির আন্দোলন—একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ডের জন্য আত্মত্যাগী আন্দোলন। তাই দেশভাগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভাষা-আন্দোলন, সামরিক শাসন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতির প্রত্যক্ষদর্শী কবি আহসান হাবীব তাঁর অভিজ্ঞতাকে কবিতার জমিনে রোপণ করে ফেললেন সহজ অথচ ঋজু ভঙ্গিমায়।

সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অসংগতি তাঁকে ক্রমাগত পীড়িতও করেছে। *ছায়া হরিণ* কাব্যের কবিতায় চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে যে সংশয় ও দ্বিধা ছিল, তা নিয়েই কবি পৌঁছেছেন *সারা দুপুর* (১৯৬৪) কাব্যে। কোনো-কোনো সময় মনে হতে পারে, *ছায়া হরিণ* কাব্যগ্রন্থের সম্প্রসারিত রূপ হলো *সারা দুপুর*। তবে সেটা সর্বৈব সঠিক নয়। কারণ এখানে কবি বিক্ষত মন নিয়ে স্বস্তি পাওয়ার অভিপ্রায়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন। যে আবেগ নিয়ে পাকিস্তান স্বাধীন হলো, তার ছিঁটেফোটাও সমাজে প্রতিফলিত হয়নি। বরং সমাজের মানুষ ছিল নানাভাবে নির্যাতিত, প্রতিনিয়ত শিকার হচ্ছিল বৈষম্যের। তবু মাটি ও ঐতিহ্যের প্রতি শতভাগ বিশ্বাস অটুট রেখে কবি মানুষের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন কবিতায়। সাময়িক নিঃসঙ্গতা, বিষণ্নতা, তিক্ততা—সবকিছুকেই কবিতার ভাষায় উপস্থাপনে কবি যেন এক মহান ব্রত পালন করেছেন *সারা দুপুর*-এর কবিতায়। এ কাব্যের উৎসর্গপত্রেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনকার সবই যেন পোড়োজমির মতো। কবি যেন প্রশ্ন করে উত্তর হাতড়িয়েছেন স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে। তিনি বলেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

সারা রাত সারা রাত এত যে শিশির আর

জানালার বাইরে সারা রাত

এত যে কান্নার সুর

তবু কেন ভোরের বাগানে কান্না নেই,

মহৎ মধুর কান্তি তার

কেন পোড়ে এত ভোরে

কে পোড়ায় সাজানো বাগান?

("উৎসর্গপত্র", *সারা দুপুর*)

এমন স্বগতোক্তি তিনি আরও কিছু কবিতায় করেছেন নিজের বক্তব্যকে দৃঢ়তা দেওয়ার অভিপ্রায়ে। আশাবাদী কবি আহসান হাবীব সব সময় নির্ভর করেছেন দেশের জাতীয় ঐতিহ্য আর নিসর্গের ওপর। তিনি ছিলেন শতভাগ ইহজাগতিকাবাদী। ঐতিহ্যমুখিতাকে যাঁরা প্রাচীনতা বলতে চান, তাঁদের উদ্দেশে কবি বলেছেন যে, স্রষ্টাও তো প্রাচীন। স্রষ্টা তো প্রাচীনত্ব নিয়েই অবিচল আছেন স্বমহিমায়। আহসান হাবীবের দুটি সত্তা তাঁর "রোদে-মেঘে" নামক কবিতায় উপস্থিত—একটি কবিসত্তা, আরেকটি ব্যক্তিসত্তা। এখানে 'কবি আহসান হাবীব' দেশের প্রাচীনত্বকে ঐতিহ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'ব্যক্তি আহসান হাবীব'কে উদ্দেশে করে কবি বলেছেন :

রোদে-মেঘে মাখামাখি হলে
আকাশ বিচিত্র হয় এই দর্শনের প্রাচীনতা
একমাত্র প্রাচীনতা অপরাধ বলে গণ্য হলে, হায়—
তোমাকে অবশ্য আমি মনে করতে অনুরোধ জানাবো তখন
সুপ্রাচীন অথবা প্রাচীনতম বিধাতাকে
এবং তখন যদি জানতে চাই তার কোনো নতুন দর্শন
কী তুমি উত্তর দেবে?

("রোদে-মেঘে", *সারা দুপুর*)

আহসান হাবীব তাঁর কবিতায় একই সঙ্গে নিসর্গবোধ আর ঐতিহ্যচেতনার প্রয়োগ ঘটান। তাতে একধরনের আশাবাদী চেতনার সঞ্চারও হয়। ফলে পাঠকের মনে তাঁর কবিতার আস্বাদ এক সহজবোধ্য অনুভূতিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। মাঝেমধ্যে পাঠককে তিনি রূপকের আশ্রয়ে স্মৃতির গহীনে নিয়ে যান, যেটা তাঁর আসল জগৎ। সেই জগতে নিজে নিঃসঙ্গ হলেও অতীতচারণায় তিনি সব শূন্যতাকে পূর্ণ করে তোলেন। সভ্যতার ক্রম-উত্তরণ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগেও যে আদিমতা মানুষের জীবনে প্রেরণার অংশ হিসেবেই টিকে আছে, তা-ই তিনি দেখিয়েছেন এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। *সারা দুপুর* কাব্যের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় তাঁর অস্তিত্বের সরব উপস্থিতি। সেই জন্য তাঁকে অনেকে আত্মজৈবনিক কবি আখ্যা দিতে চেয়েছেন। কবি আস্তিত্বিক প্রশ্নে আশাজাগানিয়া বাণী শুনিয়েছেন এসব কবিতায়। এমনকি ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন ঐশ্বর্যময় স্বদেশ। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলার এক আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি এভাবে :

প্রহরীর মত দেখো জেগে আছে দিগন্ত আমার ;
আমি আছি এই নদী আর এই নদীর কল্লোলে
কান পেতে নির্ভয়; কেননা তুমি আজো পাশে আছো জানি
এ মাটির অকৃত্রিম সন্তান।...

... ...

নদীকে একদা

Dhaka University Institutional Repository

সমুদ্রের আলাপে মুখর দেখার যে সাধে তুমি
আমাকে তোমার কৈশোরে আশ্বাস আর সান্ত্বনায়
রেখেছো ভুলিয়ে, সব নিয়ে
তুমি যদি ভেসে যাও, অস্তিত্ব আমার
তবে কোন্ আশ্বাসের মৃত্তিকায় ভর দিয়ে দাঁড়াবে, আত্মার
এ শিখায় বলো কার পরিচর্যা প্রেমের প্রাণের
আমাকে নতুন কোনো বাসভূমি নতুন মাটিতে
রচনার ইঙ্গিতে নতুন এবং প্রখর কোনো
প্রতিভার স্পর্শ দেবে বলো ?

("এই ঝড়ে অন্ধকারে", *সারা দুপুর*)

এভাবে এ কাব্যে প্রতিফলিত সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক-ঐতিহ্যিক বিষয়াবলি দিয়ে কবি কাব্য-পাঠকদের সদাজাগ্রত রেখেছেন, যাতে মূলত কবির অস্তিত্ব আর শিকড়মুখী চেতনাই উদ্ভাসিত হয়েছে। এমন ঐতিহ্যের স্বপ্নে বিভোর হয়ে কবি সুদিনের আশায় বসতি গড়তে চান, যেখানে মানবতা বিপর্যস্ত হবে না। বরং মানুষ মানুষকে ভালোবাসায় সিক্ত করবে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি মাটির টানে ঐক্যবদ্ধ হবে। *সারা দুপুর* ও *আশায় বসতি* কাব্য রচনা করেছেন তিনি আমাদের জাতীয় সংকটের এক উত্তেজনাময় সময়কালে। তাই কবির ভাবনা দেশপ্রেম, দেশের প্রতি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি–এসবই উপজীব্য হয়েছে, বিশেষ করে *আশায় বসতি* কাব্যের কবিতায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কবি-সাহিত্যিক তাঁদের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় দেশপ্রেমকে অবলম্বন করেছিলেন। এ-ধরনের কবিতা মুক্তিযুদ্ধকালে যতটা রচিত হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি রচিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত গর্ব ও অর্জনের ইতিহাস, সেই সঙ্গে অকৃত্রিম ত্যাগেরও। তাই এখনো কবি-সাহিত্যিকেরা স্বাধীনতা চেতনা ও মুক্তির সংগ্রাম নিয়ে লেখনি চালিয়ে যাচ্ছেন, ভবিষ্যতেও অনেক কিছুই রচিত হবে মহান স্বাধীনতা-সংগ্রামকে নিয়ে, সেটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। তবে আহসান হাবীব আশায় বুক বেঁধে স্বাপ্নিক বসতি গড়তে চেয়ে *আশায় বসতি* (১৯৭৪) নামক যে কাব্যপ্রতিমা নির্মাণ করেছেন–স্বাধীনতার পর প্রকাশিত হলেও তার সব কবিতাই মুক্তিযুদ্ধ-পূর্বকালে রচিত। এ কাব্যে অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলি একটু নিবিড়ভাবে পাঠ করলেই বোঝা যায়, তিনি কী তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেছেন ষাটের দশকের সেই উত্তাল দিনগুলোতে। কবিতাগুলো পড়ে অনেকের মনে হতে পারে, এগুলো হয়তো মুক্তিযুদ্ধকালে বা মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি অস্তিত্বে ধারণ করে তার পরবর্তী সময়ে রচিত। ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো যুদ্ধের উত্তাপ কবি আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন বলেই সংগ্রাম আর অধিকার আদায়ের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর এ-কাব্যের উপমায়-প্রতিমায়। মনে হয় কবি যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছেন, অনেক মা সন্তানহারা হয়েছেন, বোন তার ভাইকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলছেন আর কবি বসে বসে কবিতা লিখছেন। কিন্তু কবি আসলে এখানে ভবিষ্যৎদর্শীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। হয়ত বিভ্রান্তি দূর করতেই কবি *আশায় বসতি* কাব্যের মুখবন্ধে লিখেছেন, 'উল্লেখ প্রয়োজন, দেশব্যাপী যখন স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিলো ক্রমান্বয়ে ; সেই দুর্যোগময় দিনগুলিতে ১৯৭১ মার্চ-এর আগে পর্যন্ত লেখা প্রায় সব কবিতাই এই–এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৬৪-তে প্রকাশিত সারা দুপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, পূর্ববর্তী এমন কিছু কবিতাও হয়ত রয়েছে এই সঙ্গে।... তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে লেখা কোনো কবিতাই আশায় বসতির অন্তর্ভুক্ত নয় এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সেসব কবিতা আর একটি পৃথক সংকলনে প্রকাশের আয়োজন প্রায় শেষ

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে এসেছে।'[১০] তার মানে ধরে নেওয়াই যায় যে, এরপর ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত কাব্য *মেঘ বলে চৈত্রে যাবোর* কবিতায় বিষয়বস্তু হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ত্যাগ, অর্জন এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের আশা-নিরাশার ঘটনাবলি।

আহসান হাবীবের কবিতায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দৃঢ় বিশ্বাসে ব্যক্ত হয়েছিল, সাধারণ মানুষের উত্তেজনার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেই আবেগ আর কবিতায় প্রতিফলিত আবেদন সংগ্রামী আর অধিকারবঞ্চিত মানুষের জন্য এখনো আদর্শস্বরূপ। তবে কালের সামাজিক রাজনৈতিক রূঢ় বাস্তবতায় কবি কখনো-কখনো নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন অকপটে। আবার প্রেরণাও জুগিয়েছেন মিছিলে অংশগ্রহণকারী প্রত্যয়ী মানুষের। পাকিস্তান আমলে শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি একজন মানুষ খুঁজছেন, যিনি মানবতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারবেন। কারণ চল্লিশের দশকে মানবতার অবমাননাকর যে দৃশ্য কবি অবলোকন করেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি তিনি ষাটের দশকে এসেও প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই মানবতার কবি আহসান হাবীব প্রকৃত মানুষের সন্ধান করেন, যিনি হবেন একটা জাতির মানুষ গড়ার কারিগর। স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে তিনি বলেন :

একটা লোক। লোকে বলে উন্মাদ। সে নাকি
দৈনিকে প্রত্যহ দেয় বিজ্ঞাপন, সভায় এবং
ঘরোয়া বৈঠকে তার একই কথা, একটিমাত্র আবেদন তার :
আমি একটি কারিগর, দক্ষ কারিগর চাই।
সরল বিনীত আর মিনতিতে পূর্ণ তার ভাষা
ভাষা তার সভায় বৈঠকে কখনো বা উত্তেজিত
কখনো আবেগে গভীর গম্ভীর আর জ্বালাময়।
... ...
লোকটা বটে উন্মাদ, সে বলে,
আমি একটি কারিগর চাই যার সেতু কিম্বা সড়ক
অথবা—
অথবা মিনার কিংবা ইমারত গড়ার কৌশল
জানার সামান্য কিছু প্রয়োজন নেই, শুধু জানে
মানুষ গড়ার কাজ।

("একটা লোক", *আশায় বসতি*)

অনুভব করা যায়, এই আপাত উন্মাদ অথচ প্রচণ্ড আশাবাদী মানুষটির মধ্যে ছায়া পড়েছে সমকালীন রাজনীতির কোনো মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বের। আহসান হাবীব বিশ্বাস করেন, দর্শন দিয়ে মধ্যবিত্তের জীবন চলে না। সেটা একান্ত চেতনাগত ব্যাপার। আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তৈরি করতে গেলে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শোষণ-অত্যাচারহীন পৃথিবী গড়তে হলে মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—কোনো দর্শন নিয়ে ধ্যান করলে চলবে না, দেশের সংকটের সময় নির্মোহভাবে কর্মীর ভূমিকায় বেরিয়ে পড়তে হবে। কবি কল্পনা করছেন, ততক্ষণে অনেকে বেরিয়েও পড়েছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রেরণা হচ্ছে ঐতিহ্য আর শক্তি হচ্ছে সাধারণ মানুষ, যাদের ভেতরে আছে প্রগাঢ় দেশপ্রেম; যারা শুধু সামনে এগোতে জানে, জীবন বাজি রেখে জ্বলতে জানে কিন্তু পিছু হটতে জানে না। দেশের প্রতি ভালোবাসার কারণে মা তাঁর ছেলেকে, বোন তাঁর ভাইকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। অথচ এখানে, মুক্তিযুদ্ধের আগেই কবি সেই চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলার দেশপ্রেমিক তরুণ প্রজন্ম যে পরাধীনতার

Dhaka University Institutional Repository

শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত আকাশ উপহার দেবে, সেই প্রতীক্ষায় কবি এবং তাঁর স্বজনেরা আগে থেকেই প্রহর গুনছেন যেন। কবি *আশায় বসতি*র কবিতায় যেমন তুলে ধরেছেন তৎকালীন আন্দোলন-সংগ্রামের চিত্র, তেমনি দেশের প্রতি তাঁর হৃদয়ানুভূতিরও প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। যদিও তিনি তখন পাকিস্তান সরকার পরিচালিত পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তানে' (দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিবর্তিত নাম 'দৈনিক বাংলা') কর্মরত ছিলেন। কিন্তু সেদিকে তাঁর কোনো পিছুটান ছিল না। বরং দরদ ছিল সাধারণ মানুষ আর দেশের প্রতি। ষাটের দশকের উত্তাল আন্দোলনে জনমত যে তখনকার শোষক গোষ্ঠীর বিপক্ষে ইস্পাত কঠিন মনোবল নিয়ে ঐক্যবদ্ধ, তার একটি বাস্তব চিত্র বলা যায় "মিছিলে অনেক মুখ" কবিতাটিকে। দৃষ্টান্তটি অনুধাবনীয় :

মিছিলে অনেক মুখ
দেখো দেখো প্রতি মুখ তার
সমস্ত দেশের বুক থরোথরো
উত্তেজিত
শপথে উজ্জ্বল !
সূর্যের দীপ্তিতে আঁকা মিছিলের মুখগুলি দেখো
দেখো দৃপ্ত বুক তার
দেখো তার পায়ের রেখায়
দেশের প্রাণের বন্যা উচ্ছল উত্তাল
মিছিলের মুখ দেখো
দেখো তার সারা মুখ দেখো
দেশের আত্মার আভা ;
দেখো লক্ষ জনতার প্রাণ
অমর দীপ্তিতে জ্বলে মিছিলের সারা মুখে দেখো।

("মিছিলে অনেক মুখ", *আশায় বসতি*)

উন্মাতাল দিনগুলোতে কবি যা দেখেছেন, তা-ই এ কবিতার বক্তব্য হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মিছিলের সব মুখে যেন কবি দেশের আত্মারই প্রতিফলন দেখেছিলেন। ১৯৭১ সালের জন-তরঙ্গ এ-কবিতায় আমরা অনায়াসে দেখতে পাই। কবির ভাবনার নৈপুণ্যেই কেবল তা সম্ভব হয়েছে। আমরা জানি, একাত্তরে এমন উত্তাল জনস্রোত শুধু মিছিলে নয়, যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল বলেই রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানিদের পরাজিত করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়েছিল। কবি যেন স্বাধীনতার এক অনিবার্য স্বপ্নের আকর্ষণে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলের আয়োজন করেছেন। মানুষের প্রতি বিশ্বাস আছে বলেই কবি জীবনকে প্রবহমান নদীর গতিধারার মতোই দেখতে চেয়েছেন। এ কারণে দেশের প্রকৃতি-নিসর্গ, ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ। হাজারো প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রকৃতি যেমন টিকে থাকে, এমনকি ক্ষণিকের ঝড়ে বিপর্যস্ত হলেও তা কাটিয়ে উঠে যেমন আবার স্বরূপে ফিরে সজীব হয়ে ওঠে, তেমনি বাংলার সাধারণ মানুষও নির্বিচারে শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার আর বঞ্চনা-লাঞ্ছনা সহ্য করেও টিকে থাকবে এবং নিষ্কণ্টক হবে তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পথচলা, সেটাই কবির একান্ত কামনা। কবি তাই বলেন :

কখন কোথায়
যন্ত্রণার দুঃসহতা ফেটে পড়ে, যায় ফেটে যায়

Dhaka University Institutional Repository

রক্তপলাশের বুক
ছড়ায় রক্তিম আশার আলোর স্রোত
দিগন্ত উজ্জ্বল। শোনা যায়
বৈঠক হলাহল, ওঠে সুর কাঁপে চরাচর।
এবার ফেরাবে মুখ বৈরী বাতাসের মুখ ফেরাবে, শপথ।
অমলধবল পাল তুলে দেবে প্রাণের হাওয়ায়।
("বৈরী বাতাস, অতঃপর", *আশায় বসতি*)

কবি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই দেখেছেন, দেশের মানুষ প্রতিনিয়ত বৈরী বিশ্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তাঁর সমগ্র অস্তিত্বও জীবন ও মননে এক অমোঘ বৈরিতার বিপরীতে দাঁড়ানো ছিল। এর মধ্যে আবার সমাজ-সংস্কৃতিও নিঃসীম বৈরিতার শিকার। কিন্তু কবি জানেন এই বৈরিতাই শেষ কথা নয়। একে অতিক্রম করার শক্তি-সামর্থ্য অবশ্যই মানুষের রয়েছে। কারণ জীবন কখনোই শুধু ফুলের পাপড়ির মতো পেলবতা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত নয়, বরং প্রবল বৈরিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উতরে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে জীবনের সার্থকতা।

ষাটের দশকের শেষদিকে উত্তাল সময় পেরিয়ে আন্দোলন যখন নির্দিষ্ট পরিণতির দিশা খুঁজে পাচ্ছিল, তখন কারো পক্ষেই আর ঘরে বসে থাকা সম্ভবপর ছিল না। কবি "ডাক" কবিতায় মুক্তির আন্দোলনে যে সর্বশ্রেণীর মানুষ একাত্ম হয়েছিল, সে বিষয়টিই উচ্চকিত করে তুলে ধরেছেন। কারণ কবি কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে সাধারণের কাতারে নেমে এসেছেন দেশপ্রেমের চেতনায়।

সব মুখে দেশের আত্মার
আরশি যেন। সব মুখ দেশের আরশিতে আঁকা যেন।
সারা দেশ সবাই মিছিলে।
("ডাক", *আশায় বসতি*)

আবার এও সত্য যে, যে কোনো বৈরিতাকে মোকাবিলা করে মানুষ যা অর্জন করে, তা প্রায় সময়ই বিনা দামে লাভ করা সম্ভব হয় না। এর জন্য স্বেচ্ছায় জীবনও উৎসর্গ করতে হয়। আর জাতীয় জীবনের সংকটাপন্ন অবস্থায় অকুতোভয় মানুষই তাদের আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে অবদান রাখেন সমাজের স্বাভাবিক প্রবহমানতাকে সচল রাখতে। এভাবে তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যান অমূল্য দিক-নির্দেশনা। কিন্তু যে মা সন্তানহারা হন, যে বোন ভাইহারা হন, যে সন্তান পিতৃহারা হন, তাঁরাই কেবল অনুভব করতে পারেন স্বজন হারানোর মর্মব্যথা। কবি তাঁদের কষ্টও নিজের কষ্ট বলে স্বীকার করে নিয়ে এবং স্বজনদের আত্মত্যাগের ঋণ শোধ করতে না পারার ব্যর্থতার দায় মাথায় নিয়ে প্রাণপণে তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছেন। কেননা, একজন সচেতন মানুষ হিসেবে যা যা করার প্রয়োজন ছিল, ব্যক্তিগতভাবে কবি ততটুকু দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। সাধারণ মানুষেরও ছিল নিরূপায় সীমাবদ্ধতা।

যখন জনরোষ গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছে, যখন ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলা থেকে মুক্ত করে এনেছে সাধারণ মানুষ, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে পরাজয়ের মুখে। সেই সময় ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বয়ে গিয়েছিল এ দেশের ওপর। সেই দুর্যোগ অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় আর প্লাবনে দশ লাখের মতো মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। ওই সংকটকালে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে ন্যূনতম মানবিক আচরণ দেখানো হয়নি দুর্যোগগ্রস্ত এ দেশের মানুষের প্রতি। কিন্তু কবি মনে করেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর অনেক উপায়ই তো অবশিষ্ট ছিল—নিদেনপক্ষে যাঁরা ভাগ্যক্রমে বেঁচেছিলেন, অন্তত তাঁদের জন্য। ব্যর্থ মনোরথে নিজের অসহায়ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করেছেন কবি—যথাযথভাবে তাঁদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি বলে। তাই তিনি "ক্ষমাই প্রার্থনা" নামে কবিতায় লিখেছেন :

অবশেষে হাতের শিথিল কব্জি থেকে
খসে গেছে বুকের দুলাল
তবুও বুঝিনি, আহা বুকের দুলাল যার গেছে
তার ব্যথা।

... ...

ভাবতে চেয়েছি আমি
ভাই গেলো বোন গেলো ভেসে,
বৃদ্ধ পিতা রূগ্ন (sic) মা আমার
আমার একান্ত নিরাপদ জীবনের কামনাতে
নিয়োজিত সবশেষ মুহূর্ত বিলিয়ে
ভেসে ভেসে চলে গেলো মৃত্যুর অতলে।

... ...

কেবল নীরবে
একান্তে দাঁড়াতে পারি
এবং জানাতে পারি
আমার এ অক্ষমতা
ক্ষমাপ্রার্থী হতে পারি
মৃত আর মৃতপ্রায়
এই সব মথিত আত্মার কাছে
গলিত শবের
পবিত্র দুর্গন্ধ কিছু গায়ে মেখে
রুগ্ন (sic) এ আত্মার শুশ্রূষায় রত হতে পারি।

("ক্ষমাই প্রার্থনা", *আশায় বসতি*)

তবে এত কিছুর পরও কবি শোকে মুহ্যমান হতে চান না বরং শোককে শক্তিতে পারিণত করতে চান। বন্ধু-স্বজনদের তাই তিনি ভবিষ্যতে বিপরীত দিক থেকে ধাবমান প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বলেন। জাতীয় সংকটকে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের অন্যায় ক্রোধের শিকার হয়ে নেতিবাচক কোনোকিছু না ভেবে, নদীর পাড়ভাঙা ঢেউয়ের মতো দেশের পাঁজরভাঙা আঘাতের সময় সামনাসামনি লড়াই করে টিকে থাকার জন্য যে মনোবল প্রয়োজন, কবি যেন তা-ই কামনা করেছেন "পলাতক বন্ধুকে" কবিতায়। অতীতের শোকে কাতরতা নয়, সামনের বৈরিতা মোকাবিলা করে, কষ্টকে জয় করে নতুন প্রজন্মের কাছে নব বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। কেননা, '৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার আগে থেকে শুরু করে গোটা ষাটের দশকে কম আশ্বাস দেয়নি পাকিস্তানি স্বৈরশাসকেরা। কিন্তু বারবার বিশ্বাস ভঙ্গ করে এ দেশের মানুষের ওপর ক্রমাগতভাবে পাশবিক হয়ে উঠেছিল তারা। তাই কোনো আশ্বাসে আর আস্থা না রাখারই পক্ষে কবি। এমনকি আঘাত এলে নির্দ্বিধায় প্রত্যাঘাতও করতে হবে—কবি যেন এমন ইঙ্গিতই করেছেন নিম্নের পঙ্‌ক্তিমালায় :

Dhaka University Institutional Repository

ভোরের মায়াবী

যে হরিণী তোমাকে পশ্চাতে ডাকে তাকে
বিদ্ধ করো মধ্যাহ্ন সূর্যের শরে। তার
রক্তস্রোতে পায়ের নীচের
মাটির নতুন জন্মবেদনায় উদ্বেলিত করো
করতলে যে অনন্য গোলাপের রেখা
জন্মাবধি লালন করেছো; তাকে
এই রাতে আলোর মিছিলে ফুটতে দাও ;
অন্ধকারে তাকে তুমি
ঝরে যেতে দিও না দিও না।

("পলাতক বন্ধুকে", *আশায় বসতি*)

তবে আহসান হাবীব অতীতচারী হতে চেয়েছেন ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত হওয়ার জন্য। অতীতের ঐশ্বর্যকে সমাজ-জাগরণের শক্তি হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি সমকালের ঘোরলাগা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। সময়ের প্রয়োজনে কবিরা মাঝেমধ্যেই অতীতের দিকে ফিরে তাকান ভবিষ্যৎকে নির্মাণের জন্য। আহসান হাবীবও তাঁর সমৃদ্ধ অতীতকে সামনে নিয়ে আসেন সংকট উত্তরণে মানুষকে প্রাণিত করার জন্য—প্রাণিত হওয়ার জন্যও। তাঁর অতীতচারিতা নিয়ে তুষার দাশের ইতিবাচক বক্তব্যটি প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

> কবি-সাহিত্যিকদের অতীতাশ্রয়ী ও ঐতিহ্য-সংলগ্ন হবার ঘটনাটি দু'টো কারণে ঘটে। প্রথমত, অতীত-ঐতিহ্য-সংলগ্ন হয়ে বর্তমানের মধ্যে তার ঐশ্বর্য-শক্তিকে অনুভবের মাধ্যমে সমাজ-শক্তিকে জাগ্রত করে তাকে এগিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা-বোধ থেকে, অন্যত্র ঘটে, যখন বর্তমান হয়ে যায় শূন্য, ভবিষ্যৎ কোনো আলোর দিশা দিতে পারেনা—সেই মহারিক্ত-বর্তমানে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ভবিষ্যৎকে এড়ানোর জন্যে অতীতাশ্রয়ী হয়ে, অতীত-ঐশ্বর্যের স্মৃতিচারণের মধ্যে যখন বাঁচতে চায় মানুষ, তখন। কবি এখানে প্রথমোক্ত কারণে অতীতাশ্রয়ী হয়েছেন—মনে তার সংশয়-জিজ্ঞাসা—যুক্ত করেছেন তিনি অতীত ও বর্তমানকে—তিনি প্রসারিত করেছেন ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যতের দিকে—অতীতে তিনি শুধু আশ্রয় নিতে চাননি—মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে চাননি মিথ্য ছলনায় সুধীন দত্তীয় উটের ভঙ্গিতে—প্রশ্ন তুলে ধরেছেন ভবিষ্যতের সন্তানের জন্যেও—এখানে প্রবহমান নদীর মুখে ছায়া ফেলেছে একইসাথে স্বাধীনতা, কবিতা ও দেশমাতৃকা।[১১]

সমস্ত বৈরিতা, সব ধরনের সংকটকে যে কোনো মূল্যে আহসান হাবীব অতিক্রম করতে চান—স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গড়তে। *আশায় বসতি* কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় আমরা ওই স্বপ্নের কথামালাই শিল্পিত হতে দেখি। অবশ্য এই শোষণ-নিপীড়িত-বঞ্চিত-লাঞ্ছিতদের জন্যে আশাই একমাত্র সঞ্জীবনী-শক্তি—সে কথা তিনি উপলব্ধি করেছেন।[১২] তাঁর এ কাব্যের উপমায়-প্রতিমায় মানুষের আশার প্রতিফলন ঘটেছে বলেই হয়ত এর নাম *আশায় বসতি*।

তিন

১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের নির্বিচারে গণহত্যা আর মানুষের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার মোকাবিলা করে বাঙালি জাতি অর্জন করে মহান স্বাধীনতা। অগণিত মানুষের আত্মত্যাগের ফসল বাংলাদেশ নামক স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ড। মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে দেখা গেল, রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক মুক্তির সুফল অর্জিত হলেও মানুষ

Dhaka University Institutional Repository
অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। অবশ্য, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই, সদ্য স্বাধীন একটা দেশে সেটা সম্ভবও ছিল না। ফলে দুর্ভিক্ষের মতো ভয়াবহ সামাজিক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির শিকারও হতে হয় সদ্য স্বাধীন দেশের বাসিন্দাদের। তবে মানুষের আশা আর অর্জনের মধ্যে একটা সাংঘর্ষিক অবস্থান আমরা বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত সময়পর্বে লক্ষ করি। কেননা, একদিকে ছিল রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে বিতর্কিত করার জন্য দেশের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা শত্রুদের নানামুখী অপতৎপরতা আর অন্যদিকে শাসনযন্ত্রের অদূরদর্শিতার কারণে মানুষের মধ্যে বিরাজ করছিল আকাঙ্ক্ষা-অপ্রাপ্তির টানাপোড়েন। এই দুই সংকট উত্তরণের জন্য যখন সম্মিলিতভাবে পথ খুঁজে বের করা ছিল আবশ্যক, তখনই বিপথগামী এবং পাকিস্তানি অনুচর কিছু সেনাসদস্যের হাতে জাতির জনকের নির্মম হত্যাকাণ্ড দেশকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। দীর্ঘ নয় মাস চলা যুদ্ধে শহীদদের রক্তের দাগ না শুকাতেই দেশের মানচিত্র সিক্ত হলো বাঙালির মহানায়কের পবিত্র শোণিতে। এই অবস্থাকে কবি আখ্যায়িত করেছেন বিরাণ ভূমিতে সূর্যের উত্তাপে পুড়ে যাওয়া ফসলি জমির সঙ্গে, যেখানে একটু শীতলতা বা বৃষ্টির সিক্ততায় সৃষ্টি হতে পারে প্রাণের জোয়ার। চৈত্রের দাবদাহ থেকে মানুষ ও প্রকৃতি কেউ যখন মুক্ত নয়, তখন কবি রূপকের ওপর ভর করে মেঘের কাছে যান—এই বাংলাদেশের পলল মাটিতে প্রাণের বীজ যাতে সঞ্জীবিত ধারায় প্রবহমান থাকতে পারে। কেননা 'চৈতালী ঘূর্ণি অগ্রদূত বৈশাখীর'। মুক্তিযুদ্ধকাল এবং তার পরবর্তী সময়ে রচিত কবিতা নিয়ে কবি আহসান হাবীব যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, সংগতকারণেই সেই কাব্যের নাম হয় *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* (১৯৭৬)। এই কাব্য এবং এর কবিতার লক্ষণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন প্রাবন্ধিক আহমদ রফিক :

> 'আশায় বসতি'তে যার সূচনা 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' পেরিয়ে তার প্রকাশ ক্রমেই কবিতা থেকে কবিতায় পরিস্ফুট। মাঝে মধ্যে হতাশা দেখা দেয়নি এমনও নয়। মনে হয়েছে : কই কিছুইতো হল না, ধরা গেল না অশ্বিষ্টকে। ...'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো'র চরিত্রলক্ষণ ঐ নামেই পরিস্ফুট। বাহাত্তর-পরবর্তী নৈরাজ্যের চাপে ক্ষণিক হতাশা সত্ত্বেও কবিতা বিশ্বাস হারায় না কিংবা বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয় না। চৈতী খরার দাবদাহ সত্ত্বেও মনে হয়, মেঘের দাক্ষিণ্যে শুকনো মাটির বুক সজল হয়ে উঠবে, মধ্যসত্তরেও পুরনো বোধের নতুন মোহনায় জাগরণ অনিবার্য মনে হয়। "স্বাধীনতা" নামক শব্দটি সময়ের ভারে দুন্দুভি বাজাতে থাকে।[১৩]

আহসান হাবীব এই কাব্যের নামকরণের মধ্যেই তাঁর 'কাব্যবাণী' লিপিবদ্ধ করেছেন। এককথায়, আশাবাদী জলধারার সঞ্জীবনী ক্ষমতা দিয়ে সমাজ-রাষ্ট্রের খরাভূম অবস্থা থেকে থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর যাপিত সময় এবং সমকালীন ঘটনাবলি, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রচিত এ কাব্যের কবিতাতেও কোনো রাজনৈতিক উচ্ছ্বাস নেই। শৈল্পিক তাড়নাই তাঁকে অহেতুক উচ্চ স্বরগ্রাম থেকে স্তিমিত রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধ এ সময়ের কবিতার প্রধার অনুষঙ্গ হলেও এবং কবি জনতার কাতারে নেমে এসে কবিতা রচনা করলেও কখনো নৈর্ব্যক্তিকতা থেকে সরে যাননি। বরং তাতে এমনকিছু লক্ষণও ধরা পড়ে, যাতে সে সময়ের নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিপরীতে স্বস্তি ও শান্তির বিকল্প হিসেবে গ্রাম ও নিসর্গের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। পাশাপাশি কবি তৎকালীন পোড়খাওয়া নাগরিক মধ্যবিত্তের সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের পথও অনুসন্ধান করেছেন। সময়ের উত্তালতা অতিক্রম করে, সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতী না হয়ে, ধ্রুপদী দর্শনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ না করে তিনি মানবতাবাদী সামষ্টিক চেতনায় নিবিড় থেকেছেন শৈল্পিক স্বার্থে। আর তা হলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চেতনাস্নাত পথ-পরিক্রমা। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম যেমন ছিল ওই সময়ের, তেমনি হাজার বছরের দীর্ঘ অভিযাত্রার ফসলও। এই সংগ্রাম শেষে যে অর্জন, তা সুস্থির সমাজের, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষের আশা আর স্বপ্নের আবাসপ্রাপ্তি। 'সুস্থির আবাস আকাঙ্ক্ষায় একাত্তরে রক্ত ও আনুষঙ্গিক উপচারের

Dhaka University Institutional Repository

বিনিময় মূল্যে আমরা পেয়েছিলাম স্বপ্নের স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে আহসান হাবীব গ্রহণ করেছিলেন নৈর্ব্যক্তিক নয়নে। হাজার বছরের সাধনা ও সংগ্রামে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির সূর্যমান অর্জন এই স্বাধীনতার ঐতিহাসিক গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেন কবি-আত্মার ত্রিনয়নে। একাত্তর-পরবর্তী সময়ের বাঙালি জাতির মনোজগতের ক্ষয় ও স্খলন, সংকট ও সম্ভাবনা, জাতিসত্তার দিকভ্রান্ত অস্থিরতা এবং স্বাধীনতা-স্বপ্নের বাতিঘর ক্রমে দূরে সরে যাওয়াকে তিনি প্রকাশ করেছেনে শিল্পের ভাষায়, কবিতায় ; শ্লোগানের সমস্বরে নয়।'[১৪]

মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন স্বেচ্ছায় যুদ্ধে অংশ নেওয়া আমরা যাঁদের হারিয়েছি এবং অতর্কিত হামলার শিকার হয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের দগদগে স্মৃতি কবির সামনে। সেসব আপনজন হারানোর বেদনা একসময় স্মৃতি হয়ে তাড়া করে কবিকে। কেননা, যে স্বপ্নে বিভোর হয়ে সাধারণ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে, সেই স্বপ্নের আংশিক অর্জিত হলেও তা যে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছিল বাহাত্তর-পরবর্তী সময়ে কবিতা অনুভব করেছিল। স্বজন হারানোর বেদনা তাই দুঃসহ স্মৃতি হয়ে তাড়িয়ে বেড়ায় তাঁকে। কবি যুদ্ধকালের অত্যন্ত সচেতন পর্যবেক্ষক ছিলেন, এমনকি ছিলেন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার আশ্রয়দাতাও।[১৫] গোটা মানবজাতির সামনে কবির প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা :

স্মৃতি থেকে ক্রমান্বয়ে
স্মৃতির অন্তর্গত আলো
অনন্য এ দীপাবলী
এই রাজতোরণে ছড়ালো
যে অটল প্রতিজ্ঞা তাকেই
সামনে রেখে
আমি কি কেবলই এই দুর্দিন পাহারা দিয়ে যাবো?
স্মৃতির দুঃসহ ভার কখন নামাবে

("নির্ভুল সংলাপে", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে মহান ত্যাগের আর অর্জনের ঘটনা। নিরস্ত্র বাঙালি শুধু মনোবলের কারণেই বিশ্বের অন্যতম এক সুশৃঙ্খল বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত জয় লাভ করতে পেরেছিল। যেহেতু যুদ্ধটা ছিল সর্বজনীন, তাই দেশের স্বাধীনতার জন্য শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে চাকরিজীবী, শ্রমিক থেকে শুরু করে কৃষক, নারী-বৃদ্ধ-ভবঘুরে-কিশোর—এক কথায় জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, অনেক কিশোর স্কুল পালিয়ে অথবা অভিভাবকের চোখ ফাঁকি দিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। কবিরও ছিল তখন কিশোরবয়সী এক ছেলে।[১৬] "আমার সন্তান" কবিতায় একজন কিশোর কোন ধরনের চেতনাবোধ থেকে তার জীবন বাজি রাখতে পারে এবং কেমন অসমসাহসী হতে পারে, তা কবি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁর অত্যন্ত নিখুঁত একটা শৈল্পিক চোখ ছিল বলেই। কিশোরবয়সী দুর্দমনীয়তা সম্পর্কে কবি ওয়াকিবহাল ব্যক্তি জীবন থেকেই। কেননা, তিনি জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ওই কিশোর বয়সেই। কিশোরদের রক্তকণিকায় প্রতিজ্ঞার যে অটলত্ব থাকে, যে আপসহীনতা বিরাজ করে, তাকে কোনো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দমানো যায় না। এই বয়স শুধু দৃঢ় এবং অবিচল বিশ্বাসে আপ্লুত হতে জানে, পিছু হটতে জানে না—ভেতরে নির্মাণ করতে জানে স্বকীয় জগৎ, যাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে দিকভ্রান্ত করা যায় না। কবির সেই উপলব্ধিই প্রতিফলিত হয়েছে নিচের চরণগুলোতে।

Dhaka University Institutional Repository

কী ভাবনায় আমার খোকন
দুদিনেই এমন গম্ভীর হয়ে গেলো
এমন বিষণ্ন কেন
দীর্ণবুক দুঃখী মানুষের মত হাঁটে কেন
এমন বয়স্ক কেন মনে হয় আমার খোকাকে।

... ...

হেঁটে যায় একাকী এমন রাজদর্পে
এবং তখন তার রাজদর্পে আহা
সারা পথ এমন উজ্জ্বল হয়ে
জ্বলে ওঠে কেন।
আর তার কিশোর দেহের কি আশ্চর্য মহিমা। দুচোখে
প্রজ্ঞার আগুন যেন
কণ্ঠস্বর যেন
স্বর্গীয় সংকেতে ঋদ্ধ শব্দাবলী ছড়ায় দুপাশে।

... ...

পিতার গর্বিত বুক উঁচু কাঁধ প্রশস্ত ললাট
ছাড়িয়ে সে আরো দীর্ঘতর হয়ে
আমার হাতের
নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে ছুটে যায়।

("আমার সন্তান", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

একজন কিশোর কীভাবে মানসিকভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে, অকৃত্রিম দেশপ্রেমের কারণে তার দীপ্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এই কবিতাটি। প্রতিজ্ঞায় অবিচল যে কোনো বয়সী মানুষ ভবিষ্য-মোকাবিলার জন্য যোগ্য হয়ে ওঠে, তার একটি বাস্তবানুগ অথচ শৈল্পিক দৃষ্টান্ত নির্মাণ করেছেন কবি আহসান হাবীব। একজন পিতা সন্তানের অমঙ্গল চিন্তায় তটস্থ হবেনই। সে জন্য সম্ভাব্য বিপদ থেকে সন্তান যাতে নিরাপদ থাকে, তার জন্য কৌশলী নিষেধাজ্ঞা থাকবে, সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু জনকের ভয়-দেখানো প্রবোধ কীভাবে, কতটা জোরালো যুক্তি দিয়ে উপেক্ষা করা যায়, তা-ও কবি প্রতিপন্ন করেছেন আলোচ্য কবিতায়। যেমন :

ওপথে নিশ্চিত মৃত্যু বলে আমি আবার
অসহায় শিশুর মতই কাঁদতে থাকি
তখন বয়স্ক কোনো পিতার কণ্ঠস্বরে খোকা বলে :
'মৃত্যুই জীবন'। এবং সে আরো বলে :
তুমি আর হাতের আড়ালে রেখো না আমার হাতে
ভয়ের কাফনে জড়িয়ে রেখো না আর
অন্ধকার ছড়িয়ে রেখো না,
আমার দুচোখে পিতা
তোমার চারপাশে বড় অন্ধকার তাই
সামনে যাবো
আরো সামনে
সূর্যোদয়ে যাবো।

("আমার সন্তান", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

Dhaka University Institutional Repository
এ দেশের জনসাধারণ যে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, আবেগ আর মনোবল ছাড়া শত্রুর মোকাবিলা করার কোনো অস্ত্রই তাদের ছিল না। সে জন্য কবি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাদের বুকের গহীনে সৃষ্ট আবেগ নামের অস্ত্রই যথেষ্ট। তিনি তাঁর কবিতায় উপযুক্ত শব্দমালায় তা চিত্রিত করতে পেরেছেন।

বুকের মধ্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নকে লালন করে মানুষ এক বিশেষ উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। আর তখন কবি রচনা করে চলেছেন 'মনোহর শব্দমালা'র শিল্পিত কবিতা। শব্দশিল্পীর কারিগরি সৌকর্যে বিশেষ ভঙ্গিতে কবিতা-প্রকৃতি-আত্মত্যাগ একাকার হয়ে গেছে *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*র অধিকাংশ কবিতায়। তাঁর শিল্পীচেতনা যেন যথেষ্ট প্রস্তুতির সঙ্গে স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত করে তোলে স্বাধীনতার মর্মকথাকে। দেশের প্রতি মমত্ববোধ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় "স্বাধীনতা" কবিতায়। এখানে কোনো চরিত্র নয়, কবি নিজেই 'লাল নীল সবুজ সমস্ত রঙ নিয়ে' সাধারণের সামনে উপস্থিত। মুক্তি-আন্দোলনের উত্তাল ওই সময়ে নিজের চেতনাকে শানিত করে নিতে আর জনমানসের প্রতি একাত্ম হওয়ার অভিপ্রায়ই যেন কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাই ঘোষণা করেন কবি :

শব্দের মালায় আমি তোমাকে গাঁথতে চাই—স্বাধীনতা ! তুমি
ঘরে-বাইরে এমন উলঝুলল নৃত্যে মেতে আছো, কি আশ্চর্য
আমার কলম
কিছুতেই তোমাকে যে ছুঁতেও পারে না। আমি
লাল নীল সবুজ সমস্ত রঙ নিয়ে
তোমাকেই সারা বুকে আঁকতে চাই, দেখি
নির্মলনিসর্গে তুমি সব রঙ উজাড় করেছো
... ...
মানুষকে ডেকে ডেকে বলি, এসো
স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে
আমরা সোচ্চার হয়ে আকাশকে সচকিত করে তুলি
আর হাওয়ায় ছড়াই কিছু নতুন গোলাপ,
দেখি জানালায় ঝুলে আছে নীলাকাশ
সামনের বাগানে
গোলাপ। বুকের মধ্যে
তুমি
মনোহর শব্দমালা !

("স্বাধীনতা", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

কবির শিল্পীচৈতন্যের স্বরূপ খুঁজতে গেলে এখানে আরো একটি বিষয় অত্যাবশ্যকভাবে এসে যায়। সেটি হলো স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশে সুস্থ পরিবেশ রক্ষায় শাসনযন্ত্রের ব্যর্থতা। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কয়েক বছরের মধ্যেই এমন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি মানুষকে আশাহত করে তুলেছিল। এ কাব্যে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের দিকভ্রান্ত অস্থিরতার চিত্রও আমরা দেখতে পাই। নাগরিক পরিবেশে জীবন যাপন করা সত্ত্বেও ঋদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি মোহনীয় দৃষ্টি সময়ের দাবিকেই উচ্চকিত করে। কবির আজন্মলালিত আর চিরকালীন অস্তিত্বের ঠিকানা তাঁকে সংকটকালে ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। তাই আধুনিক নগর জীবনের বিপরীতে তিনি অবারিত স্বাধীন আর ঝঞ্ঝামুক্ত জীবনের প্রতীক খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন বাংলার মাটির গভীরে।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা জানি, প্রথম থেকেই কবি প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ। *মেঘ বলে চৈত্রে যাবোতে* মুক্তিযুদ্ধ অন্যতম অনুষঙ্গ হলেও নিসর্গকে কবি সর্বশেষ এবং অবিনশ্বর আশ্রয় হিসেবে কবিতায় স্থান দিয়েছেন। এ কারণেই আধুনিক নগর জীবনের বিপরীতে গ্রামীণ জীবনের মুক্ত আলো-বাতাসে কবি স্বাধীন ও মুক্ত জীবনের অর্থ খুঁজে পান। পৃথিবীতে নিসর্গই কবির একমাত্র ভরসাস্থল। জনমনে যখন আশা ও আস্থার সংকট, তখনো তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাঁর চিরাচরিত শঙ্করপাশা গ্রাম বা কিশোরবেলার মহকুমা শহর পিরোজপুরে। কিন্তু সেই নিসর্গই নগরসভ্যতার কারণে আক্রান্ত হয়, ক্রমাগত ধ্বংসের সম্মুখীন হয় 'পূর্বপুরুষের' নির্মাণ করা গাছগাছালির সমাহার। এমনকি সভ্যতা-নির্মাণকারী মানুষই কৃত্রিম অট্টালিকা নির্মাণ করছে আর ধ্বংস ডেকে আনছে ঐতিহ্যকে নষ্ট করে। যে সভ্যতা মানুষকে মানবিক হতে প্রেরণা জোগায় না, যে সভ্যতায় মানুষ বাংলা মায়ের মুখ থেকে 'রূপকথা' কেড়ে নিচ্ছে, সে সভ্যতাকে ইতিবাচকভাবে দেখতে চান না কবি। শুধু তা-ই নয়, কবি এগুলোকে আত্মঘাতের সঙ্গে তুলনা করেন। তাই তিনি নীরব থাকতে পারেন না—প্রতিবাদ করেন এবং বলে ওঠেন :

তোমার এ হন্তারক উপস্থিতি চাই না চাই না।

... ...

তুমি কি জানো না
আর তোমার সম্রাট জানে না কি
তুমি আমি, সম্রাট তোমার
আমরাই নিসর্গ আর নিসর্গই আমরা সব
আমরা নিসর্গে বাঁচি
নিসর্গে নিঃশেষ !
এই তাল তমাল দেওদার আমাদের

("দোহাই তোমার", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

কবি আহসান হাবীব আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারকে মানুষের অকল্যাণ হিসেবে দেখেছেন তা কিন্তু নয়। বারবার তিনি সবুজাভ শ্যামলিমায় ভরা আমাদের নিসর্গের কথা উচ্চারণ করছেন, যাতে আমরা শিকড়শূন্য না হয়ে যাই। বিজ্ঞানের অনিবার্য প্রসার ও প্রয়োজনীয়তার কথা ইঙ্গিত করে তিনি গ্রিক পুরাণের চরিত্র রাজা মিডাসের প্রসঙ্গ টেনেছেন। কেননা, রাজা মিডাস উপকারের পুরস্কারস্বরূপ ডায়োনিসাসের কাছে যে বর[১৭] চেয়েছিলেন, তা সাময়িক আনন্দের কারণ হলেও, শেষ পর্যন্ত তা কষ্টের কারণ হয়েই দাঁড়িয়েছিল। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে বৃক্ষ নিধন করে, বন উজাড় করে চলছে আবাসন-ব্যবসা। এর বিরুদ্ধে সরকার যেমন বলছে অদূর ভবিষ্যতে আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাবের কথা, তেমনি সামাজিকভাবেও নেওয়া হচ্ছে নানা সচেতনতামূলক ব্যবস্থা। কবি সেভাবে না বললেও, তা যে অনেক স্মৃতিকে বিলীন করে দেবে, সেটা ভেবেই তিনি আতঙ্কিত হয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের কথা ভেবে তিনি কবিতার ভাষাতেই আসন্ন সংকটের কথা ব্যক্ত করে গেছেন চার দশক আগে। ঐতিহ্য আর নিসর্গের প্রতি অপরিসীম দরদের কারণেই কবিতার শব্দমঞ্জরিতে তিনি সচেতনভাবে গেঁথেছেন তাঁর অস্তিত্বের শিকড়ের কথা। বিজ্ঞানের অহর্নিশ প্রসারে বস্তুপৃথিবীর প্রসার ঈর্ষণীয় কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যেসব লীলাক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে, তার জন্য উদ্বেগের শেষ নেই কবির। তাই মানুষের নৈমিত্তক কল্যাণে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে মাথায় রেখেই তিনি বলেন :

দোহাই কেটো না
এই বটবৃক্ষ আর এই ছাতিম জারুল

Dhaka University Institutional Repository

পিতা কিংবা পিতামহের ঋদ্ধ হাতের অনন্য বরাভয়
বিলিয়েছে আশৈশব আমাকে তোমাকে,
... ...
জয়তু বিজ্ঞান ! জয়
জয় গতিময়তার অপার বিস্ময় !
তবু ভয়
শক্তিমদমত্ততা কখন
উন্মাদ অশ্বকে তার চিহ্নিত সীমানা
ছাড়িয়ে ছুটিয়ে নেয়
অতলনিতল অন্ধকারে
মৃত্যুর গহ্বরে !

("দোহাই তোমার", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

এর মধ্য দিয়ে কবি নগরজীবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অপরিচয় এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া কুণ্ডলায়িত অন্ধকার গুহাবাসের সঙ্গে। স্বাধিকার আন্দোলন ও নিসর্গের আহ্বান এই কাব্যের অপ্রধান অংশ, প্রধান অনুষঙ্গ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জাতীয় জীবনে বিরাজমান অস্থিরতা। আশাহত মধ্যবিত্তের আত্মদীর্ণ রূপ, অবসাদগ্রস্ত মন, শ্রেণিবৈষম্য-সংক্রান্ত মূল্যবোধের পতন—সময়ের এসব বাস্তবতা মথিত করেই কবি আহসান হাবীব বপন করেছেন আশা-আকাঙ্ক্ষার বীজ।

চার

আহসান হাবীবের কাব্যচেতনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* (১৯৮০) কাব্য। কবিজীবনের পরিণত সময়ে রচিত এই ক্যাব্যের নামে 'আদিম' শব্দটি গৃহীত হয়েছে মানবসভ্যতার পাথরযুগে উত্তরণের স্মৃতি-ঐতিহ্য ধারণ করে। সেই বিষয়গুলোকেই তুলে আনার চেষ্টা করেছেন কবি। তবে তার চেয়ে বড় কথা এই 'আদিম পাথর' প্রতীকের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক, কবি আহসান হাবীব অকৃত্রিমতা, ঐতিহ্য আর নিজের পাশাপাশি জাতিত্বের শিকড়কে অনুসন্ধান করেছেন এবং নিজের অতৃপ্তি ঘোচাতে ডুব দিতে চেয়েছেন তাঁর চোখে ধ্রুবকের মতো অপরিবর্তনীয় নিবিড় প্রকৃতি এবং আবহমান গ্রাম আর গ্রামের মানুষকে। সভ্যতা নির্মাণের কারিগর স্বশিক্ষিত কামার, কুমোর, মাঝি—তাদের মাঝেই কবি নিজের পূর্বপুরুষকে খুঁজে পান। কর্মসূত্রে এবং জীবিকার তাগিদে নগর জীবনের অধিবাসী কবির শেকড় প্রোথিত আজন্মলালিত শঙ্করপাশার সবুজ তৃণভূমে। যেখানে ভুবন কামার, খালিক নিকিরি আর জমিলার মায়েরা সারা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। যাঁদের কথা কবিতার পঙ্‌ক্তিতে অপরিহার্যভাবে স্থান দিয়ে তিনি মূলত আমাদের তথাকথিত নাগরিক জীবনের অসারতা প্রমাণ করেছেন—অন্তত জীবনের ইতিবাচকতা আর পরিপূর্ণতার জন্য কবি তাঁদের চেয়ে আপন আর কাউকে ভাবতে পারেননি। আর তাঁদের মধ্য দিয়েই কবি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি এই বাংলাদেশের মাটি-নিসর্গ আর আলো-হাওয়ার সংস্পর্শে বেড়ে ওঠা এক দেশপ্রেমিক সন্তান। অতীতচারী হতে চেয়েছেন তিনি ফেলে আসা শৈশব আর বাংলার আবহমান সংস্কৃতিকে তুলে ধরার মানসে।

*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*তে কবি খরাভূমিকে কল্পনা করেছেন আর আশার বীজ বুনেছেন *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যে। অন্যান্য কাব্যের কবিতায় যেখানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উঠে এসেছে বাংলার আবহমানতা, সেখানে এ কাব্যের প্রধান প্রসঙ্গই হয়ে উঠেছে সেই আবহমানতা। পাশাপাশি এটাও তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যে এক মহত্তম সত্য হয়ে উঠেছে যে, প্রথম থেকে শুরু করে কাব্যান্তরে তাঁর যে উত্তরণ, তা এ কাব্যে খানিকটা পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। যে কারণে কবি-আত্মার শেকড় এখানে স্বাদেশিক বোধের মাহাত্ম্য ছাড়িয়ে বৈশ্বিক কলেবরে প্রসারিত হয়েছে। যেমন ভুবন কামার, লক্ষ্মণ মুচি, মতি সওদাগরের যে অবস্থান কবি নির্মাণ করেছেন, তাতে তাঁরা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর প্রতিটি কেন্দ্রের জীবন-সংগ্রামী মানুষ হিসেবেই এ কাব্যে উচ্চ আসন লাভ করেছেন। এভাবেও বলা যায় যে, খালিক নিকিরিরা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর প্রতিটি কেন্দ্রের শেকড়-নিষ্ঠ মানুষদেরই প্রতিনিধিত্ব করে, যাদের অনুসন্ধান করেছেন আহসান হাবীব নিজে। কবির আবিষ্কৃত এই চরিত্রগুলো অনায়াসে গল্প বা উপন্যাসের চরিত্র হতে পারত, তা না হয়ে এখানে হয়ে উঠেছে গদ্য কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত ও বলিষ্ঠ রূপক চরিত্র। কারণ এমন অগণিত 'আদিম' পেশিবহুল মানুষের দ্বারাই এই সভ্যতার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। খালেক নিকিরির জীবনের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন এ দেশের প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় মানুষের। স্বাধীনতার অবব্যহিত পরে—১৯৭৫ সালে জাতির জনককে সপারিবারে হত্যার পর যে অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় বাঙালির জীবনে নেমে এসেছিল, সে সময়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন কবি আহসান হাবীব। ওই সময়ের পর থেকে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত উৎকণ্ঠার সময় অতিবাহিত করেছে এই জাতি। স্মরণীয় পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়েই লেখা এ কাব্যের কবিতাগুলো। ওই সময় উৎকণ্ঠিত ছিলেন কবি নিজেও—মুষড়ে পড়েছিলেন, মেনে নিতে পারেননি জনকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে।[১৮] তার পরও তিনি স্বরগ্রাম উঁচুতে তোলেননি এবং শিল্পিত কবিতার দাবিকে উপেক্ষা করেননি, বরং তা নিভৃতে অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। এ সময়ের একজন কবি হিসেবে—সাধারণ মানুষের সংবেদনশীল প্রতিনিধি হিসেবে কবি অত্যন্ত নির্মোহভাবে ভুবন কামারদের সঙ্গে নিজের স্বপ্নকে লালন করেন। সেই স্বপ্ন বয়ন করতে করতে দৃঢ় স্বপ্নচারী হতে থাকেন। আর সাধারণ মানুষের জন্য সংকল্পবদ্ধ কবি হিসেবে তিনি স্বপ্নকে ধরতে চান 'হাতের মুঠোয়'। কেননা, জনচিত্তের রক্ত তাঁর ধমনীতে; তিনি সেই স্বপ্নের তীব্রতা অনুভব করেন। কিন্তু অন্ধকার রাত অর্থাৎ জাতীয় জীবনে ঘনীভূত কালো মেঘ আর তাতে আচ্ছন্ন স্বপ্ন নিয়ে ভুবন কামাররা যেন ভোরের নিদর্শন 'পোহাতী তারার দিকে' তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন—তাঁদের শরীরে আলস্য নেমে আসে। এ সময়ে কবিচৈতন্যে তাই ভর করে রূপকের পসরা। অনায়াসে তিনি বলে যান :

বাড়িতে ছনের চালায় শিশির নামে কাঁঠালপাতার গা বেয়ে
দাশকবির ঘুঘুরা হঠাৎ দু' একবার ডানা ঝাড়ে
খালেক নিকিরির স্বপ্ন তবু পাশ ফিরে শোয় না একবারও
পোহাতী তারার দিকে চোখ রাখে দু' একবার
অলস হাই তোলে আর সমস্ত চেতনা প্রখর হ'য়ে থাকে
হাতের মুঠোয়।
হাতের মুঠোতে একটি মৃদু টঙ্কার, স্বপ্নময়
খালেক নিকিরির চেতনা জুড়ে
সেই একই স্বপ্নস্রোত অনবরত অবিরল

("আবহমান", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

এ কাব্যেই কবির ওপর সবচেয়ে বেশি ভর করেছিল অতীতবিধূরতা (nostalgia)। এর জন্য জীবিকার তাগিদে ঠাঁই নেওয়া নাগরিক জীবনের সংকটই হয়তো বেশি দায়ী। তবে, এ কথাও তো সত্যি যে তিনি কবিতায় নাগরিক সংকট তুলে আনতে যতটা না মনোযোগী, তার চেয়ে বেশি আন্তরিক ছিলেন বাংলাদেশের মানুষের শেকড় যেখানে প্রোথিত, সেই জীবনের প্রতিচ্ছবি কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করতে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার যে অংশ মধ্যবিত্ত জীবনের ধারক-বাহক, তাদের বেশির ভাগই শিক্ষা এবং কর্মের সুবাদে জন্মগ্রাম ছেড়ে শহরের বাসিন্দা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল প্রকৃতির সংসর্গে এবং নিসর্গের মুক্ত পরিবেশে অস্তিত্বের ভিত গড়া মানুষ। কিন্তু উত্তরকালে শহরের প্রতিও তাদের সৃষ্টি হয়েছে একধরনের বন্ধন। কবির মতো কবির অনেক স্বজনই যে ওই সময়ে নগর জীবনের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন, তার পরিচয় আমরা তাঁর কবিতায় পাই। আবার এর একটা প্রতীকী অর্থও থাকতে পারে। কারণ অন্তত তাঁর সময়ে, এমনকি এখনো গোটা বাংলাদেশটা মস্ত একটা গ্রাম। কিন্তু জীবিকার তাগিদে নগরকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেলে শহরের আবহের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে গিয়ে অনায়াসে প্রত্যেক মানুষ তার জন্মভূমিকে ভুলে বসে বা ভুলতে বাধ্য হয়—এভাবে শেকড়ের সঙ্গে ব্যবধান বা দূরত্ব তৈরি করে ফেলে মানুষ। নাগরিক জীবনের মিশ্র সংস্কৃতিতে কবি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। আর তাই স্বজনদের এবং নিজের ব্যক্তিসত্তাকেও তিনি বলেছেন 'ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে'। কিন্তু স্বগ্রামে কারো ফেরা হয় না। বিরল ব্যতিক্রম ব্যতীত কেউই আর সেই স্বস্তিকর জীবনের অনুভবকে জাগ্রত করে নাগরিক-সংকটকে পশ্চাতে ঠেলে দিতে পারে না। মধ্যবিত্ত সমাজের বাসিন্দাদের স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার এই প্রবণতাকে কবি নেতিবাচকভাবেই দেখেছেন। কবি একে বলেছেন 'স্মৃতিহননের উন্মত্ত খেলা'। অন্তত "ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে" কবিতায় কবির স্বজন বা বন্ধু বা শেকড়তোলা মানুষের প্রতি কবি একধরনের উন্নাসিক ভাবই ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

> ডাকলে কেউ আসে না যাবার মত কেউ নেই, এই
> একাকী নিঃসঙ্গ আমি একলা বাতাসের বুক উথালপাথাল
> এই ভয়াবহ শূন্যতার বুকে আমি কেবল কান্নায় ভেঙে
> ঝুলে থাকবো আরো কতকাল!
>
> ... ...
>
> স্মৃতিহননের এক উন্মত্ত খেলায় তুমি তোমার বিবরে।
> আমি এই খা-খা শুকনো নদী ধূসর বনানী
> মৃত নীল পাখি একলা পড়ে আছি। তুমি
> জলস্রোত শস্যবীজ সবুজতা এইসব নিয়ে
> ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে।

("ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

"ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে" কবিতার মতো আরেকটি কবিতা "যাবার আগে"। এ কবিতায় কবি স্বগত উক্তির মতো পঙ্‌ক্তি নির্মাণ করেছেন। এখানেও কবি একজন স্বজন বা অনুজের উদ্দেশে তাঁর আকুতি ব্যক্ত করেছেন। আসলে কবি তাঁর নির্মিত আধুনিক কবিতা বলতে শুধু নগরজীবনের কথকতাকে বোঝাতে চাননি। তিনি মনে করতেন, শেকড়ের কাছাকাছি না থেকে শুধু নগরকেন্দ্রিক জীবন-ভাষ্য নির্মাণে আধুনিক কবিতার অঙ্গনকে সীমায়িত[১] করা হয়, তাই তিনি আবহমান বাংলার কাছাকাছি ফিরতে চেয়েছেন কবিতার মধ্য দিয়ে। সুতরাং জীবিকার তাগিদ অথবা শিক্ষার অর্জনের মানসে যদি কেউ গৃহত্যাগ করতে চায়, তবুও যেন সে শিশিরের পরশ, ধানের শীষের সবুজাভ ছোঁয়া, ভোরের রোদ পোহাতে পোহাতে যায়। উদ্দিষ্ট স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কেউ যেন নিজের স্বকীয়তা ভুলে না যায়, তেমন সতর্কবাণীও কবি উচ্চারণ করেন 'সব স্বপ্ন বেচে দিয়ে দুঃস্বপ্ন কিনবিনে' বলার মধ্য দিয়ে। এভাবে 'বিষয়ের আড়ালে এক নতুন আঙ্গিকের জন্ম দেন তিনি। ইতিহাসের সাথে যুক্ত হয় সময় আর পৌরাণিক আবহ। নতুন অর্থারোপে হয়ে ওঠে আরো তাৎপর্যময়। খুব সচেতন এবং সমাজ পরিবর্তনের

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারে ঋদ্ধ থেকেও আহসান হাবীব যথেষ্ট রকম নির্বিকার। নিশ্চিত, শিল্পের বোধ এবং সৃষ্টির রোমান্টিক ভাবনার ঐশ্বর্যের দ্যোতনা থেকে কবি এটা করেছেন।[২০] কেননা, সত্তরের দশকের শেষপাদে দেশ যখন নব্য স্বৈরাশাসকের কবলে, তখন শাসনকাঠামোর সর্বস্তরে নতুন নতুন পরিবর্তনের দরুন নবপ্রজন্মের মধ্যে একধরনের উন্নাসিকতা সৃষ্টির যথেষ্ট কারণ ছিল। ইতিহাসের চাকাকে উল্টোপথে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ায় মানুষের স্বাভাবিকতা আক্রান্ত হয়েছিল কৃত্রিমতার নাগপাশ দ্বারা। আর কবি-লেখকদের মধ্যে শুরু হয়েছিল নাগরিক হওয়ার এক অস্পষ্ট প্রতিযোগিতা। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সেই প্রতিযোগিতার কারণেই গ্রামপ্রধান এই দেশে কবিরা আধুনিকও হতে চেয়েছেন সমস্ত কৃত্রিমতাকে কবিতার শরীরে জড়িয়ে—সেই গ্রাম আর গ্রামীণ ঐতিহ্য ও নিসর্গকে অবজ্ঞা করে। ওই সময় কেবল আহসান হাবীবই নতুন করে ফিরতে চেয়েছিলেন নাড়িপোঁতা মাটিতে। আধুনিক কবিতা হিসেবে, নগরের বাসিন্দা হয়েও অস্তিত্বের সন্ধান করার যে আন্তরিক প্রয়াস, সেখানেই আহসান হাবীবের শিল্পীচৈতন্যের অনন্যতা ধরা পড়ে। বিশেষ করে তিনি যখন বলেন :

যা তুই, ভোরের রোদ পোহাতে পোহাতে যা রে
যতদূর ইচ্ছে চলে যা।
পুরনো কাঁথার উম একলা প'ড়ে থাক। তুই
মার রাত্রে ঢেকে রাখা গরম উনুন ছেড়ে
ঘর থেকে নেমে
নগ্ন পা শিশিরে রাখ। চ'লে যেতে যেতে
... ...
দু'পাশে ধানের শীষে শিশির টলমল, তুই
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবি, তুই
দু'হাতে সবুজ টিয়ে ওড়াতে ওড়াতে
যা সেই নদীর ঘাটে যা
... ...
যা তুই। যাবার আগে এই বটবৃক্ষের ছায়ায়
জলের কমল ছুঁয়ে কথা দিয়ে যাবি, তুই
সব স্বপ্ন বেচে দিয়ে দুঃস্বপ্ন কিনবিনে। আর
বড় হচ্ছি ভেবে ভেবে ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে যাওয়ার আগেই
নিঃসঙ্গ হওয়ার আগেই ফিরে আসবি এই কথা দিয়ে
আশৈশব স্বপ্নের বন্দরে তুই যা। তুই
মনে রাখবি যে যায় সে ভাটার পথিক আর
ফিরে আসা মানেই জোয়ার, তবে যা!

("যাবার আগে", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

সময়ের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন না কবি। পাকিস্তানের নব্য-ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পরও যখন জনমানস প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হলো নব্য সামরিক জান্তার শাসনে পিষ্ট বাংলাদেশে, তখন কবিও মধ্যবিত্ত শ্রেণির একজন হয়ে নানামুখী টানাপোড়েনের শিকার হয়েছেন। একাত্তর-পরবর্তী সময়ে এই শ্রেণির দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। এমনকি পুঁজিপতির সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে, তাদের সংকটও তেমনি বিস্তৃত হচ্ছিল নানামুখী উপায়ে। মধ্যশ্রেণির দ্রুত প্রসারের ফলে বঞ্চিত হয় সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

একটা অংশ। অর্থাৎ সামরিক শাসনের প্রভাব হিসেবে বিত্তবানেরা আরও বিত্তশালী হতে থাকে আর বিত্তহীনেরা হয় প্রায় সর্বস্বহারা। এই শ্রেণির কাছে স্বাধীনতার অর্থ ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে শ্রেণি মাঝখানে, তাদের অবস্থা বিবেচনা করেই আহসান হাবীব রচনা করেছেন "থাকো মধ্যম সারিতে"। এই শ্রেণির সংকটটা যেমন বেশি, তেমনি সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবও এই শ্রেণির ওপর বেশি। সংকট থেকে উত্তরণের তাগিদও তাদের বেশি। আবার এই মধ্যবিত্তের ভাবনার ভেতরে থাকে একধরনের স্বনির্মিত গণ্ডি, সেদিকটা আলোকিত করতেও কবি কসুর করেননি। সমাজের এই শ্রেণিতে থেকে অন্তত স্বস্তি পাওয়া সম্ভব নয়, সে কথা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করতেও দ্বিধা করেন না যে, 'মধ্যম সারিতে থাকো'...'দগদগে ঘায়ের নীচে দেখো পোড়া মানুষের চাপ'/তুমি কোন পথে নিমন্ত্রণে যাবে?'

অতীতচারিতা, নিজেকে খোঁজার প্রয়াস, অস্তিত্বের শেকড়কে কবিতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা প্রভৃতি প্রবণতা এ কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়। তবে উপর্যুক্ত কবিতার মতো এ-কাব্যে আরো কিছু কবিতা আছে, যেখানে কবি তাঁর মননের ব্যক্তিগত সংকটকে সামষ্টিক সংকটে রূপায়িত করেছেন, যা সর্বজনীনভাবে চিরকালীন হয়ে উঠেছে। বুর্জোয়া সমাজ, শোষিত সমাজের ক্ষত, অস্তিত্বহীন মানুষের দিশেহারা দৃষ্টি তাঁর এ ধরনের কবিতার ছত্রে ছত্রে স্থান পেয়েছে। একসময়কার ভূস্বামী আর আজকের পুঁজিপতি—যাঁরা সমাজপতিও, তাঁদের মধ্যে আদতে কোনো পার্থক্য নেই। তাঁদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, সর্বস্ব হারিয়ে মানুষ শেষ আশ্রয় হিসেবে শহরে আসে উদরপূর্তির জন্য কিছু করার তাগিদে। আলেফ মুনশীর মেয়ে সখিনারা কবির কাছে সেই সব হারানোদেরই প্রতিনিধি। আর "আমি কোনো আগন্তুক নই" কবিতার জমিলার মা, খালেক নিকিরি, কদম আলী অবশ্য ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে উঠে এসে নান্দনিক সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এই কবিতাটির মধ্যে অনেকে কবির অস্তিত্বচেতনার চরম উৎকর্ষ দেখতে পেয়েছেন, কেউ তাঁর অতীতবিধূরতার চূড়ান্ত রূপ অনুসন্ধান করেছেন। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, এই কবিতাটি উচ্চমার্গের একটি শিল্পিত কবিতা। এখানে কবি যেমন এই দেশের নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গেই বেড়ে ওঠা নিজের বংশপরম্পরার কথা তুলে এনেছেন, তেমনি কবিতাটির শিল্পিত বিন্যাসে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন কবি। তবে, যেহেতু আমাদের উদ্দিষ্ট আহসান হাবীবের চৈতন্যের স্বরূপ খুঁজে বের করা, তাই, পূর্বাপর জীবনযাপনের মধ্য দিয়েও কীভাবে তাঁর শিল্পচেতনা আমাদের আধুনিক কবিতার সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে, তা-ও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ "আহসান হাবীবের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য" অংশে কবি হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরুর প্রেক্ষাপট, কলকাতায় গমন, পেশা-পরিচয়ের সারসংক্ষেপ, ঢাকায় ফেরা এবং তাঁর জীবনের অন্যতম দুটি ঘটনা—রবীন্দ্রসংগীতের বিরোধিতা আর পাকিস্তানের অখণ্ডতা চেয়ে বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান, যার জন্য কবি নিজে মোটেও দায়ী নন, সেই রকম আরো কিছু তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। "আমি কোনো আগন্তুক নই" কবিতাটির নাম দেখেই যেমন আঁচ করা সম্ভব, তেমনি বাস্তবেও এই নামের পেছনে কোনো গূঢ় রহস্য আছে কি না, সেটিও সচেতন পাঠকমাত্রকেই এত দিন ভাবিয়েছে। একটু ভাবলে বা অনুসন্ধিৎসু মনোযোগ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে এই কাব্যে নানা শিরোনামের কবিতা আছে। তার মধ্যে তীব্র শ্লেষাত্মক কবিতা, রাজনৈতিক উদ্দীপনামূলক কবিতা, অস্তিত্ব-সন্ধানী কবিতা, ভবিষ্যৎপ্রজন্মকে উজ্জীবিত করার মতো কবিতা ছাড়াও আছে তৎকালীন দেশীয় প্রেক্ষাপটে পৌরাণিক কাহিনী বা চরিত্রের পরিণতি নিয়ে রচিত কবিতা। এমনকি এ গ্রন্থে প্রথম পুরুষ ব্যবহার করে—"সারা দিন আমি", "আমি আছি", "আমি তখন" প্রভৃতি কবিতা থাকলেও এগুলোতে কবির আমিত্বের বিভিন্ন সময়ের অবস্থান বা স্বপ্নের কথা অর্থাৎ এসব কবিতায় পরোক্ষভাবে কবি

Dhaka University Institutional Repository
নিজেকেই নানা অবস্থান থেকে তুলে ধরার প্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু"আমি কোনো আগন্তুক নই" কবিতার মতো এভাবে প্রথম পুরুষ ব্যবহার করে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করার বলিষ্ঠ ও আত্মবিশ্বাসী প্রয়াস এগুলোতে যেমন নেই, তেমনি নিজের স্বজনদের কথা এত আবেগী ভাষায় বলার চেষ্টাও আর কোনো কবিতাতে লক্ষ করা যায় না। কবিতাটি পড়ে মনে হয় যেন একধরনের অদৃশ্য উত্তাপ অনুভব করছেন কবি। যা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ না করলে অনেক কিছুই যেন বলা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তাহলে কি কবি কোনো সংকটে পড়ে এমন কবিতা লিখেছেন? এই আমিত্ব দিয়ে অনেক প্রশ্নের জবাব দেওয়ারই যেন একটা প্রয়াস আছে কবিতায়। কবি যেন সংকটাপন্ন আমিত্বকে সংকট থেকে মুক্ত করার জন্য শৈল্পিক উপায় হিসেবে "আমি কোনো আগন্তুক নই" কবিতাটি নির্মাণ করেছেন। কবিতাটিতে ঘোষণা করা হচ্ছে যে কবি আজন্ম এ দেশের আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষ, সবাই তাঁকে আপন করে নিয়েছেন, যদিও তিনি কবি হওয়ার তীব্র বাসনা নিয়ে কিশোর বয়স থেকে পূর্ণ যৌবনকাল (১৯৩৬-১৯৫০) পর্যন্ত কলকাতায় বাস করেছেন। তাই বলে তো মাটির সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়নি। কলকাতায় থাকা অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে যেমন কবি-কমিউনিস্ট সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠতা, তেমনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগে পূর্ববঙ্গ পুলিশের তালিকাভুক্ত আসামি (১৯৪৯) সরদার ফজলুল করিমের[২১] মতো ব্যক্তিও আশ্রয় নিয়েছিলেন কবির কাছে। আবার ১৯৪৮ সালে যখন প্রথম বাংলা ভাষা নিয়ে বিতর্ক উসকে দেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, তখনই ভাষা-সংস্কৃতির উপযোগিতা অক্ষুণ্ন রাখতে এবং তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে পূর্ববঙ্গ থেকে কয়েকজন লেখককে আহসান হাবীব ওই বিষয়ে লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। তাঁদের মধ্যে সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক আবদুল হক (১৯১৮-৯৭) একজন। আহসান হাবীব তাঁর সম্পাদিত 'ইত্তেহাদের' সাহিত্যপাতা 'সাহিত্য মজলিসে' লিখতে আবদুল হককে অনুপ্রাণিত[২২] করেন। একজন সাংবাদিক-কবি হিসেবে, এ দেশের সন্তান হিসেবে তিনি সব সময়ই সবার সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। তাই তরুণ সম্ভাবনাময় লেখকদের দূর থেকেই দিয়ে গেছেন আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা।

অথচ বন্দুকের নলের মুখে যে দুটি ঘটনার শিকার হয়েছিলেন আহসান হাবীব, তাকে পুঁজি করে দেশের প্রগতিশীল সাহিত্যিকদেরই একটি অংশ তাঁকে রবীন্দ্রবিরোধী এবং স্বাধীনতা-বিরোধী বলে আড়ালে-আবডালে তাঁকে অবজ্ঞা করতে থাকে। তিনি যে রবীন্দ্রবিরোধী নন, তিনি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে "বাইশে শ্রাবণ" কবিতার শরীরের প্রতিটি শব্দে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন বলেই বলতে পারেন, পৃথিবীতে অনেক বাইশে শ্রাবণ এসেছে, কোনোটিকে মানুষ অমলিন করে রাখার প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু শুধু ওই একটি নামের কারণে, একটি মৃত্যুর কারণে বাইশে শ্রাবণ থাকবে 'পৃথিবীতে অক্ষয় স্বাক্ষর' হয়ে। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লেখা।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি-ভালোবাসা না থাকলে তাঁর মৃত্যুর পরপরই কারো পক্ষে এমন কবিতা লেখা সম্ভব নয়। এ ছাড়াও উত্তরকালে রচিত *আশায় বসতি* কাব্যটি হয়ত রবীন্দ্র-জন্মদিবস উপলক্ষেই প্রকাশিত। কারণ কাব্যটির মুখবন্ধে এর প্রকাশকাল 'ঢাকা-২৫ শে বৈশাখ, ১৩৮১' উল্লেখ করেছেন কবি। যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধার স্মারক-চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অথচ ওই সময়ে তাঁর পরিচিত কোনো কোনো লেখক তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে রবীন্দ্র-বিরোধিতার অভিযোগ এনেছিলেন। সংগতকারণে আহসান হাবীব সংক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত ক্ষোভ হতাশার কথা তিনি খুব ঘনিষ্ঠ দু-একজন ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ করতেন না। তাই কবিতাকেই তিনি

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ক্ষোভ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে শিশুসাহিত্যিক আখতার হুসেনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তিনি জানান :

> ১৯৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করার পক্ষে সরকার কিছু স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। যাঁদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়, তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন পাকিস্তান সরকারের চাকুরে। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন, যাঁরা আসলেই রবীন্দ্রবিরোধী। আবার কেউ সরকারি চাকরি করার সুবাদে বাধ্য হয়েই স্বাক্ষর করেন। *দৈনিক পাকিস্তান*-এ চাকরি করার কারণে আহসান হাবীবের ওপর ছিল প্রচণ্ড চাপ। শুধু চাকরি বাঁচাতে তিনি সেখানে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা চেয়ে সরকারের একটি সাজানো বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিলেন আহসান হাবীব। কিন্তু স্বাধীনতার পর 'দৈনিক পাকিস্তান' যখন 'দৈনিক বাংলা' নাম নিয়ে প্রকাশ শুরু করে, তখন এ দেশেরই পঞ্চাশের দশকের কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক—যাঁদের কেউ কেউ ছিলেন ওই পত্রিকায় তাঁর সহকর্মী এবং নেপথ্যে আরো কয়েকজন আহসান হাবীবকে নানাভাবে রবীন্দ্রবিরোধী ও পাকিস্তানপন্থী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। সেই কারণে, তাঁদের জবাব দেওয়ার জন্যই আহসান হাবীব "আমি কোনো আগন্তুক নই" কবিতাটি লেখেন এবং সেটি পাঠ করেন ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত একটি কবিতাপাঠের আসরে—যদিও কবিতাটি '৮০ সালে প্রকাশিত কবিতার বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে আমি নিজেও একটা কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম। এই কবিতার মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি বিচ্ছিন্ন কেউ নন এবং এমনকি আগন্তুকজাতীয় কেউ নন। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এ দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রথম সারির অথবা নেতৃস্থানীয় অনেকের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। এ কথাও অনেকেরই জানা যে যখন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল, তখন তাঁর কলকাতার ডেরা এবং সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালেও তাঁর আবাসস্থল অনেক আত্মগোপনকারী নেতার যোগাযোগস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি নিজে কখনো এসব কথা কাউকে বলেননি গোপনীয়তা রক্ষা করার স্বার্থে। তবে তাঁর খুব কাছের কেউ কেউ সেসব খবর জানতেন। তাঁদেরই একজন সরদার ফজলুল করিম। তিনি ওই সময় কলকাতায় গিয়ে কবির বাসায় আশ্রয়ও নিয়েছিলেন। তবে আহসান হাবীব ওই কবিতার মধ্য দিয়ে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, পাকিস্তানের পক্ষে যে বিবৃতিটি তিনি দিয়েছিলেন, তার ভেতর দিয়ে মোটেও তাঁর আসল রূপ প্রকাশিত নয়। তিনি তাঁর কাজে-কর্মে ছিলেন প্রকৃত প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার অধিকারী। তাঁর সমগ্র কাব্য-কৃতিই এর উজ্জ্বল উদাহরণ। আর সে কারণেই তিনি বলেছেন, আমি কোনো আগন্তুক নই।[২৩]

আসলে এই কবিতায় তাঁর এ-কাব্যের অন্যান্য কবিতার মতো অতীতবিধূরতার প্রাবল্য লক্ষ করা গেলেও এর তাৎপর্য কবির জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত। এই কবিতাটির প্রকাশকাল দেখে আমরা ধরে নিতেই পারি যে, এ কাব্যের কবিতাগুলোর মনোভূমি অনেক আগে থেকেই তৈরির হচ্ছিল দেশাত্মবোধে অবিচ্ছিন্ন কবিসত্তার মধ্য দিয়ে।

"আমি কোনো আগন্তুক নই" কবিতায় উল্লিখিত 'জমিলার মার শুকনো থালা' আর 'অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলী', 'নিশিন্দার ছায়া' আর 'কার্তিকের ধানের মঞ্জরি' কবির 'অন্তর থেকে আহরি বচন'। অন্য সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও কবির অস্তিত্ব বাংলা মায়ের আদি অবস্থান থেকে দূরে সরে যেতে পারে না। তাই তিনি বলেন :

অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলী
তার ক্লান্ত চোখের আঁধার
আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন। আমি
জমিলার মা'র
শূন্য খা খা রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি

Dhaka University Institutional Repository

সে আমাকে চেনে।

আমাকে বিশ্বাস করো, আমি কোনো আগন্তুক নই।

দু'পাশে ধানের ক্ষেত
সরু পথ
সামনে ধু ধু নদীর কিনার
আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি এই উধাও নদীর
মুগ্ধ এক অবোধ বালক।

("আমি কোনো আগন্তুক নই", *দু'পাশে দুই আদিম পাথর*)

এ কাব্য কবির অত্যন্ত পরিণত সৃষ্টি। আহমদ রফিক *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্য সম্পর্কে বলেছেন :

> ...সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর' গ্রন্থের কবিতাগুচ্ছ। এখানে কবি সময়কে অতিক্রম করে 'শাদা ভাতের উষ্ণতা আর সৌরভ' নিয়ে তার 'চিরচেনা স্বজন'দের কাছে পৌঁছে গেছেন। এমন কি ঐতিহ্যবাহী নিরঞ্জনা নদী তখন আর দৃষ্টিসীমার বাইরে নয়। বঞ্চিত, নিরন্ন জীবনের প্রতি ভালোবাসর টানে বৈঠায় বা লাঙলে হাত রেখে স্বদেশের চিরকালীন মাটিতে শিকড় চালিয়ে এক মহৎ আত্ম-আবিষ্কারের কাজ সম্পন্ন হয় এই ঘোষণায় যে, 'আমি কোনো আগন্তুক নই?' কবি যে এ মাটির চিরকালীন সন্তান এমন প্রত্যয় এ সময়কার বিভিন্ন কবিতায় প্রতিফলিত। দুই হাতের আদিম পাথর প্রাচীন জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতায় কর্মনিষ্ঠ সংগ্রামী জীবনের প্রতীক, যে-জীবনের আদিম ছায়া এখনও এদেশের গ্রামান্তরে জেগে আছে। এখানে কৃষি-জৈবনিক গ্রামবাংলার সমকালীন অস্তিত্বের পাশাপাশি শ্রমনির্ভর পাথুরে যুগের জীবন সংগ্রামের ঐতিহ্য প্রতিফলিত। তাই ধানের মঞ্জরীর পাশে অকাল-বার্ধক্যে নত কদম আলীর ক্লান্ত চোখের অন্ধকার যেমন সত্য, তেমনি সত্য জমিলার মার শূন্য খা খা রান্নাঘরে শুকনো থালার অস্তিত্ব। এখানে শ্রেণীচেতনার পরিবর্তে কালচেতনাই সমাজচেতনার প্রকাশ সম্পূর্ণ করেছে।[২৪]

মূলত *দু'হাতে দুই হাতে আদিম পাথর* সকল শিকড়সন্ধানী মানুষের জন্য উৎসাহের, একই সঙ্গে শিক্ষারও। কেননা, ঐতিহ্যগুলো ঠিকই আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে আছে আমাদের অস্তিত্বের স্বাক্ষর হয়ে। কবি সে কথা অনেক যত্ন নিয়ে এ কাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

পাঁচ

সামাজিক বাস্তবতা ও মানবদরদি কবি আহসান হাবীবের সপ্তম কাব্যগ্রন্থের নাম *প্রেমের কবিতা*। প্রেমের বিশালত্বের অধীন থেকেই সৃষ্টিশীল হন প্রত্যেক মানুষ। কবিদের সৃষ্টি-অঞ্চলের বড় অংশজুড়েই থাকে সেই 'মানুষ'। প্রেম বলতে মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ ও নিসর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপকেই বোঝায়। তার মধ্যে থাকে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, নিসর্গপ্রেম প্রভৃতি। সেই অখণ্ড প্রেমাঞ্চলে নর-নারী বা মানব-মানবীর প্রেম তার খণ্ডাংশের অন্তর্ভূত। তবে সাধারণ জনচিত্তে এর অবস্থান অনেক উঁচুতে। আহসান হাবীবের এই *প্রেমের কবিতা* জনমানসের সেই কাঙ্ক্ষিত নর-নারীর প্রেমবিষয়ক খণ্ড খণ্ড স্মৃতির মমন্বয়ে নির্মিত। প্রথম কাব্যগন্থ থেকে শুরু করে পরবর্তী কাব্যগুলোতে যে তাঁর ধারাবাহিক বিকাশ এবং রূপান্তর আমরা লক্ষ করি, তেমন কোনো ধারা দিয়ে নির্দিষ্ট করা যাবে না এই কাব্যকে। কবিজীবনের পরিণত বয়সে এসে এ কাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর যে সবিনয় প্রকাশ, তা অন্যান্য কবিতারই সমানবয়সী। তবে সেগুলো আলাদা কাব্যের অবয়বে প্রকাশের জন্য হয়তো কবি সংরক্ষণ করেছিলেন। এখানে প্রাক্-কবিজীবন সময়ের স্মৃতি যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি রয়েছে কর্মজীবন ও জীবনযুদ্ধের বিভিন্ন পর্বে

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমাঙ্কিত ঘটনাপরাম্পরার শিল্পিত স্বীকারোক্তি। কবি কোনো ছলনার আশ্রয় নেননি তাঁর প্রেমের কবিতার বিষয়বস্তু নির্মাণ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব নারী তাঁকে আলোড়িত করেছিলেন কিংবা মনে প্রেমানুভূতি জাগিয়েছিলেন অথবা প্রেমিক-মনকে জীবনের অগ্রযাত্রায় প্রেরণা হিসেবে সাবলীল করে তুলেছিলেন—কবি অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁদের অবদান বা সান্নিধ্যের কথা। কবি হওয়া সত্ত্বেও একজন সৎ ব্যক্তিমানুষের পক্ষেই কেবল সম্ভব সংসারযাত্রার প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে এমন স্পষ্টভাষী হওয়া। কেননা, তিনি এ কাব্যের উৎসর্গপত্রে যাঁদের নাম লিখেছেন কারো নাম উচ্চারণ না করার ভঙ্গিতে, তাঁরা সবাই কোনো-না-কোনোভাবে কবির সান্নিধ্যে এসেছিলেন কিংবা কবিই পেয়েছিলেন তাঁদের নৈকট্য। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী কবির রূপ-গুণের কারণেও যে অনেকে তাঁর কাছে আসতে চাইতেন, তা-ও অমূলক নয়। শামসুর রাহমানের ভাষায়, 'মাথাভর্তি কালো চুল, পাকা গমের মতো গায়ের রঙ, রীতিমতো সুদর্শন'[২৫] মানুষটিকে দেখে যে কোনো নারীর পক্ষে আকৃষ্ট হওয়া খুবই সম্ভব। এক্ষেত্রে তাঁর উৎসর্গপত্রই আমাদের কাছে প্রধান অবলম্বন। বোঝা যায়, কলকাতার যাপিত জীবনে বিভিন্ন পত্রিকা আর কলকাতা বেতারে কাজের সুবাদে এবং বিভিন্ন এলাকায় বসবাসের কারণে অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁর। তাঁদের প্রায় সবারই নাম উল্লেখপূর্বক তিনি তাঁদের নামে কাব্য উৎসর্গ করতে চেয়েছেন। আবার হয়তো নামই জানা হয়নি, কিশোরবেলায় কোনো গ্রাম্যবালিকা কবিকে মুগ্ধ করেছিল—বয়সী লাজুকতার কারণে হয়তো পরিচয়পর্বও সম্পন্ন হয়নি কিংবা প্রয়োজনও পড়েনি। কিন্তু মনের ভেতর সেই ছবিটি যে কবির পরিণত বয়সেও দোলা দিয়েছে। সেসব তখন অতীত। কিন্তু সংসারজীবনেও কবির রূপ-গুণের মুগ্ধতায় অনেকেই কাছে এসেছেন।[২৬]

উল্লেখিত নারীদের মধ্যে একজনকে সম্বোধন করে আরও অনেকের প্রসঙ্গ এনে সবাইকে উৎসর্গপত্রে প্রায় এক নিশ্বাসে শ্রদ্ধা জানানোর এই কৌশলটি বিরল। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই প্রেম আসে, আসতে থাকে আজীবন। এর কোনোটি প্রকাশ্য, কোনোটি অপ্রকাশ্য। অন্তত প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে আহসান হাবীবের কবিস্বভাবের স্বরূপ ধরা পড়ে তাঁর লেখা দুটি উৎসর্গপত্রেই। আমাদের প্রধান অবলম্বন কবির অবস্থান স্পষ্টকারী সেই উৎসর্গপত্রই। এ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গপত্রে কবির বক্তব্য প্রথম প্রকাশের উৎসর্গপত্রের চেয়ে বেশি স্পষ্ট ও চৌকস মনে হয় :

> প্রেমের স্বভাবে আছে একজন যাযাবরের বাস এবং এই সত্যটি আমরা প্রায়শ অস্বীকার করি।...'তুমিই জীবন তুমিই মরণ।' ঘোষণা করে একদিকে একজনের সামনে নতজানু যখন, তখনো কখনো কখনো দু-কাঁধের পাশ ঘেঁষে 'পাখির নীড়ের মতো' দুটি চোখ জ্বলতে-নিভতে দেখা যায়। আসলে অতীতকে আমরা কখনো মুছে ফেলি না এবং তার পরেও সারা জীবনই সময়ে অসময়ে প্রেমে পড়ি আর একজনকে না একজনকে সারা জীবনই ভোলাতে থাকি।
>
> এ কথা তাই শপথ করে বলা যাবে না যে, আমার সবগুলো প্রেমের কবিতারই উৎস বা প্রেরণা একজনই। এবং এ কারণেই বিচিত্র দুর্লভ কতগুলো সকাল-দুপুর-বিকেলকে পূর্ণাঙ্গ এক জীবনের মতো করে গাঁথতে চেয়েছিলাম প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্রে।...মনে পড়তে থাকে কৈশোরের জোবেদা, নূরজাহান, রমলার কথা। একটি কবিতার উৎস কৈশোরের এক অপরাহ্নে (sic) দেখা সরুচেন জড়ানো মোটা বেণীর নীচে শ্যামলা একটি ঘাড়ের কথা। কলেজের পথে নির্বাক নিত্যসঙ্গী নাম না জানা শ্যামাঙ্গিনীর কথাও মনে পড়ে। আমার স্ত্রীর প্রসঙ্গও এসে যায় এবং আরো কিছু প্রসঙ্গ আসবার আগেই উৎসর্গ-পত্রটি প্রত্যাহার করে নেয়ার একটা কৌশল প্রয়োগ করি এই বলে যে,...'আসলে কি জানেন?' এই উৎসর্গ-ফুৎসর্গের ব্যাপারে আমার আসাই উচিত হয়নি।'
>
> উৎস যখন এক নয় আর 'কার প্রাপ্য কাকে দিই' এই যখন ভাবনা, তখন থাক না এ বই সেই নাম করা আর নাম না করা সকলের জন্যেই।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

কারো প্রতি পক্ষপাত নেই। প্রায় চার দশক বাংলা কবিতার মহাসড়কে সক্রিয় থাকার পর সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি ভিন্ন ধাঁচের কবিতাগ্রন্থ *প্রেমের কবিতা* (১৯৮১) প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতার গড়ে ওঠা এবং বেড়ে ওঠা—দুটোই হয়েছিল মূলত বাংলার মাটি ও মানুষকে ঘিরে। সমাজ-সভ্যতা-ইতিহাসের অগ্রযাত্রায় সবই কবি আত্মস্থ করে সাজিয়েছেন শিল্পিত আধারে। অথচ এ-কাব্যে আমরা দেখি, এক বিন্দুতে মিলিত তাঁর আবেগ। যদিও তা দ্বিধায় অস্থির, তবুও প্রেমের প্রয়াসে কবি চিরন্তন চাঞ্চল্যকে ঠাঁই দিয়ে প্রেমে-ভালোবাসায় সবাইকে সিক্ত করতে চেয়েছেন। আসলে একটি বিন্দু থেকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর চাওয়া-পাওয়ার নিজস্ব ভুবন নির্মিত হয়েছে এই *প্রেমের কবিতাকে* ঘিরে। প্রেমিক আর প্রেমাস্পদের মধ্যে সব সময়ই চলে পাওয়া না-পাওয়ার টানাপোড়েন। তা ছাড়া প্রেমের স্বরূপই তো এমন যে, সংকটে প্রেম তীব্রভাবে অনুভূত হবে—পূর্ণতা পেলে তা হয়ে যাবে আকাঙ্ক্ষাবর্জিত। এই আকাঙ্ক্ষা আর সংকটই মানুষকে ক্রমাগত প্রেমাস্পদের দিকে ধাবিত করে। কবি সেই চিরসত্যটি অনুধাবন করেছিলেন বলেই বলতে পারেন :

তুমি ভালো না বাসলেই বুঝতে পারি ভালোবাসা আছে।
তুমি ভালো না বাসলেই ভালোবাসা জীবনের নাম
ভালোবাসা ভালোবাসা বলে
দাঁড়ালে দু'হাত পেতে
ফিরিয়ে দিলেই
বুঝতে পারি ভালোবাসা আছে।

("যে পায় সে পায়", *প্রেমের কবিতা*)

প্রেমের যে স্বরূপ নিয়ে আহসান হাবীব পাঠকের সামনে হাজির, তা যেন প্রত্যেক প্রেমিক-মনের অবয়বকে উন্মোচিত করেছে চিরায়ত কৌশলে। প্রেমের আবেগে মথিত হয়ে কেউ যে অত্যন্ত সংগোপনে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির শিকার হতে পারেন, সে আশঙ্কাও কবি করেছেন সর্বজনীনতাকে ভেতরে ধারণ করেই। জীবনযাপনে নিয়ত প্রেমের বোধ দ্বারা আপ্লুত হলেও বিরহের নীল বেদনাও তো কাউকে গ্রাস করে ফেলে। প্রেমের পরিণতি যে অনেক সময় ভয়াবহ মনোবেদনার কারণ হতে পারে, সে-কথা প্রেমিক-চৈতন্য ভুলে যায়নি। আর তাতেই প্রমাণিত হয়, তাঁর চৈতন্যজুড়ে কী নিবিড় বৈভবে ছিল ভালোবাসার স্বরূপ। তেমন শোকাহত আবহ মনে রেখেই কবি যেন নিজের অনুভূতি সর্বসত্যে রূপান্তরিত করেন এভাবে :

কেউ জানে না পৃথিবীর কোথায় কখন
কি রকম দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কে কখন বালকস্বভাবে
জ্বলন্ত পেরেক একটি তুলে নিয়ে অর্বাচীন আবেগে
নিজের বুকে বিঁধিয়ে গোলাপ গোলাপ বলে নৃত্য করে
দু'একবার তারপর থেমে যায়, তারপর জ্বলতে থাকে!
... ...
না একে রাখতে পারি বুকে
না পারি উপড়ে ফেলতে
প্রবল প্রতাপে
সারা বুকে অনবরতই অগ্নিকাণ্ড ঘটাচ্ছে অথবা

Dhaka University Institutional Repository

নিরুপায় আমিই কি বন্দী হয়ে গেছি তার মোহন আগুনে !

("কে কেমন আছে", *প্রেমের কবিতা*)

প্রকৃতপক্ষে সমাজমনস্ক কবি আহসান হাবীবের কবিতা স্বকাল, সমকাল, ইতিহাস ঘিরেই আবর্তিত হয়। কিন্তু অন্যান্য কবির মতো প্রিয় একটি বিষয়—প্রেমও এভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, তা কবির *প্রেমের কবিতা* না পড়লে পাঠকের অজানাই থেকে যেত। প্রেমের অনুষঙ্গ যে আহসান হাবীবের কবিতায় নতুন করে এসেছে, তা নয়। তাঁর প্রথম কাব্য *রাত্রিশেষ*-এও আমরা দেখেছি প্রেমের অন্য একটি স্বরূপ। তবে সেখানে প্রেমের চিত্র ছিল সামাজিক অনুষঙ্গের সহায়ক হিসেবে। এভাবে পূর্ববর্তী অন্যান্য কাব্যেও নরনারীর প্রেমের সমাহার খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু একেবারে নির্জলা প্রেমের কবিতা—খানিকটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে—ঘোষণা দিয়ে আত্মগত প্রেমাবেগ নিয়ে এর আগে তিনি কবিতা লেখেননি। তাঁর প্রায় সব কবিতাই সর্বজনীন বিষয় নিয়ে নির্মিত। আহমদ রফিক এই *প্রেমের কবিতা* সম্পর্কে বলেছেন :

> আহসান হাবীবের কবিতা যদিও সমাজ, স্বকাল ও ইতিহাস ঘিরে আবর্তিত তবু কবিদের আরেকটি প্রিয় প্রসঙ্গ প্রেমও যে তাকে স্পর্শ করে গেছে একটি ছোট্ট কবিতাগ্রন্থ ('প্রেমের কবিতা') তার প্রমাণ ধরে রেখেছে। এই কবিও আরো অনেকের মত প্রেমকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেয়েছেন। তবে মূলত ঐতিহ্যসিদ্ধ পথে। প্রেম যে সর্বদা অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারঙ্গম একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য হয়ে ওঠে বুকে জ্বলন্ত পেরেক বিঁধিয়ে নিয়ে আপাত আনন্দের যন্ত্রণায় ছুটে চলা। ঘৃণা আর ভালোবাসার ফুল হয়েও প্রেম দেহ কিংবা মনে মৃত্যুহীন এক অনন্ত যন্ত্রণা, নতুন করে পাবার জন্য হারানোই বুঝি প্রেমের বৈশিষ্ট্য। দেহের দীপাবলিতে নিবেদিত হয়েও নিঃসীম নীলিমায় যার বিচরণ তারও নাম প্রেম।
>
> প্রেম নেই, অথচ প্রেম আছে প্লাবনের মত সত্তাকে ভাসিয়ে নিতে—এমন সব নানামাত্রিক পরিচয় নিয়ে প্রেম যুগে যুগে কবি ও শিল্পীদের অধিকার করেছে। প্রেমের আনন্দ, প্রেমের বেদনা, তার পাওনা আর বঞ্চনা ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে প্রেম যে এক রহস্যময় অথচ ভয়াবহ চতুর্থমাত্রার বিষয় এই বোধ কালান্তরের। আহসান হাবীবও তার ছোট্ট 'প্রেমের কবিতা'য় প্রখর তীব্রতা নিয়ে এই বোধের শরিক হয়েছেন। প্রেমের অনুভব প্রকাশে বেশ কিছু দ্যুতিময়স্ফটিক উপহার দিয়েছেন পাঠককে।[২৮]

আহসান হাবীব যে অকৃত্রিম প্রেমিক-সত্তার অধিকারী ছিলেন, *প্রেমের কবিতা*র প্রায় সব কবিতা সে-স্বাক্ষর বহন করে চলেছে 'দ্যুতিময়স্ফটিক' হয়ে ।

ছয়

রাত্রিশেষ থেকে *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*—দীর্ঘ (১৯৪৭-১৯৮৫) এই কাব্যাভিযাত্রায় আহসান হাবীবের সক্রিয় সঙ্গী হচ্ছে সময়। মহাকালের ক্যানভাসে এই কালপরিসর খুবই সীমিত দৈর্ঘ্যের পথ। তবে মানবজীবনের ক্ষেত্রে তা গোটা একটি প্রজন্মের বিকাশ-বিস্তৃতিকে ধারণ করার জন্য যথেষ্ট। আর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই সময়পর্বটি নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় অস্থিতিশীল হওয়ায় তাঁকে দেখতে হয়েছে তিন ধরনের দেশ। এক জীবনে তিনটি দেশের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই তাঁকে অনুভব করতে হয়েছে প্রথম মহাসমরের (১৯১৪-১৯) উত্তাপ। গ্রামীণ ধূলি-হাওয়ায় শরীর-মনের সাংগঠনিক পরিচর্যা পাওয়ার আগেই, যুবা বয়সে প্রবেশের প্রাক্কালে তাঁকে দেখতে হয়েছে মানবতার বিপর্যয়কারী আরেকটি মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)। ব্রিটিশ শাসনের শেষপাদে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় বিভক্ত দুটি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক উন্মত্ততা প্রত্যক্ষ করে করে জীবনযুদ্ধ চালিয়েছেন তিনি। পরে ব্রিটিশ-চাতুরিতে ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পৃথিবীর এক 'আশ্চর্য' দেশ পাকিস্তানের অধিবাসী হতে হয়েছে তাঁকে। আর পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের হাত থেকে সহস্র প্রাণ আর আত্মত্যাগের বিনিময়ে একাত্তর সালে দেশ স্বাধীন হলে

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিপ্রিয় বাঙালির মতো কবিও তখন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় কবির বদল ঘটেছে সৃজন-মননের। কবিতার ভাষা, শব্দের গাঁথুনি, কবিতা বয়নের রীতি-পদ্ধতি সবই ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত হয়নি কেবল স্বভাবের ও কণ্ঠের। কেননা, তাঁর স্বর চিরকালই ছিল স্বকীয় চেতনায় ভাস্বর, মৌলিকতায় উচ্চকিত।

স্বাধীনতার পরপরই 'স্বপ্ননায়কের' নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর দেশ পতিত হয় গভীর অন্ধকারে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার করাল গ্রাসের মতো এই স্বাধীন দেশের ললাটেও পরপর দু-বার নেমে আসে দেশীয় উর্দিধারীদের ছোবল। যেন মুক্ত দেশের শাসনতন্ত্র শুধু হাতবদল হয় আরেক সামরিক জান্তার হাতে। কবি ওই সব ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এসবের মধ্যেও যেহেতু কবিকে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে, চর্চা করে যেতে হয়েছে কবিতার, তাই সমাজমনস্ক কবি হিসেবে তাঁর কবিতায় তার ছাপ থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সর্বশেষ কাব্য প্রকাশকালে কবি শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলেন না। তবে কবিতার মধ্য দিয়ে বরাবরের মতোই স্বপ্নের কথা বলে গেছেন তিনি—তুলে ধরেছেন সময়সাপেক্ষ নানা টানাপোড়েনের কথা। কবিতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থাকতে চেয়েছেন তিনি সময়ের সঙ্গে। কারণ কবি মনে করতেন, পাঠক যেন সময়ের আধুনিক মেজাজকেই আহসান হাবীবের কবিতায় খুঁজে পান। তাই যেসব পাঠক কবির এই পরিবর্তনকে ভালোভাবে নিতে পারেননি, তাঁদের উদ্দেশে কবি বলেছেন, 'আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, সময়ের এই ঔদ্ধত্যের কাছে আমি হার মানতে চাই না কখনো।'[২৯]

আহসান হাবীব কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিচিত্রগামী হওয়ায় তাঁকে কেবল মধ্যবিত্ত জীবনের কবি হিসেবে আখ্যা দিয়ে সীমায়িত করা যায় না। বরং বিষয়ের বিচিত্রাগামিতার দরুন তাঁর কবিতা অন্যান্য জীবনেরও স্বাক্ষর বহন করে। তবে তাঁর প্রধান জায়গা মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবেই, তাতে সংশয় নেই। কাব্যবিচরণের ক্ষেত্র আর মানসচৈতন্যের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর আসল জায়গার কথা তিনি বলে গেছেন কবিজীবনের চৈতন্য-নিরূপক কিংবা সংক্ষিপ্ত শিল্পভাষ্য, *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* কাব্যের শুরুতে—সেই "পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ" অংশে। তিনি বলেছেন, 'শ্রেণী বৈষম্যের অভিশাপ, মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা এবং উদ্ভ্রান্ত উদ্বাস্তু যৌবনের যন্ত্রণা এই সবই আজো পর্যন্ত আমার কবিতার বিষয়বস্তু। এক শ্রেণীর মানুষের কৃত্রিম জীবন তৃষ্ণা তাদের নীচ জীবনাচরণের প্রতি ব্যঙ্গবাণ—এই সব।'[৩০] তবে শুরু থেকেই তাঁর যে সমাজচৈতন্য, তা রাজনীতির পথ ধরে আসেনি। এসেছে পারিপার্শ্বিক জীবনাচরণ আর ব্যাপ্ত জনস্থলির সঙ্গে একাত্মতার উৎকাঙ্ক্ষা থেকে এবং তার সংবেদনার পরিপ্রেক্ষণীরূপে। এ কাব্যেও এমন দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। শান্তিময় এক দেশের স্বপ্ন দেখতেন কবি। আর তা কীভাবে লালিত হলে ষড়ঋতুর এই দেশে আরেকটি ঋতুর জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়, সেটি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে "এই ব্যাপ্ত জনপদ, আমি তাকে" কবিতায় :

আমি তাকে সপ্তম ঋতুর ফুল
ফলের বাগান দেবো
আমি তার আঁধার উনুনে নীল কোমল গভীর
আগুন সাজিয়ে দেবো, তাকে
দরজাগুলো খুলে রাখতে বলো
... ...
আমি তার প্রচণ্ড খরায় তার বুক থেকে
তৃষ্ণা তুলে নোবো।

Dhaka University Institutional Repository

তুমূল বর্ষায় তার ভাসমানতার ক্লান্তি
তুলে নেবো বুকে
সপ্তম ঋতুর ঋদ্ধ পাটাতন দেবো তাকে
... ...
আমি তার মাটিতে দেবো
সপ্তম ঋতুর ফুল, সোনালি ফসল।

("এই ব্যাপ্ত জনপদ, আমি তাকে" *বিদীর্ণ দর্পণে বুক*)

কবি আহসান হাবীবের কালের একমাত্র জীবিত সহযাত্রী—আবুল হোসেন, যিনি চল্লিশের দশকেই কাব্যযাত্রা শুরু করেছিলেন, তিনি আহসান হাবীবের শিল্পীচৈতন্য মূল্যায়ন করেছেন এভাবে, 'আশা না হারিয়েও, একদিকে সমসাময়িক জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা যেমন তাঁকে পীড়া দিয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে তাঁর বিচ্ছিন্নতা, ক্লান্তি ও বিশ্বাসহীনতা তাঁকে বিষণ্নতায় ছেয়ে ফেলে। এই দোটানার মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে আহসান হাবীবের জীবন ও কবিতা।'[৩১] এ মূল্যায়ন প্রাথমিক পর্বের আহসান হাবীব সম্পর্কে যতটুকু প্রাসঙ্গিক, উত্তরপর্বের কবি প্রসঙ্গে ততটুকু যৌক্তিক নয়।

পরিপার্শ্বের ঘটনাবলির প্রভাবে তাঁর আত্মসত্তা গভীর সংকট ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে সত্য, তবু নানা সংকট থেকে জন্ম নেওয়া বিচ্ছিন্নতা আর আত্মকেন্দ্রিকতা অতিক্রম করেছেন তিনি। তাঁর অন্তর্মুখিতাকে আত্মকেন্দ্রিকতার পরিচায়ক বলে ভুল করেছেন অনেকে। শেষ অবধি তিনি তাঁর অন্তর্মুখী অবস্থান থেকেই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন 'ভালোবাসা' নামক আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠতে। যেমন :

আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও
সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি
সেই অমোঘ অনন্য অস্ত্র
আমাকে ফিরিয়ে দাও।
... ...
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
অরণ্য হবে আরো সবুজ
নদী আরো কল্লোলিত
পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে।
... ...
সেই অমোঘ অস্ত্র—ভালোবাসা
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।

("সেই অস্ত্র", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

কেউ কেউ ব্যক্তিজীবনের সংকট থেকে উৎসারিত বিষণ্নতাকে পরিহাসের দৃষ্টিতে দেখলেও আহসান হাবীব একে কাব্যে রূপান্তরিত করে সর্বজনীন করে তুলেছেন। কারণ তিনি জানতেন, আধুনিক যুগ, জটিল সময়ের যুগ। মানুষ স্বসৃষ্ট জটিলতা দ্বারা নিজেই উপর্যুপরি আক্রান্ত হয়। তিনি পারিপার্শ্বিক এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যার অম্ল-মধুর তিক্ততা দিয়ে নিজের শিল্পীচৈতন্যকে শানিত করতেও পেরেছিলেন। নিজের ভেতরে কতটা ভাঙচুর সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁকে 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল, তা এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতার শরীরে প্রতিফলিত হয়ে আছে। বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি যখন বলেন যে একজন সচেতন গৃহস্থের গৃহের 'চাবি চলে যায় তস্করের হাতে', তখন 'উল্টাপাল্টা' অনেক কিছু ভাববার অবকাশের সৃষ্টি হয়। এতসব ছিন্নভিন্ন আর ভাঙচুরের পরও মানুষের প্রতি কবির গভীর বিশ্বাস ছিল। কেননা, তিনি তো ভালোভাবেই জানতেন যে একাকী কোনো বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তাই তিক্ত অভিজ্ঞতায় রিক্ত কবির এ-কাব্যের কবিতায় জনসাধারণের প্রতি মাঝেমধ্যে আস্থা হারানোর ইঙ্গিত ব্যক্ত হলেও আবার সবাই মিলে অন্য পথ খুঁজে নেওয়ার সংকেত দিয়েছেন। "এইখানে নিরঞ্জনা" কবিতায় অন্তত তেমন বার্তাই আমরা পাই। এখানে হারানো বিশ্বাস ফিরে পেতে চেয়েছেন তিনি নিজের গড়া ভুবনের চারপাশে :

এইখানে নিরঞ্জনা নদী ছিলো
এই ঘাটে হাজার গৌতম
স্নান করে শুদ্ধ হয়েছেন।
নদী আছে ঘাট আছে
সেই শুদ্ধ জলের অভাব।
অশুদ্ধ মানুষ খুব বেড়ে গেছে
সারিবদ্ধ স্নানার্থী মানুষ
মরা নদী স্রোত ছাড়িয়ে এখন—
বলে দাও যেতে হবে অন্য কোনো নিরঞ্জনা নদীর সন্ধানে।

("এইখানে নিরঞ্জনা", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

আসলে যে বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ড অর্জিত হলেও সামরিক শাসনের করাল গ্রাসের ফলে তার অন্যান্য কাঠামো ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল স্বয়ং রাষ্ট্রযন্ত্র। কবি তাই বাধ্য হয়েই অন্য কিছু, অন্য কোনো স্বপ্ন, মুক্তির জন্য অন্য কোনো পথের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এই 'নিরঞ্জনা নদী' সন্ধান করার মধ্য দিয়ে। আমরা জানি, আশির দশকের শুরুতে বাঙালি জাতি এক স্বৈরশাসকের পতনের পর আরেক স্বৈরশাসকের হাতের ক্রীড়নক বনে যায়। সাধারণ সচেতন মানুষমাত্রই সেই ধারাবাহিকতাকে মেনে নিতে পারেনি। কবি ষাটোর্ধ্ব বয়সে, বলা যায়, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো সেই অশনিসংকেতের ভয়াবহতা টের পেয়েছিলেন। এ অবস্থায় আহমদ রফিকের বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক :

> বিদীর্ণ দর্পণে ফুটে-ওঠা খণ্ড খণ্ড ছবির মধ্যে কবি তার 'স্বজন'দের শ্রমক্লান্ত বিষণ্ন মুখ প্রত্যক্ষ করেন বলেই বোধ হয় সত্তার গভীরে অগ্নুৎপাত (sic) ঘটে। মধ্য-আশিতে পৌঁছে চলে যাবার প্রাক্কালেও 'একটি নন্দিত সকালের স্বপ্ন' তাকে আলোড়িত করে। 'স্বজন'দের জন্য একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ ভুবনের স্বপ্নই এ সময় আহসান হাবীবের কবিতায় প্রাণময় হয়ে উঠেছে। ফিরে ফিরে একটি স্বপ্নের কথাই উচ্চারিত। সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখে যাবার অভিলাষই তার গোটা কাব্যিক শ্রমের একমাত্র অভিলাষ বলে আমার মনে হয়েছে। ব্যক্তিগত আলাপে যতটা জেনেছি, তার কবিতার চরিত্রে তার চেয়েও বেশি প্রকট সেই দ্রোহ, সেই দাহ–অশ্বিষ্টকে পাবার উৎকণ্ঠা প্রতীক্ষা আর তাকে কাছে না-পাবার গভীরতর বেদনা।
>
> অবশেষে 'নিরঞ্জনা নদী'র উৎসের দিকে ফেরার স্বপ্ন কি কবিকে সান্ত্বনা যোগাতে পেরেছিল, কিংবা 'ভালবাসা নামক সেই অমোঘ অস্ত্র' যার সাহায্যে সব কিছু জয়ের সম্ভাবনায় আস্থা রেখেছিলেন ? যে-ভালোবাসা ব্যক্তি থেকে নিসর্গের প্রতিনিধিদেরও বাঁচার আশ্বাস দিতে পারে, যে-ভালোবাসা জীবনযোদ্ধা মানুষমাত্রের অক্লান্ত শ্রমের মর্যাদায় বিশ্বাসী এবং যে-ভালোবাসা সব ধরনের জাত্যাভিমান (sic) ও আধিপত্যবাদের বিরোধিতায় সংকল্পবদ্ধ, সেই ভালোবাসাকে সমাজ ও সভ্যতার রক্ষক হিসাবে গ্রহণ করে কবি মানবিক চেতনা ও বিশ্ববোধের প্রতিভূ হয়ে উঠেন ('সেই অস্ত্র')। বাস্তব ভূমিতে সংগ্রামের ব্যর্থতার জন্যই কি এই বিকল্প সন্ধান ?[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

হয়তো সেই বিকল্প সন্ধান করার ইঙ্গিতই সাংকেতিকভাবে দিয়ে গেছেন তাঁর সর্বশেষ কবিতাবলির ছত্রে ছত্রে। তাই তো তিনি স্বাধীন দেশে, যেখানে বৈষম্যহীন সমাজের একজন কর্মী হিসেবে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন, সেখানে নতুন প্রজন্মের জন্যও আত্মবিশ্বাসী হয়ে আশার বাণী শোনাতে পারেননি। শেষ বয়সে কবি তাই নিজেকে আবিষ্কার করেন অস্তিত্ব-বিলুপ্ত অথবা ভাঙার পর জোড়াতালি দেওয়া কোনো অস্বচ্ছ আয়নার বিধ্বস্ত রূপের মধ্য দিয়ে—যেখানে আসলে কবি নিজের অবয়ব নয়, দেখতে পেয়েছিলেন দেশেরই চূর্ণবিচূর্ণ স্বরূপ। বিদীর্ণ দর্পণের কল্পিত মুখচ্ছবি আসলে কবির নয়, যেন গোটা জাতিরই সামগ্রিক চিত্র, ওটা যেন দেশেরই প্রতিচ্ছবি। শেষ বয়সে কবি মূলত মানুষের ওপর আরোপিত নানা ভয়াবহতার কথা 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' নামের তিনটি শৈল্পিক শব্দে নিজের মুখের প্রতিচ্ছবির কাল্পনিক দৃশ্যের আলোকে মানুষকে নেতিবাচক অবস্থান থেকে ইতিবাচকতার দিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন, যা ব্যক্ত হয়েছে এ-কাব্যের অধিকাংশ কবিতার শরীরে। এভাবেই বিভিন্ন সমাজ-ঘনিষ্ঠ আবহ আর দেশের সংকটকাল চেতনায় ধৃত হয়ে কবি আহসান হাবীবের শিল্পীচৈতন্য গঠিত হয়েছে। এ কারণেই সমাজনিবিষ্ট কবি আর মানবদরদি কবিতার নির্মাতা হিসেবেই তাঁর সমধিক স্বীকৃতি।

তথ্যনির্দেশ

১ আবু জাফর শামসুদ্দীন; "প্রয়াতবন্ধু কবি আহসান হাবীব", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, রোকনুজ্জামান (সম্পা.), আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৮

২ বরিশাল বি-এম কলেজে যে দেড় বছর সময় অতিবাহিত করেছেন পড়াশোনার সুবাদে, ততটুকুই ছিল আহসান হাবীবের সরাসরি শহর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা।

৩ আহসান হাবীব, *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* কাব্যের ভূমিকা "পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৪৮

৪ আহসান হাবীব, *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯

৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯

৬ সৈয়দ আলী আহসান, *সতত স্বাগত*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৬৪

৭ আহমদ রফিক, "আহসান হাবীবের কবিতায় সমাজচেতনা", (আহসান হাবীবকে নিয়ে প্রকাশিতব্য গ্রন্থ)

৮ আহমদ রফিক, "আহসান হাবীবের কবিতায় সমাজচেতনা", পূর্বোক্ত

৯ আহসান হাবীব, *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), "আহসান হাবীব : কবি ও কবিতা", পূর্বোক্ত, পৃ. বারো

১০ *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), *আশায় বসতি* কাব্যের "মুখবন্ধ"।

১১ তুষার দাশ, *নিঃশব্দ বজ্র : আহসান হাবীবের কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৪৭

১২ তুষার দাশ, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৮

১৩ *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), পৃ. তেরো।

১৪ আলমগীর টুলু, "মেঘ বলে চৈত্রে যাবো : আলোর প্রত্যাশা", 'উলুখাগড়া' (সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিষয়ক ত্রৈমাসিক), সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পা.), সংখ্যা ১৫, ঢাকা, পৃ. ২০৩

১৫ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আহসান হাবীবের ভূমিকা কী ছিল? এমন প্রশ্ন করলে কবির বড় পুত্র মঈনুল আহসান সাবের ওই সময়ের অনেক স্মৃতিচারণা করেন। একপর্যায়ে তিনি বলেন, 'আমাদের বাসায় একজন নয়, চার-পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা দিনের পর দিন থেকেছেন।'

১৬ মুক্তিযুদ্ধের সময় নবম শ্রেণীতে পড়তেন মঈনুল আহসান সাবের। ওই সময় তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভঙ্গুর। কবি হঠাৎ লক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

করলেন যে তাঁর ছেলে প্রতিদিনই কোথাও-না-কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর প্রায় প্রতিদিনই তাঁর সহপাঠীদের যুদ্ধে অংশ নেওয়ার খবর দিচ্ছে। এমনই একদিন কবি ছেলেকে ডেকে বললেন, 'তুই যেতে চাইলে যেতে পারিস। তবে তোর যা শরীর, আমার মনে হয়, তুই গিয়ে বেশি সুবিধা করতে পারবি না।'

১৭ সুরার দেবতা ডায়োনিসাসের সঙ্গে সখ্য ছিল মিডাসের। একদিন ডায়োনিসাসের এক সহচর সাইলেনাসকে চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করেন মিডাস। বিনিময়ে মিডাস ডায়োনিসাসের কাছে এক অদ্ভুত বর চাইলেন। ধনলোভী মিডাস বললেন, 'আমি যা স্পর্শ করবো তা যেন সঙ্গে সঙ্গে সোনা হয়ে যায়।' ডায়োনিসাস তা-ই করলেন। মনের আনন্দে মিডাস সবকিছু সোনা বানিয়ে ফেললেও প্রকৃতপক্ষে সেটার নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করেন খাবার খেতে গিয়ে। কারণ খাবার স্পর্শ করলে, তা-ও সোনা হয়ে যাচ্ছিল। (দ্র. *প্রতীচ্য পুরাণ*, ফরহাদ খান, প্রতীক, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১১৮)

১৮ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর কবির প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল—এ প্রশ্ন করলে কবিপুত্র মঈনুল আহসান সাবের বলেন, তিনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। স্বাধীনতার কিছুদিন পর তো দেশে অরাজক পরিস্থিতি চলছিল। সেসব নিয়ে তাঁর ভেতরে হতাশা ছিল। তবে বলেছেন, 'এ হত্যাকাণ্ড মেনে নেওয়া যায় না। এটা মেনে নেওয়ার মতো নয়।'

১৯ *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্য সম্পর্কে আপনার কোনো নিজস্ব বক্তব্য থাকলে বলুন—এমন জিজ্ঞাসার পর কবি বলেছিলেন, 'যন্ত্রায়িত নগর এবং যন্ত্রণাক্ত নগর-জীবনই আধনিক কবিতার একমাত্র উপজীব্য—এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। কিন্তু যন্ত্রণা কি কেবল নগরেই? দৃষ্টির এই সীমাবদ্ধতার ফলে কবিতাকে এক করে বাংলাদেশের কবিতা এক উজ্জ্বল পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। আধুনিক একঘরে করে না রেখে তাকে জনপদসংলগ্ন করাই ছিলো আমার লক্ষ্য।' (রেজোয়ান সিদ্দিকীর নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি কবি এই কাব্য সম্পর্কে এ কথা বলেন। ছাপার অক্ষরে পাওয়া গেলেও সাক্ষাৎকারটি কোথায়, কবে প্রকাশিত হয়েছিল, তার হদিস পাওয়া যায়নি।)

২০ শহীদ ইকবাল, *কালান্তরের উক্তি ও উপলব্ধি*, চিহ্ন, রাজশাহী, ২০০৫, পৃ. ৮১

২১ ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে জিন্নাহর বক্তব্যের প্রতিবাদ করায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে সরদার ফজলুল করিম ছিলেন ফেরারি। তাই একটু নিরাপদে থাকার জন্য তিনি কলকাতায় যান এবং আহসান হাবীবের সঙ্গে ইত্তেহাদ পত্রিকার অফিসে দেখা করেন। তাঁর কর্মকাণ্ড শুনে কবি বিস্মিত হন। একপর্যায়ে যখন তিনি বললেন যে তাঁকে রাত্রে থাকার জায়গা দিতে হবে। তখন কবি বললেন, 'তুমি সংগ্রামী আদর্শে অনুপ্রাণিত, তোমাকে পথ থেকে ফেরাবার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার ঐ পথে নেমে আসারও আমার শক্তি কোথায়? কিন্তু তুমি আমার বাসায় কয়েকদিন থাকবে, এটুকু করতে না পারলে, আমারই তাতে দুঃখ কম হবে না।' (রোকনুজ্জামান খান সম্পাদিত *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, পৃ. ৪৭)

২২ সাহিত্যিক আবদুল হক তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, '...*ইত্তেহাদ*-এ তিনি কয়েকটি বিষয়ে আমার প্রবন্ধ ছেপেছিলেন বিশেষ করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে। শুধু আমার নয়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গে তিনি অনেকের লেখা *দৈনিক ইত্তেহাদ*-এ ছেপেছিলেন এবং পরে যে-ভাষা আন্দোলন হয়েছিল, তাতে এইভাবে তিনি অবদান রেখেছিলেন।' (আবদুল হক, *বাঙালির জাগরণ*, (সম্পা. আহমাদ মাযহার), অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২১৫)

২৩ অন্য অনেকের মতো বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক আখতার হুসেনও কবি আহসান হাবীবের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। আহসান হাবীবকে নিয়ে অনেক প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণার পাশাপাশি "আমি কোনো আগন্তুক নই" কবিতাটির প্রেক্ষাপট তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবেও কবির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলে জানান তিনি। (১৯ মার্চ ২০১২ বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে 'প্রথম আলো' কার্যালয়ে উপর্যুক্ত বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়।)

২৪ আহসান হাবীব, *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. চৌদ্দ।

Dhaka University Institutional Repository

২৫ শামসুর রাহমান, "তিনি ছিলেন তরুণের প্রতিযোগী", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

২৬ আহসান হাবীবের বড় ছেলে মঈনুল আহসান সাবের *প্রেমের কবিতার* উৎসর্গপত্রের নামগুলো প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'সেই নামগুলোর কোনোটিই কাল্পনিক নাম নয়। তাঁদের সবাই কোনো না কোনোভাবে বাবার পরিচিত ছিলেন, ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আমরাও দেখেছি, তাঁরা ছাড়াও অনেকেই বাবার কাছে আসতেন। মা বুঝতেন, এমন একজন মানুষের কাছে নারীরা আসতেই পারেন। তাই বলে রুচি-বহির্ভূত কোনো সম্পর্ক ছিল না তাঁদের সঙ্গে। এ কারণে এ নিয়ে আমার মার সঙ্গে কোনোদিন ভুল বোঝাবুঝি হতে দেখিনি। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েবন্ধুরা যদি কেউ আসত, দেখা যেত আমার চেয়ে বাবার সঙ্গেই বেশি খাতির জমত।' (২০১১সালের ১৫ সেপ্টেম্বরে নেওয়া সাক্ষাৎকারে মঈনুল হোসেন সাবের এ-মন্তব্যটি করেন।)

২৭ আহসান হাবীব, *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), *প্রেমের কবিতা* কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গপত্র।

২৮ আহসান হাবীব, *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), পৃ. সতেরো।

২৯ আহসান হাবীব, *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), "পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ", পৃ. ৩৫০

৩০ আহসান হাবীব, *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), পৃ. ৩৪৯

৩১ আবুল হোসেন, "আহসান হাবীব", *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, (সম্পা. রোকনুজ্জামান), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৩২ আহসান হাবীব, *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), পৃ. পনেরো।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আহসান হাবীবের কবিতা : বিষয়বৈচিত্র্য

আমাদের সাহিত্যে ব্যক্তিজীবন আর শিল্পজীবন একাকার হয়েছে—এমন কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত বিরল। সেই বিরল কৃতিত্বের অধিকারীদের অন্যতম কবি আহসান হাবীব। সারাটা জীবন তিনি পত্রপত্রিকায় সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট কাজ করেছেন। সেই হিসেবে কেউ তাঁর পেশাজীবনকে বৈচিত্র্যহীন বললেও কাজের সন্ধানে ক্রমাগত এক পত্রিকা থেকে আরেক পত্রিকা অফিসে ছুটোছুটি এবং পেশাদারির সঙ্গে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করাকে কোনোভাবেই একঘেয়েমি বলা যাবে না। আর তাঁর ব্যক্তিজীবন বা উপার্জনের অবলম্বন হিসেবে কর্মজীবন আর কবিজীবনকে পাশাপাশি রাখলে মনে হয়, সবই একে অপরের পরিপূরক। কেননা, তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে কবিতা সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। সারা জীবন তিনি এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেননি, যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাহিত্য বা কবিতার যোগসূত্র ছিল না। কবিতা ও তার ক্ষেত্র সৃষ্টি আর মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ ছিল আমৃত্যু। স্বাধীন মতপ্রকাশ এবং ব্যক্তিত্বশীল চিন্তার প্রকাশ তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একই বিষয় নিয়ে একই সময়ের অন্য পাঁচজন কবি যেভাবে কবিতায় তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, আহসান হাবীব সেভাবে করেননি। এভাবেই তাঁর কবিকণ্ঠে স্বতন্ত্র স্বরের সূত্রপাত ঘটেছে, স্বতন্ত্র কবিব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কবি হিসেবে যে সময় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাংলা কাব্যজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ছিল আন্তর্জাতিক ও দেশীয় নানা প্রতিকূলতা এবং মানবতাবিরোধী বন্ধ্যা সময়। তাঁর মতো এত বেশি সংকটকাল মাথায় নিয়ে আর খুব বেশি কবি-সাহিত্যিক বাংলা কাব্যজগতে আবির্ভূত হননি। ব্যক্তিজীবন, কর্মজীবন আর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট—সব মিলিয়ে আহসান হাবীবের মতো পোড় খাওয়া জীবন আর তেমন কোনো কবির ভাগ্যে জোটেনি।

এক বিশ্বযুদ্ধ মাথায় নিয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখে আরেক বিশ্বযুদ্ধকালে বেড়ে উঠেছিলেন আহসান হাবীব। সাতচল্লিশে দেশ-বিভাগ, বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন, পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের নতুন উপনিবেশ হিসেবে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, নরঘাতক হিসেবে ইয়াহিয়ার আবির্ভাব, ছেষট্টির আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড, পরপর দুইবার সামরিক শাসনের কবলে অসহায় বাংলাদেশের চিত্র—এসবই প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল কবি আহসান হাবীবকে। আর এ ছাড়াও মানসিক পীড়ন তো ছিলই সংসারজীবনে—আর্থিক অনটনের কারণে। আমরা জানি, কবি হওয়ার অতলান্তিক প্রত্যাশায় তিনি সৃষ্টির যন্ত্রণায় দেশ ত্যাগ করেছিলেন। কবি হিসেবে তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এক জায়গায় থেমে না-থাকা। তাই কবিতায় ধরা পড়ে বিচিত্র বিষয়-আশয়। প্রতিটি পরিস্থিতিতে খাপ-খাওয়ানোর অসম্ভব এক ক্ষমতা ছিল তাঁর। যে কারণে কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য আর প্রকরণ-বৈচিত্র্যকে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে পেরেছেন তিনি। তাঁর কবিতার ভাব ও বিষয় ইতিবাচক জীবনবোধে সঞ্জীবিত। প্রথম কাব্যের বিষয় হিসেবে আমরা যেমন পাই ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের বার্তা, তেমনি পাওয়া যায় যুদ্ধ কীভাবে মানুষকে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করেছে, সেসবের চিত্র। আবার যেমন পাওয়া যায় অসম্ভব স্বপ্নপিয়াসী এক কবিকে, তেমনি পাওয়া যায় সমকালীন সমাজের নানা চিত্র, যার সবকিছুতে তিরিশি বিষণ্নতা সত্ত্বেও একধরনের আশাবাদ সুপ্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিরিশি আধুনিকতা তাঁকে আধুনিক কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে বিশেষ কারো দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত

Dhaka University Institutional Repository
হয়েছেন—কাব্য শুরুর কালেও তাঁর সম্পর্কে এমন অভিযোগ খাটে না। বরং শুরু থেকেই আহসান হাবীব স্বকীয় কণ্ঠ নিয়ে কাব্যাঙ্গনে নিজের বলিষ্ঠ অস্তিত্ব জানান দিয়েছিলেন *রাত্রিশেষ*-এর (১৯৪৭) মধ্য দিয়ে।

এই কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্যভুবনে ধ্বনিত হয় নতুন এক কবির স্বকীয় কণ্ঠস্বর। তার কারণ 'তিরিশের কাব্যান্দোলনের উজ্জ্বল ধারা নিয়ে আহসান হাবীব তাঁর কবিতায় যে জনজীবনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন, তা জীবনের কোলাহলময় দিকের নয়—বরং জীবন যেখানে সংসারের বিবিধ সমস্যায় কাতর, ভগ্ন-দীর্ণ দুর্বিষহ বোঝার ভার বইতে না পেরে ব্যথায় অস্থির, মানবাত্মা যেখানে দলিত-মথিত, জীবনের সেই নৈরাশ্যময় ব্যথাদীর্ণ সমস্যা কণ্টকিত প্রতিচ্ছবি।'[১] বাংলা কাব্যের সমকালীন অভিযাত্রায় যাঁরা আহসান হাবীবের সঙ্গী ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। ওই সময়ে বিভিন্ন দর্শন আর রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন কলকাতাকেন্দ্রিক লেখক-বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিকেরা। সংগতকারণেই তাঁদের সৃষ্টিতে নিজ নিজ ভাবাদর্শের ছাপ পড়েছে সুস্পষ্টভাবে। অন্যদিকে আহসান হাবীবও সেই সংকটাপন্ন সময়ে মানুষের প্রতি মানুষের জিঘাংসা, বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পাশবিক হওয়ার চিত্র তাঁর কবিতায় অঙ্কন করেছেন। তবে তাতে কোনো বিশেষ আদর্শের কথা নয়, বরং সর্বৈবভাবে মানবতার কথা, সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের চিত্র সাংকেতিকভাবে উঠে এসেছে। 'যে জনজীবনের প্রতিচ্ছবি আহসান হাবীবের কাব্য মানসে ফুটে উঠেছে তা বিংশ শতাব্দীর দান। স্পেন্ডার, অডেন, ডেলুইস-এর ভাবনা-ধারার যে লক্ষণ আমদের চোখে পড়ে, তা রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে যদিও "বিস্ময়কর রূপের ইনটেলেকচুয়াল" বলে গণ্য, তবুও বুদ্ধি-বৃত্তির সঙ্গে রসবৃত্তির সমন্বয় সাধন ঘটিয়েছেন এরাই। আহসান হাবীব এই সমকালের প্রভাব নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মধ্যে বলিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে সমস্ত ঘটনা সমকালীন কবিতায় গভীরভাবে ছাপ ফেলেছে, সেগুলি হচ্ছে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ, কমিউনিজমের আবির্ভাব, ১৯২৯-৩১ সালে অর্থনৈতিক মন্দা, সিগমুন্ড ফ্রয়েড-এর মতবাদ, দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ, প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ, পাকিস্তান আন্দোলন, দেশ-বিভাগ, কল্যাণব্রতীরাষ্ট্র কল্পনা এ-সবই এই কারণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।'[২] তাঁর কবিতার শরীরে স্থান পাওয়া বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো জনমানসের সঙ্গে গভীর সংযোগ। এই সংযোগটি তাঁকে প্রতিবাদী করেনি, বেদনায় আপ্লুত ও ভাবনায় স্থিতধী করেছে। তাই প্রথম কাব্যের বিষয় ও বিশ্বাস যেন সংশয়, জাগরণ এবং আস্থা আর আশাবাদের মিলিত প্রয়াস। বলা যায়, এই ধারাবাহিকতার চিহ্ন পরবর্তী কাব্যগুলোতেও রয়েছে। তবে কাব্যান্তরে বিষয়ের বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়ে ক্রমাগত তিনি নিজেকে নতুন করে উপস্থাপন করেছেন—আর অতিক্রম করে গেছেন নিজেকেই।

তাঁর সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিসন্তান আহসান হাবীব তাঁর কাব্য-কর্মে সময়যোগ সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। *রাত্রিশেষ*-এর দ্বিতীয় প্রকাশের 'মুখবন্ধে' কবিতাগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন, 'রাত্রিশেষ-এর সব কবিতাই ইংরেজী ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে লেখা। ১৯৪৭-এ এর প্রথম প্রকাশ—বাংলা কবিতা যখন সমাজসম্পৃক্ত এক নতুন সংজ্ঞায় নতুন দিগন্তে উত্তীর্ণ হচ্ছে।'[৩] অর্থাৎ তিরিশি বাংলা কবিতা সমাজসম্পৃক্ত ছিল না, এমন বক্তব্যই উঠে এসেছে ওই মুখবন্ধে। কবিতার বিষয় ও ভাবনার ভিন্নতা অনুযায়ী এ-কাব্যটিকে চারটি ভাগে বিভাজন করে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন কবি। 'প্রহর', 'প্রান্তিক', 'প্রতিভাস', 'পদক্ষেপ'—আকর্ষণীয় ও অর্থবহ এই চারটি নাম *রাত্রিশেষ*-এর জন্য একধরনের চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে। বিষয়ের বৈচিত্র্য যে তাঁর কবিতার জন্য অপরিহার্য, তার প্রমাণ এই বিভাজন। এগুলো যেন পর্যায়ক্রমিক রীতিতে বিষয়কে বৈচিত্র্যের শক্তিতে অবগাহন করিয়ে ক্রমাগত উত্তীর্ণ করে তোলার সচেতন প্রয়াস। প্রতিটি অংশে ভাব ও বিষয়ের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি সমাজ-

Dhaka University Institutional Repository
সম্পৃক্তির পার্থক্যও এখানে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম দিকের কবিতার নেতিবাচকতা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে প্রত্যয়-দৃঢ় কণ্ঠসৌকর্যে সুস্থির হয়েছে।

নামানুগ এই শিল্পিত কবিতাগুলো শুরুর আগে ভিনদেশী যেসব কবির কাব্যপঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো তাঁর কবিতার আবেদনকে হৃদয়গ্রাহী করেছে। একেকটি অংশের সমস্ত কবিতা যেন ওই কয়েকটি মাত্র পঙ্‌ক্তিরই প্রেরণা-সম্ভূত। অর্থাৎ পঙ্‌ক্তিগুলো যেন প্রতিটি কাব্যাংশের ভাব-চুম্বক ও প্রেরণাকে ধারণ করে আছে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :

> রাত্রিশেষ-এর কবিতাগুলো চারটি পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে আবেগ থেকে এর 'প্রহর' পর্যায় উৎসারিত তাকে অতিক্রম করে, ইতিহাসের অগ্রগমন অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসবিমুখ শ্রান্তি থেকে তাই 'প্রান্তিক' পর্যায়ের দ্বিধান্বিত স্বাক্ষর। কিন্তু সমাজ মানসে ইতিহাস-চেতনার ব্যাপ্তি ব্যক্তিমানসে নতুন ইতিহাস যোজনায় অক্ষম নয়। আর ঐতিহাসিক অভিঘাত শিল্পী-জীবনের অভিজ্ঞতায়ও নতুন আলোকসম্পাতে সক্ষম।
>
> এই বিশ্বাস আর এই অনুভবই 'প্রতিভাস' পর্যায়ের ক্রান্তিকালে 'পদক্ষেপ'-এর সূচনা করেছে শিল্পীমানসে।'[৪]

জাতিকে নিয়ে আশাবাদী কবি আহসান হাবীব মাটিতে শেকড় গেড়েই স্বপ্ন দেখেন। অপেক্ষা করেন নির্বিঘ্ন ভবিষ্যতের জন্য। তাই পারসি কবি ফিরদৌসীর কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর *রাত্রিশেষ*-এর 'প্রহর' নামক সুবিন্যস্ত কবিতাবলি রচনা করলেও তাতে যেন অন্য কোনো দেশের নয়, কবির স্বদেশের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। পঙ্‌ক্তিগুলো উদ্ধৃত হলো :

মৃত্তিকা আমাদের শয়ন
আর আকাশ তার ছাউনি
অনন্ত পথের দিকে দৃষ্টি আমাদের প্রসারিত
আমরা অপেক্ষমাণ
সময়ের স্বর্ণ-ঈগল
কী আমাদের জন্যে বহন ক'রে আনবে
তারই অপেক্ষায়।

(ফিরদৌসী)

কোনো শর্ত না থাকলেও আমরা দেখব, কীভাবে উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো 'প্রহর' পর্যায়ের কবিতার প্রেরণা হয়ে ওঠে। কবি তাঁর প্রথম কাব্যের প্রথম কবিতায় স্বপ্নের কথা বলেছেন। বলেছেন তাঁর 'মাটির ক্ষীণ' বিন্দু আর 'বন্ধ্যা' সময়ের কথা, যখন বিশ্বমানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল মানবসৃষ্ট সংকটের কারণে। "দিনগুলি মোর" কবিতায় আমরা দেখি, কবি পুরোপুরি তৎকালীন সময় দ্বারা শাসিত। সময়ের প্রভাবে তাঁর সৃষ্টিজাত ফসলও প্রভাবিত। চল্লিশের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকটের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন কবি। দ্বিতীয় মহাসমরের সেই ভয়াবহতা সাহিত্যের প্রতিটি শাখাকেই নতুন করে সাজাতে বাধ্য করেছিল। তিরিশের কবিদের তুলনায় চল্লিশের দশকের কবিরা শুরু থেকেই ছিলেন সমাজ-সচেতন, সেহেতু তাঁদের কবিতার প্রধান বিষয়গুলোর একটি যে হবে সমাজ-অন্বেষা, সেটাই স্বাভাবিক। আর আহসান হাবীবের কবিতার আনুষ্ঠানিক শুরুটাই হয়েছিল সমাজভাবনা দিয়ে। তিনি সূচনা-কবিতাতেই বলতে বাধ্য হন :

দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ পাখির মতো
বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান।
... ...
মনের ফাটলে স্মরণাশ্রিত স্বপ্নের কণাগুলি
জন্ম দিয়েছে লক্ষ বীজাণু কুটিল মৃত্যুদূত।
... ...

Dhaka University Institutional Repository

দিনগুলি আজ জরতী রাতের দুঃস্বপন,
চির দহনের তিক্ত শপথ বহন !
দিনগুলি মোর শ্বাপদ-বিজয়ী অরণ্যেতে
শর-খাওয়া এক হরিণ-শিশুর আর্তনাদ।

("দিনগুলি মোর", *রাত্রিশেষ*)

চল্লিশের কবিতা তিরিশের কবিতার চেয়ে স্বতন্ত্র মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সমাজ-সচেতনতায় উত্তরণের কারণেই। চল্লিশের কবিতার মূল সুর যে সমাজবাস্তবতা তা তার রূপায়ণ-প্রবণতার মধ্যেই নিহিত সন্দেহ নেই। এ জন্যেই তৎকালীন পূর্ব বাংলার শেকড়মুখী কবি হিসেবে আহসান হাবীব ও তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে সমকালীন সমাজবাস্তবতা। সমাজ-সচেতনতার ধারক ও বাহক হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন "এই মন—এই মৃত্তিকা" নামের কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। যদিও 'চল্লিশের কাব্যদশক পরিবেশগত কারণেই সমাজ বাস্তবতার মাটিতে পা রাখে। চল্লিশের কবিদের অধিকাংশই তাই সমাজনির্ভর, জীবনমুখী। সামাজিক বঞ্চনা ও মানুষে-মানুষে ব্যবধানের তীব্র জ্বালা এদের অনেকেরই কবিতায় অনবদ্য রূপময়তায় ফুটে উঠেছে।'[৫] সংগতকারণে আহসান হাবীবও সমাজপরিবেষ্টিত বিষয়কে প্রথম থেকেই তাঁর কবিতার শরীরে গেঁথে নেন। শুধু তা-ই নয়, জন্মভূমির বাইরে অবস্থান করায় তাঁর কবিতায় একই সঙ্গে দেশের প্রতি অকৃত্রিম দরদও প্রতিফলিত হয়েছে আলোচ্য কাব্যে। কবিতাটিতে আমরা দেখব, শুরুতেই তিনি আশাবাদী হয়ে উঠছেন স্বভাবগত কারণে। আবার হতাশার কথাও ব্যক্ত করছেন। আশা-হতাশার দোলাচলতা চললেও, শেষ পর্যন্ত বিচলিত আশাবাদ সত্ত্বেও তিনি এই মাটিতেই অবিচ্ছিন্ন অবস্থানের কথা জানান দেন। সারা কবিতাতেই এমন দ্বিধাচঞ্চলতা লক্ষণীয়। যেমন :

ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তবু বাঁধলাম নীড়,
তবু বারবার সবুজ পাতার স্বপ্নেরা করে ভীড়।
তবু প্রত্যহ পীত অরণ্যে শেষ সূর্যের কণা,
মনের গহনে আনে বারবার রঙের প্রবঞ্চনা।
... ...
চেনা পৃথিবীকে ভালোবাসলাম জানাজানি ছিল বাকী,
জানতাম নাতো সে পরিচয়েতে ছিলো অফুরান ফাঁকি।
জানতাম নাতো নিত্য নিয়ত অজস্র ডানা জ্বলে—
যে দীপশিখারে ভালোবাসলাম তারি দহনের তলে।
জানতাম না যে সূর্যমুখীর নয়নের আলো কেড়ে
তারি ছায়া তলে কোটি কোটি কীট দিনে দিনে ওঠে বেড়ে।

("এই মন—এই মৃত্তিকা", *রাত্রিশেষ*)

শৈশবে যে পৃথিবীকে কবি দেখেছেন, সে পৃথিবীর পবিত্র ছায়াতল মানুষরূপী কীটে আক্রান্ত। জীবনানন্দের রেখে যাওয়া 'ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে'র ওপর একই সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলে জন্ম নেওয়া উত্তরসূরি কবি আহসান হাবীব যে কাব্যের 'নীড়' বাঁধতে চেয়েছেন, তা তো স্পষ্টই। সভ্যতার করাল গ্রাস তখন কবির প্রিয় স্বদেশের বুকেও। তার পরও তিনি সবুজের সমারোহ দেখতে পান। কেননা, এই বংলায় কালে কালে যুগে যুগে 'বহু মেঘ' এসেছে শাসকরূপে। দিন পেরিয়ে রাত হয়েছে, রাত শেষে দিনের আবাহন-চিহ্ন দেখা গেছে কিন্তু কেউ 'বাসনার প্রিয় কথা' বলে 'আলোর প্রসন্নতা' দেখাতে পারেননি। শোষক আর শাসকের হাতবদলে মানবকল্যাণমুখী তেমন কোনো পরিবর্তন দৃশ্যমান ছিল না। তাই কবি ওই সময় অবিভক্ত ভারতের নাগরিক হিসেবে ঔপনিবেশিক সমঝদারদের আসা-যাওয়াকে 'চিরচেনা পথ' বলেছেন। তিনি তাঁর সংবেদনশীল অনুভূতি দিয়েই অনুভব করেছেন আর বলতে চেয়েছেন, 'এ-মৃত্তিকায় বিচ্ছেদ নাই কভু'—

Dhaka University Institutional Repository

দিন এলো আর দিন গেলো তার চিরচেনা পথ ধরে,
অনেক সূর্য আর বহু মেঘ সেই পথে গেল ঝ'রে,
ঝ'রে গেছে আর ম'রে গেছে, তবু নিত্য সে মৃত্যুরে
মেনেছি মহান মমতার দান, তাই সে হারানো সুরে
কেঁপেছে আবার বাঞ্ছিত দিন, বাসনার প্রিয় কথা,
নয়নে যদিও ছায়া ফেললো না আলোর প্রসন্নতা!

... ...

প্রেমহীন সেই বন্ধুর দেশে নীড় বাঁধলাম তবু,
এই মন আর এ-মৃত্তিকায় বিচ্ছেদ নাই কভু।

("এই মন—এই মৃত্তিকা", *রাত্রিশেষ*)

আহসান হাবীবের কবিতার বিষয় এবং তার পরিচর্যা কত বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পারে, এর বক্তব্য কত রসঘন হতে পারে—এমনকি পাঠক-মনকে কতটা কাব্যিক দোলায় বিহ্বল করে তুলতে পারে, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ উপর্যুক্ত কবিতাংশটি। আধুনিক কবিতার অন্যতম উপসর্গ হলো তাকে ইতিহাস-চেতনায় সমৃদ্ধ হতে হয়। অর্থাৎ কবিদের আত্মজিজ্ঞাসায় সময় এবং সময়ানুযায়ী ইতিহাসের ধারাকে অনেক সময়ই ভিত্তিমূল হিসেবে গণ্য করতে হয়। কবিতার বিষয় হিসেবে ইতিহাসনিষ্ঠ কবিরা যখন বর্তমানকে নাড়া দিতে সক্ষম হন, তখনই সমাজ ও মানুষের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কেমন করে কবিতার শরীরে প্রতিফলিত হয়, তা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। আহসান হাবীব তাঁর কবিতা নিয়ে সেভাবেই সমাজ প্রগতির দিকে অগ্রসর হন। ইতিহাস, সমাজ ও প্রকৃতি কবিতায় কীভাবে আত্তীকৃত হতে পারে, সে-সম্পর্কে আহমদ রফিকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ...মহৎ কবিতার অন্তর জিজ্ঞাসার মৌলিকতা ইতিহাস ধারায় নিমজ্জিত, আর ইতিহাস বিবর্তনে সামাজিক মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তুলে দিয়েছে। তাই একদিকে যেমন মানুষের সমাজ-নির্ভর মুক্তির জয়গানে কবিতা অকুণ্ঠিত, তেমনি নিসর্গ-মগ্নতায়ও ফুটে উঠবে এই মানুষের আনন্দ চেতনার বর্ণলিপি। তাই কবি স্বকীয়তায় মগ্ন হয়েও জীবনের রহস্যময়তা জানার আর্তিতে আকুল। এই তিল তিল করে জমে উঠা আকুলতাই বিমূর্ত রূপে তার অন্তরগহনে ডুবে থাকে, আর প্রয়োজনে কাব্যের শরীরী-রূপের নির্মাণে এগিয়ে আসে। কবিতার এই বিষয়গত প্রেরণাই মানবিকতায় প্রগতির স্বরূপ,—জীবন-মাহাত্মে সামগ্রিক। তারপরই শুধু কলাকৌশলগত প্রকাশনৈপুণ্যের প্রসন্ন-লীলা কবিতায় প্রসাদ আনতে সক্ষম। সমাজ ও সংস্কৃতির গতিধারা যদি অস্থির, অগভীর উচ্ছলতায় চঞ্চল না হয়ে সুস্থ, সুনির্দিষ্ট ও বেগবান হয়ে ওঠে—তবে তার পলি-উর্বর মাটিতে মহৎ, সুপুষ্ট কবিতার নিটোল ফসল না জন্মে পারে না।[৬]

নিজের প্রতি, জাতিত্বের প্রতি অবিচল-অটল বিশ্বাসই আহসান হাবীবকে তিরিশি কবিতার প্রভাবে বিচলিত না হয়ে আশাবাদী কবি হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছে। তিনি যখন 'নীল রক্তের' ঔপনিবেশিক শাসনের অমানবিক চিত্র অবলোকন করেন, তখনও তিনি স্বপ্ন দেখেন অন্ধকার শেষের আলোর রেখা। সেই অন্ধকার দূর করতে হলে সংগ্রামমুখর হতে হবে, সে-ব্যাপারে তিনি সচেতন। তিনি সাধারণ মানুষের কাতারে নিজেকে শামিল করে তাই বলতে বাধ্য হন 'রক্তেই হবে সে ঋণ শোধ।' দ্বিতীয় মহাসমরের সময় এবং অব্যবহিত পরে এই অঞ্চলের সমাজ-পরিবেশে যে নতুন সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল, তাও কবির চোখ এড়িয়ে যায়নি। যুগে যুগে শাসক-শ্রেণি সব সময় সমাজের মেধাবী বা লেখক-বুদ্ধিজীবীকে তাদের আয়ত্তে রাখতে চায়। রাজনীতি সচেতন কবি-সাহিত্যিকদের ওপর সেই খড়্গ সবচেয়ে বেশি নেমে আসে। আবার কেউ কেউ শাসক-শ্রেণির কাছে আত্মসমর্পণ করেও শ্লাঘা

Dhaka University Institutional Repository

অনুভব করেন। এই কাব্যের তাৎপর্যপূর্ণ "আজকের কবিতা"য় আহসান হাবীব ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে গূঢ় বাস্তব বর্তমানের চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনীতিকে তিনি শ্লেষের তির্যকতায় আঘাতও করেছেন। যেমন :

এখানে তোমার ছাউনি ফেলো না আজকে
    এটা বালুর চর :
চারিদিকে এর কৌটিল্যের কন্টকময় বন ধূসর!
    উর্ধ্বের আকাশ ম্লান মেঘের
    নিম্নে অতল বন্যা এর
বাস করে শত চানক্যশিশু (sic) শকুনির বহু বংশধর
এখানে তোমার ছাউনি ফেলো না এখানে বেঁধো না বিরাম ঘর।

("আজকের কবিতা", *রাত্রিশেষ*)

উত্তাল সময়ের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সামাজিক জীবনকে কবি ব্যঙ্গ করেছেন। ব্যঙ্গ করেছেন যখন মানুষ তার চিরাচরিত বিশ্বাস থেকে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে মুখোশ ধারণ করে এবং স্বকীয়তা বিলীন করে গা ভাসিয়ে দেয়, সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলোকে। সর্বব্যাপী কৃত্রিমতার সেই বিরুদ্ধ হাওয়ায় আহসান হাবীব অত্যন্ত সাবলীলভাবে তাঁর স্বপ্ন বিন্যস্ত করেছেন 'কপিশ নয়ন হানবে' বলে কথাটি ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে। দেশ ও জাতির সংকটকালে সব দেশেই একটা সুবিধাবাদী শ্রেণি দাঁড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালেও সুবিধাবাদী শ্রেণিটি এই অঞ্চলে সমান সক্রিয় ছিল। কবি যেহেতু সাধারণের কাতারে দাঁড়িয়ে, তাই বিষয়টি তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। বলা যায়, আহসান একটা স্বাধীন দেশ, একটা স্ব-নির্মিত নীড়ের স্বপ্নকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করেছেন এই কবিতায়। সর্বব্যাপী সমাজ-সচেতনতার এটি আরেকটি দৃষ্টান্ত :

তোমার আমার দিন ফুরায়েছে যুগটাই নাকি বৈপ্লবিক—
গানের পাখিরা নাম সই করে নীচে লিখে দেয় রাজনীতিক
        থাকতে কি চাও নির্বিরোধ?
    রক্তেই হবে সে ঋণ শোধ।
নীড় প্রলোভন নিরাপদ নয় বোমারু বিমান আকস্মিক
আরব্ধ গান এইখানে শেষ আজকে আহত সুরের পিক।

...   .

আমাদের দিন মৃত্যু-তুহীন দীর্ঘায়ু হবে শ্যেনবিধান,
মৃৎ-পিপাশা ও শান্তিহরণ চিরদিন রবে বিদ্যমান।
    জঠরের জ্বালা চিরন্তন
    চির ক্লেদাক্ত এই জীবন।
যুগ নিষাদের কপিশ নয়ন হানবে সেখানে দৃষ্টিবাণ।
আজকের দিনে এই ত কবিতা গানের পাখির এই ত গান!

("আজকের কবিতা", *রাত্রিশেষ*)

তিরিশোত্তর কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে কবি আহসান হাবীবের প্রাথমিক সংশ্লিষ্টতা ও প্রভাব তাঁর জন্য ছিল অনেকটা অনতিক্রম্য। তাই, অতিক্রমণের প্রয়াস থেকেই সম্ভবত তাঁদের কবিতার ওপর বাসা বাঁধা হতাশা আর বিমর্ষতার পরিবর্তে আহসান হাবীব কবিতায় প্রাধান্য দেন ক্ষোভ এবং জিজ্ঞাসা। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে কাব্য-ঐতিহ্যের সমীকরণ ঘটিয়ে বিস্ময়করভাবে, তিনি অনাগত সূক্ষ্ম স্বপ্নের ইঙ্গিত প্রকাশ করেছেন "আজকের কবিতা"য়। হতাশা আর বিষণ্নতার পরিবর্তে এ কবিতায় আত্মপ্রত্যয়ী সুরই স্পষ্ট। সেই সঙ্গে নতুন বিষয় সন্ধানের আকুলতাও কবিসত্তায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে 'আজকের দিনে এই ত কবিতা গানের পাখির এই ত গান' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে।

আবার জীবনের প্রতি একধরনের হতাশা আর ক্ষোভ একসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন "দ্বীপান্তর" কবিতায়। তৎকালীন সামাজিক পরিমণ্ডল সারা বিশ্বের মুক্তিকামী প্রত্যেক মানুষের জন্যই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। বিশ্ব যেন রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তি চাচ্ছিল, কেননা 'এ পৃথিবী অবিরাম করে আর্তনাদ'। কবি যেন পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন এই "দ্বীপান্তর" কবিতায় বিন্যস্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে। পরাধীনতার গ্লানির তীব্রতায় আচ্ছন্ন কবি জীবনের ব্যর্থতা নিয়েও বিদ্রূপ করেছেন। তবে তা প্রকাশের জন্য শ্লেষের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি—যেন এই মর্ত্যভূমি নয়, অন্য কোনো দ্বীপের আশ্রয়ের সন্ধান করতে চেয়েছেন। যেমন :

এ-দিন সে-দিন নয়—সুরভিত, হালকা কোমল ;
এ-দিন সে-দিন নয়—শাদা রোদ, রঙিন পলাশ!
আজকের দিনগুলি ডানাভাঙা পাখি এতদল,
এ-দিন মমতাহীন, দুর্বিষহ রূঢ় পরিহাস!

লাল মাটি, কালো পীচ্ শাদা নীল বালবের বুকে
ক্রূর হাসি ফেটে পড়ে, পরাক্রান্ত যুগের নিষাদ;
অক্লান্ত চাকার তলে বিস্মিত এ-নয়ন-সমুখে
দ্বীপান্তরে এ পৃথিবী অবিরাম করে আর্তনাদ!

প্রত্যয়ের দিন নাই, প্রতিশ্রুতি বিদ্রূপ-বিক্ষত
আশা ও আশ্বাস নাই, প্রেম হেথা স্বভাব বণিক:
নির্মাংশ অস্থির পাশে ভীড় করি কুকুরের মত,
দীর্ঘদিন বাঁচি মোরা জীবনেরে নিত্য দিয়া ধিক!

("দ্বীপান্তর", *রাত্রিশেষ*)

কবি আহসান হাবীবের দৃষ্টিভঙ্গিকে একজন চিত্রকরের দৃষ্টির সঙ্গে সহজেই তুলনা করা যায়। সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার চিত্র কবিতার শরীরে নিখুঁত এবং সাড়ম্বরে প্রকাশ করার অনন্য দক্ষতা ছিল তাঁর। তবে যে প্রক্রিয়ায় তিনি রেখায়িত করেন কবিতার ক্যানভাসকে, রঙ ও রেখার সমন্বিত সেই আশ্চর্য শক্তিমত্তা কবিতাচর্চার গোড়া থেকেই অর্জন করেছিলেন তিনি।

আহসান হাবীব যেমন উঁচুতলার মানুষের সামাজিক অবস্থা বা তাদের জীবনের টানাপোড়েনের চালচিত্র কবিতায় স্থান দিয়েছেন, তেমনি সমাজের নিচুতলার উপেক্ষিত মানুষের কথা ভেবে কখনো কখনো তাদের জীবনাচরণের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছেন। এ-কাব্যের "কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি" কবিতার বিষয় নির্বাচনে অন্তত তেমন প্রয়াসই লক্ষণীয়। নগরে যে মানুষগুলো বাস করে, নাগরিক আলো-হাওয়ায় যারা দিনাতিপাত করে, স্থূল অর্থে তারা সবাই শাহরিক মানুষ। একজন মানুষের নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য যে আধুনিক মনন দরকার কিংবা দৃষ্টির প্রসারতা দরকার, স্বপ্নের সাজুয্য দরকার, তা হয়তো সবার মধ্যে সমান আশ্রয় পায় না কিন্তু তাই বলে তো নিচুতলার মানুষের স্বপ্ন দেখতে বাধা নেই। তারাও তো একই পরিবেশে অন্য আঙ্গিকের জীবনযুদ্ধে টিকে থাকে। এই কবিতার বস্তিবাসী বালকটি তেমনই স্বাপ্নিক এক বালক—যে তার স্বপ্নযাত্রায় অন্তত একদিনের জন্যে হলেও সঙ্গী করতে চায় দেশ বা রাজ্যের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তির কন্যাকে। বালকটি স্বপ্ন রচনা করে, ঈদের দিনে সে বাদশাহর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার সব নামী-দামি জায়গায় ঘুরবে গাড়িতে করে। কিন্তু গাড়ির সংস্থান যেহেতু সে

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারবে না, তাই সে বলে, 'ওটা একটা কথার কথা/ আমরা হেঁটেই যাব।' স্বপ্ন দেখতে হবে বাঁধভাঙা—এমন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হয়তো আহসান হাবীব ওই বালকের মধ্য দিয়ে নিজের স্বপ্নের বাস্তবায়ন চেয়েছেন। কিন্তু এই বালক স্বপ্নবিলাসী হলেও অত্যন্ত সচেতন। সে বারবার নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তার সামর্থ্যের কথা। তবুও সচরাচর এমন দিনে 'মেম সাহেবরা' কেমন করে রাস্তায় বা পার্কে ঘনিষ্ঠভাবে সময় কাটায় তা-ও কবি কল্পিত ওই বালকের মধ্য দিয়ে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। যেমন :

—আজ আমাদের ঈদ।
বাদশা'যাদী,
তুমি আসবে তো?
কার্জন পার্কের মোড়ে তুমি দাঁড়িয়ে থেকো ;
মাঠ থেকে ফিরে এসে
তোমায় লিফ্‌ট করবো।
উহু গাড়ি কোথায়!
লিফ্‌ট ক'রব মানে
ওটা একটা কথার কথা।

আমার পরনে থাকবে পা'জামা
গায়ে একটা সবুজ ডোরকাটা শার্ট।
... ...
আর তুমি?
তুমি পরেছ লাল টুকটুকে একটা শাড়ি।
যেটা কিনেছিলাম
ফেরিওয়ালার কাছে,
এক টাকা চৌদ্দ আনায়।

("কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি", *রাত্রিশেষ*)

শহরের নিচুতলায় জন্ম নেওয়া স্বপ্নপ্রবর এই নাগরিক বালকটি যে তার সংস্কৃতি সম্পর্কেও সচেতন, তাতে কোনো সন্দেহ রাখেননি কবি। তার কাছে ঈদ উপলক্ষে যে সঞ্চয় আছে তাতে অন্তত একবার দুজনে মিলে রিকশায় চড়তে পারবে, এমনকি পারবে হয়তো বয়োস্কোপ দেখার জন্য মোটামুটি দামি একটি টিকিট কিনতে। কবিতাটির শেষ কয়টি পঙ্‌ক্তি খুবই আবেগঘন ও নির্মম বাস্তবিক :

অনেকে রাতে আমরা বেরুবো।
আবার রিকশ'
তোমায় নামিয়ে দেব,
যে কোনো একখানে—
তুমি যাবে তোমার ঝরোকায়!
আমি যাবো তিন নম্বর হারু মিয়ার বস্তি
সেখানেই আমি থাকি।

("কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি", *রাত্রিশেষ*)

বিশ শতকে ভারতে, বিশেষ করে কলকাতাকেন্দ্রিক নগরজীবনে নব্য অভ্যস্ত লোকজন মূলত জঠরের চাহিদা মেটাতেই গ্রাম ছেড়ে শহরবাসী হয়েছে। কিন্তু তাদের চোখে-মুখে ছিল বড় হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু তার লাভের খাতায় শূন্যতা দেখেছেন কবি। মধ্যবিত্তের যে সংকট বা স্ববিরোধিতা, তার অনেকখানি উঠে এসেছে "কনফেশান" কবিতার মধ্য দিয়ে। কারণ কবি নিজেও জীবনযাপনে এই গোত্রের মানুষেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাই বলে এই প্রবণতাকে পুঁজি করেননি কবি। তিনি খুব সচেতনভাবেই, এমনকি নিজেকেও সেই দ্বিধাগ্রস্ত মানুষের সারি থেকে দায়মুক্তি না দিয়েই কবিতায় বলেছেন 'জংধরা মগজের নীলকোষে অসহ তুফান'। কর্ম আর আপ্তবাক্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আমাদের সমাজের মানুষের একটি সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। একে বড় একটি ত্রুটি হিসেবে নির্দেশ করেছেন কবি। তবে কবির 'মগজে' আত্মসমালোচনা করার শক্তি এবং নিজেকে সেই দ্বিমুখী স্বভাব থেকে মুক্ত করার সচেতন প্রয়াস আছে বলেই তাঁর চোখে ফাঁপা মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য তির্যকভাবে ধরা পড়েছে :

আমরা কবিতা লিখি 'প্রোলেটারিয়ান'।
রক্তে ও মজ্জায় শা'জাহানী স্বপ্ন।
সিখানে শিথিলবাহু জঠরে আগুন,
বনেদী মনের বনে ডানা মেলে কবুতর নাচছে।
... ...
চারপাশে অহরহ ওড়ায় অনেক ধূলি
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আরবী ঘোড়ার
জংধরা মগজের নীলকোষে অসহ তুফান।
... ...
আমাদের চেয়ারের ভেঙেছে হাতল,
কলমের মুখে মোরা জোড়া দেই ছেঁড়া সাম্রাজ্য।
কলম ধারালো তবু ধারা ছাড়া চলে না,
ওপাশের কামরায় ঘড়ির সোনার চেন করে চক্‌চক॥

আমাদের দুইমুখো মন।
একমুখে উদ্ধত বন্ধকী জীবনের সুবিপুল ঋণ।
তারিপাশে ভাঙাচোরা আধপোড়া ইঁটের গাঁথুনি
আকাশেতে সেতু বাঁধবার।

("কনফেশান", *রাত্রিশেষ*)

আর "দিনের সুর" কবিতায় কবি আসলে দশকের সময়ের যে সুর, যে চিত্র, যে অনিশ্চয়তা, যুদ্ধ-পরবর্তী ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষের মধ্যে যে দ্বিধা বিরাজমান ছিল, সেসব কথা বলতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে শঙ্কা, মানুষের ন্যূনতম চাহিদার বিপরীতে হানাহানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর সেই সুবাদে ঔপনিবেশিক শাসকদের ফায়দা লুটার সুযোগে জনমনে সৃষ্ট দুঃস্বপ্নকে কবি 'ধূম্রবরণ দগ্ধ দিন' বলতে চেয়েছেন। কারণ ক্ষুধা-দারিদ্র্যের পীড়নে সাধারণের যে অবস্থা, সেটিই মূলত কবিকে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। তাই আশাবাদী কবি হওয়া সত্ত্বেও আহসান হাবীব মাঝেমধ্যেই হতাশায় মুষড়ে পড়েছেন। নীল আকাশকে তিনি তাই 'ধুলায় ধূসর পথ' বলেছেন পরিস্থিতির তাৎক্ষণিকতায়। আর মানুষ যে সময় অতিবাহিত করেছে ওই কালপর্বে, তাকে কবি 'সময়-বাণিজ্যের' সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে এ কথা সত্য যে, তিনি কবিতায় হতাশাকে ধারণ করেন আশাবাদকে বেগবান করার মানসে। কিন্তু আলাদাভাবে এই কবিতাতে অবশ্য হতাশায় মুহ্যমান এক কবিকে দেখতে পাই আমরা। যেমন :

আকাশ এখানে নির্মম আর ধুলায় ধূসর পথ,
এখানে পীতাভ স্বাপ্নিক মনোরথ !
... ...
হেথায় শ্যামল ঘন অরণ্যে সূর্যের অভিশাপ,
পুষ্পিত শাখে জ্বলে নির্মম জঠরের উত্তাপ।
মদিরগন্ধ ঘন মৃত্তিকা তলে
নিয়ত তীক্ষ্ণ তির্যক ফলা চলে,
অতল সাগরে অলোকের সুর কভু ভোলায় না মন,
হেথায় নয়নে শুক্তি এবং স্বচ্ছ মীন-নয়ন।

এখানে মোদের প্রতি মুহূর্ত বাণিজ্যের,
এখানে মোদের রূঢ় জীবনের তিক্ত জের।
হেথা প্রয়োজন-চক্রপীড়ন বিরামহীন,

Dhaka University Institutional Repository

এই [illegible] দিন।

("দিনের সুর", *রাত্রিশেষ*)

'প্রহর' অংশে আমরা লক্ষ করেছি, কবি তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এবং তৎকালীন সমাজজীবনের নানা চিত্র কবিতার ভাষ্যে বলার চেষ্টা করেছেন। সেখানে কবি কখনো হতাশাগ্রস্ত, কখনো বা রাজনৈতিকভাবে সচেতন কিন্তু ভেতরের দ্বান্দ্বিক সংকটের কথাও প্রকাশ করেছেন কাব্যিক সুষমায়। কিন্তু এ-কাব্যের চারটি অংশের মধ্যে কলেবরে ছোট 'প্রান্তিক' অংশে আমরা দেখেছি কবি বেশ কয়েকজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবু রুশদ, কাজি আফসারউদ্দিন আহ্‌মদ। এ কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ এ অংশের "বাইশে শ্রাবণ" কবিতাকে কবির জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই বলতে হবে। কারণ রবীন্দ্রনাথের মহান কীর্তিকে শ্রদ্ধা জানানোর অভিপ্রায়ে এবং তাঁর মহাপ্রয়াণের দিনটি যে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষা মানুষের জন্য স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে, আহসান হাবীব বিনা দ্বিধায় তা অনুভব করেছিলেন। এমনকি কবিতায় তিনি বলতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগেও তো প্রতি বছরই বাইশে শ্রাবণ এসেছে, কিন্তু তার কোনোটিই স্থায়ীত্ব পায়নি। শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতকর্মের মাহাত্ম্যের কারণেই পৃথিবীতে দিনটি অমর অক্ষয় হয়ে থাকবে। অথচ ষাটের দশকে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য আহসান হাবীবকে রবীন্দ্র-বিরোধী আখ্যা দিয়ে তাঁর শ্রদ্ধাঙ্কিত রবীন্দ্রবোধকে খর্ব করার অপচেষ্টা হয়। "বাইশে শ্রাবণ" কবিতার বিষয়বস্তু কবির রাবীন্দ্র-অনুরাগের স্মারক। রবীন্দ্রনাথ যে আহসান হাবীবের মননের গভীরে স্থান করে নিয়েছিলেন, তাঁর সৃষ্টিকর্ম যে কবিকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য দিয়েছিল, কবিতাটিতে তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বর্তমান। একজন শ্রেষ্ঠ কবির মৃত্যুদিবস যে যুগ যুগ ধরে বাঙালির জাতিগত চেতনায় আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সঙ্গে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, তারই দূরদর্শন এই কবিতা। যেমন :

অনেক শ্রাবণ-দিন বহু ব্যর্থ বাইশে শ্রাবণ
রিক্ত হস্তে ফিরে গেছে; মিশে গেছে তার প্রতিক্ষণ
প্রীতিহীন মৃত্তিকায়-খ্যাতিহীন, পরিচয়হীন,
পাণ্ডুর মলিন!

... ...

তারপর একদিন অকস্মাৎ দিন এলো তার।
একটি মৃত্যুই শুধু দিলো তারে মহিমা অপার
দীর্ঘদিন পৃথিবীতে পরম গৌরব বাঁচিবারে।
একটি সে মৃত্যু এসে দিয়ে গেলো তারে
লক্ষ লক্ষ মানুষের সিক্তপক্ষ আঁখির প্রসাদ
অশ্রুসিক্ত বন্ধনের স্বাদ।

বাইশে শ্রাবণ সেই উর্ধ্বে তুলি সে মৃত্যুর মসিলিপ্ত কর
রেখে গেলো পৃথিবীতে চিরন্তন অক্ষয় স্বাক্ষর।

("বাইশে শ্রাবণ", *রাত্রিশেষ*)

এই কাব্যের দীর্ঘ কবিতাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে "অস্তপারের আকাশকে"। কবিতাটি কবি কায়কোবাদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত। কায়কোবাদের প্রতি কবি আহসান হাবীব অপরিসীম শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন নাটকীয় সংলাপ-আশ্রিত এই কবিতার মধ্য দিয়ে। কায়কোবাদকে কবি 'নতুন দিনের সূর্য' আখ্যা দিয়ে তাঁর কৃতিত্বকে উর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অবিভক্ত ভারতে বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অগ্রগণ্য বলেই হয়তো তাঁকে কবি এমন সম্বোধন করেছেন। কায়কোবাদকে পৃথিবীর ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন এক সত্তা হিসেবে তিনি অভিহিত করেছেন।

ইংরেজরা এই উপমহাদেশে পুরোপুরিভাবে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করার আগে মুসলমানদের মধ্যে সর্বশেষ শাসক ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। দেশ পরাধীন থাকলেও নবাব হিসেবে তিনি ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন। শাসক হিসেবে তিনি যেমনই হোক না কেন স্বজনদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই তাঁকে করুণ পরিণতি বরণ করে নিতে হয়েছিল। সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর প্রায় দুই শ বছর অতিক্রান্ত হচ্ছিল যে সময়টায়, বিশ শতকের সেই চল্লিশের দশক ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক—সর্বোপরি সাম্প্রদায়িকভাবেও খুব উত্তেজনাকর। আর মানবিকভাবে ওই সময়প্রবাহ কখনই সাধারণের পক্ষে ছিল না। "সেতু-শতক" কবিতায় দুই শ বছরের গ্লানি সহ্য করে যে জায়গায় এসে কবি পৌঁছেছেন, সেখানেও দেখতে পাচ্ছিলেন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল। ইংরেজ শাসনের গোটা সময় জাতি পার করেছে পরাধীনতার কালিমালিপ্ত সময়, যেখানে ছিল ইংরেজ নামক দস্যুদের 'মরণ ছোবল' আর হৃতসর্বস্ব সাধারণ মানুষ। সেই অশান্ত অবস্থা থেকে কবি ছিলেন মুক্তিপ্রত্যাশী। তিনি তাই সেই 'সতের শ সাতান্ন সনের' বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে আরো ঐক্যবদ্ধ আরো সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, যেন আর কেউ বিশ্বাস হন্তারক হয়ে জাতির কাঙ্ক্ষিত নতুন সূর্যের উদয়কে ব্যাহত না করতে পারে। কবির ভাষায় :

ঘুম নেই নয়নে আমার
এখনো নয়নে কাঁপে মীরণের তীক্ষ্ণ তলোয়ার !

দুই শতাব্দীর ঘুম কোন্ দস্যু করেছে হরণ !
কলঙ্কের কালিমায় কোন দস্যু হেনেছে মরণ !
সেই মৃত্যু দ্বারে দ্বারে হেনে অশান্ত আঘাত,
আমার মৃত্যুরে দাও জীবনের তীক্ষ্ণ প্রতিঘাত !
... ...
দ্বারপ্রান্তে তোমাদের বন্দী আমি দুই শতকের,
আমার আত্মার তলে অগ্নিশিখা সাতান্ন সনের
আজো অনির্বাণ,
তবু কি পাহারা দেবে হাসিমুখে আমার জিন্দান ?
আমার আত্মার তৃষ্ণা অগ্নিপক্ষ বিহঙ্গের মত
পক্ষবিধূননে
ছড়াবে না অগ্নিশিখা শীতল শিথিল তোমাদের
ঘুমের কাফনে ?

("সেতু-শতক", *রাত্রিশেষ*)

'প্রতিভাস' অংশের শুরুতেই ইংরেজ কবি লরেন্স বিনিয়নের কবিতার পঙ্‌ক্তি ('মস্তিষ্কের কোষে কোষে যুদ্ধ আর নির্মম বিরোধ,/ কামনার বন্যাবেগে এ যুদ্ধ নির্মম প্রতিরোধ।/ যুদ্ধ আর যুদ্ধ শুধু ক্ষীণাশ্রয়ে নেই হৃদয়ের,/ কোথাও আশ্রয় নেই পলায়নে মুক্তি নেই এর।'[৮]) উল্লেখ করেছেন আহসান হাবীব। এই পঙ্‌ক্তিগুলো 'প্রতিভাস' অংশের কবিতার শরীরে প্রোথিত বিষয়ের সঙ্গে যেমন প্রাসঙ্গিক, তেমনি ওই সময়ের সংকটের সঙ্গেও সংযুক্ত। দ্বিতীয় মহাসমরের প্রভাব স্পষ্টতই লক্ষণীয় এই অংশের কবিতায়। কোনো কিছুতেই যখন আর যুদ্ধকে এড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না, মানুষ তখন চিন্তার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সংগ্রামকে বেছে নিচ্ছিল। বাংলার অন্যতম ঋতু শরৎকে নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে কবি তাই প্রকৃতির বিদীর্ণ রূপকেই চিত্রিত করেন, যা সময়েরই প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে :

এবার শরৎ রাত্রে শ্যাম শষ্পে হানিয়া চরণ,
রক্তপায়ী প্রেতসম ক্রূর হাস্যে নাচিবে মরণ!
... ...
দশমীর শুভ্র চাঁদ চূর্ণ হবে নখরের ঘায়;
এবার চাঁদের কণা গ্যাস হ'য়ে ঝরিবে ধরায় !

Dhaka University Institutional Repository

এবার শরৎ রাত্রি স্বপ্ন নয়—এনেছে সম্ভিন
লুণ্ঠিত শীষে যে স্বপ্ন রঙিন
কেঁদে মরে—মৃত্তিকায় মিশে যায় ধীরে;
এবার শরৎ রাত্রি উদ্‌যাপিত হবে আঁখি নীরে।
("শরৎ", *রাত্রিশেষ*)

পরবর্তী কবিতা "সৈনিক"-এর বিষয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ-কবিতায় পেশাদার যুদ্ধসৈনিকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রতিনিয়ত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের তুলনা করেছেন কবি। কবি বলতে চেয়েছেন যে, জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য দু-বেলা দু-মুঠো খাওয়ার জন্য সময় ও শ্রম বিক্রি করছে যেসব মানুষ, তারাও যোদ্ধা—জীবনযোদ্ধা। এই যুদ্ধকে সংগ্রামক্ষেত্রের যুদ্ধের চেয়ে কোনোভাবেই ছোট করে দেখেননি কবি। বরং সামরিক যুদ্ধের ফলে বিরূপ প্রভাবে আক্রান্ত বসামরিক-হতদরিদ্র শ্রম-নির্ভর মানুষের জীবনযুদ্ধকে কবি অনেক গুরুত্বের সঙ্গে তুলে এনেছেন তাঁর কবিতায়। পুরো কবিতায় শ্রম-নির্ভর মানুষের সময়বাঁধা জীবনসংগ্রামকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে গেঁথেছেন কবি। কবির চোখে তারা জীবনযুদ্ধের সৈনিক। মহাসমরের প্রভাব কীভাবে মানবতাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, তা এ কবিতায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কবির ভাষায় :

তবুও সৈনিক মোরা, নিরস্ত্র নির্বেদ তাই
আমাদের অপূর্ব লড়াই !
হাওয়াই জাহাজ চ'ড়ে তোমরা আকাশ ওড়ো
শত্রুর জাহাজ করো জয় ;
আমরা সিঁড়ির নীচে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে শুনি
নিরাপদ ধ্বনির সময় !
("সৈনিক", *রাত্রিশেষ*)

ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-গ্রাম, নিজের সাজানো বাগান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিছুই নেই আর আগের মতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর বদল হয়েছে। প্রায় কিশোর বয়সে যে গ্রাম ছেড়ে তিনি কবি হওয়ার বাসনায় ঠাঁই নিয়েছিলেন কলকাতা মহানগরে, বদলে গেছে সেই গ্রামের প্রকৃতিও। যখন ফিরেছেন, তখন বদলে গেছে অনেককিছু। পরিবর্তিত হয়েছেন নিজে এবং তাঁর স্মৃতিবিজড়িত নদী-পথ-ঘাট কিংবা স্মরণীয় স্থানগুলো—যেগুলো হয়তো কবিপ্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে অবদান রেখেছে, পরিবর্তিত হয়েছে সেগুলোও। আহসান হাবীবের কবিতার একটি বড় বিষয়জুড়ে স্থান করে নিয়েছে যে নস্টালজিক চেতনা, তার সূত্রপাত ঘটে "একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ" কবিতার মধ্য দিয়ে। বাল্যকাল অতিবাহিত হওয়ার পরপরই যে গ্রামীণ নিসর্গ রেখে গিয়েছিলেন তিনি, ফিরে এসে দেখেন কিছুই যেন নেই আর আগের মতো—স্থান আছে, স্থাপত্য যেন নেই। ভুলে যান না কবি 'কাজেম বয়াতী' ও তাঁর 'দীঘির পাশে ঐ ছোট' ঘরের ঠিকানা। কাজেম বয়াতী আছেন কিন্তু নেই তাঁর কণ্ঠে মন-ভোলানো সেই সুর। কর্মহীন মৌসুমে গ্রামীণ জনপদে—কৃষক-গৃহস্থ মিলে চাঁদনি রাতে উঠোনে উঠোনে পালা গান কিংবা গাজীর গানের আসর বসত। কবি শিশুবেলায় দেখেছেন, তাঁদের গ্রামে বসত 'ছয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল'-এর কাহিনী নিয়ে গানের আসর। এত সব প্রাণ-জাগানিয়া উপকরণ ফেলে গিয়েছেন যে কবি, তিনি ফিরে এসে দেখেন, ' ঐযে টিনের ছাওয়া আটচালা ঘর/ দফাদার বাড়ি।/ ও বাড়ির বিরাট উঠানে/ বিরাট জামাতে এসে দেখা দিয়ে যেত/ 'ছয়ফুলমুলুক' আর 'বদিউজ্জামাল'/ বহুরাতে।/ সে উঠান আজকে নীরব!' ("একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ", *রাত্রিশেষ*)। তাই এই কবিতায় তাঁকে আমরা স্মৃতিকাতর হতে দেখি। কলকাতায় যাওয়া থেকে শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়কালকেই কবি আসলে 'ঐতিহাসিক ভ্রমণ' বলতে চেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতায় যাওয়া এবং দীর্ঘদিন পর ফিরে তাঁর যে গ্রামদর্শন—এই সময়ের মধ্যে দেশকালের ভেতরে-বাইরে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক, যার প্রভাব সরাসরি পড়েছে জনমানসে—জনপদে। কবির কবিতার গ্রাম যেন কবির নিজের গ্রাম শুধু নয় বরং তা সারা বাংলাদেশের গ্রাম হয়ে কবিতায় চিত্রিত হয়েছে। সেই গ্রাম ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়েছে মানুষেরই কারণে, সেই সঙ্গে হারাচ্ছে নানা ঐতিহ্য। তাই ব্যথিত কবি-হৃদয়ের উচ্চারণ :

রাতের আকাশে আজ
কাঁপে না বাঁশীর ভাটিয়ালী।
নারিকেল সুপারীর বনে
অন্ধকার থম থম করে,
... ...
ভয়ে ভয়ে একান্ত গোপনে
দিনান্তে ঘরের কোণে তারা
অন্ধকারে করে অনুভব
বেঁচে আছে আজো।

অনেক মানুষ ছিলো মরেছে অনেক।
সেই সাথে মরে গেছে তারো চেয়ে বেশি—

শতাব্দীর গ'ড়ে ওঠা এইসব গ্রাম।

("একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ", *রাত্রিশেষ*)

কাব্যের এ অংশের সবচেয়ে প্রতিবাদী কবিতা "কয়েদী"। এখানে প্রতীকার্থে পরাধীন দেশের বাসিন্দা হিসেবে কবি নিজেদের 'কয়েদী' বলে অভিহিত করেছেন। ক্রমাগত মৃত্যু-নির্যাতন-নির্মমতা সত্ত্বেও কবি স্বপ্ন দেখেছেন মুক্তির। চিরকাল যে একটা জাতিকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা যায় না, তারই স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন কবি তাঁর স্বভাবজাত ভঙ্গিমায় অর্থাৎ প্রতীকে-ইঙ্গিতে। ব্রিটিশ শাসনের সূর্যাস্ত আর নিজেদের অনাগত নতুন সূর্যের প্রত্যাশায় কবি এই কবিতার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ-আশাবাদ আর রাজনীতি সচেতনতার প্রকাশ ঘটিয়ে স্বপ্নের কথা বলে 'প্রতিভাসের' সমাপ্তি টানেন :

বিগত দিনের মৃত্যু আজো দেখি বহ্নিমান
আমাদের ক্ষুব্ধ চেতনায়,
অসংখ্য মমীর কান্না আমাদের মনের গুহায়।
যত রক্ত ঝরেছে মাটিতে
চিহ্ন তার র'য়ে গেছে আমাদের ক্লান্ত করোটিতে !
... ...
আছে শুধু হাতের মশাল
আছে এই নগ্ন শির বিবর্ণ উলঙ্গ এই ভাল !
আমাদের রক্তে আছে পাদপিষ্ট রক্তের ছোঁয়াচ !
আমাদের অস্থি ঘিরে আছে এক নতুনের ছাঁচ

আছে সেই অনাগত দিন
হাতে আছে সেই সূর্য-পরিক্রমা স্বপ্ন রঙিন।

("কয়েদী", *রাত্রিশেষ*)

কবি এখানে ক্রমশ অগ্রসর হয়েছেন দীর্ঘ সময়ের রাত্রিকালীন আঁধারকে ঘুচিয়ে আলোর সন্ধান করার জন্য। মূলত রাত্রিশেষের যে আলো, যে আলোয় দিনের সূত্রপাত ঘটে—পরাধীনতার অন্ধকার আর তার কালিমালিপ্ত গ্লানিকে পশ্চাতে ঠেলে তিনি সেই আলোকিত পৃথিবীর স্বপ্নে বিভোর। মাঝেমধ্যে হতাশাগ্রস্ত হলেও কবির আশাবাদ কখনো ম্লান হয়ে যায়নি। বরং সব মিলিয়ে তিনি কবিতার শরীরে আশার বাণীকেই সঞ্চার করেছেন। কবিতার শেষাংশে পৌঁছে তিনি যখন বলেন, 'অসংখ্য মমীর কান্না আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

মনের গুহায়' এবং 'আমাদের আছি ঘিরে আছে এক নতুনের ছাঁচ', তখন উত্তরপর্বের *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*-এর দূরস্থিত আবির্ভাবের সংকেতটি তিনি যেন এঁকে রেখে যান। এ-কাব্যের 'পদক্ষেপ' অংশের শুরু থেকেই কবি-সংজ্ঞায়িত রাত্রি শেষ হওয়ার ইঙ্গিত আমরা তীব্রভাবে অনুভব করি। এমনকি ঔপনিবেশিক শাসন শেষে একটি নির্দিষ্ট দিনক্ষণের জন্যও যে কবি অপেক্ষা করছিলেন, যে দিনটি চূড়ান্ত বিজয়ের দিন অর্থাৎ স্বাধীনতার দিন, তা-ও বোঝা যায় "ঝরা পলাশ" কবিতায়। কবিভাষ্যে বোঝা যায়, কবির সেই কাঙ্ক্ষিত দিন আসন্ন।

এই নিয়ে বারবার নতুন দিনের বাসনায়
বেঁধেছি অনেক বাসা মৃত্যুমুখী দিনের সীমায়।

এবার আবার সেই দিন!
সেই ঝরা পলাশের দিন!

... ...
যে পলাশ ঝ'রে গেছে আজ তার প্রতিটি পল্লব
শাণিত খড়্গের মত হানে যদি বাসনার শব
অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস ছিন্ন ক'রে যদি নেয় ভার
ইস্পাত-কঠিন এক দিন রচনার—
সে কি ভালো নয়,
হে হৃদয়, হে মোর হৃদয়?
("ঝরা পলাশ", *রাত্রিশেষ*)

আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, কবি ব্রিটিশ শাসনের শেষ দেখে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর সেই বিষয় নিয়েই তিনি শিল্পিত কবিতা নির্মাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ সম্পর্কে আহমদ রফিকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'এই ছাপ শিল্পীমানসে বহন করে আহসান হাবীবের কবিকর্মের যাত্রা শুরু। তার কাব্যসৃষ্টির পশ্চাদপটে ইতিহাস চেতনার কুঁড়ি কেবল চোখ মেলতে শুরু করছে। এই নতুনতর চেতনার রাগে আরক্ত মন নিয়ে কবি নবসৃষ্টির আয়োজন বরণ করে নিতে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।'[৯] "প্রদক্ষিণ" কবিতার নামের ভেতরেই আছে ইতিহাসের মহাসড়কে পিপাসু-দৃষ্টি নিয়ে প্রদক্ষিণ করার একটা অকৃত্রিম প্রয়াস। যে কোনো কবির ক্ষেত্রেই ইতিহাসের চেতনাকে ধারণ করে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় লীন হওয়া মানেই কবিতা নতুন মাত্রায় ত্বরান্বিত হওয়া। আহসান হাবীবের ইতিহাস চেতনামূলক একটি অনন্য কবিতা "প্রদক্ষিণ"। এখানে আমরা লক্ষ করি যে, যুগ যুগ ধরে নানা দেশের নানা শাসকের অধীনে থাকা এই দেশের মানুষ কোনো কোনো ভিন দেশী শাসকের সময়পর্বে হয়তো সুহালেই ছিল, কেউ কেউ যে 'ভালোবেসেছিল' এ অঞ্চলের মানুষকে। এমনকি তাঁদের কারো কারো সময় দেশ-সমাজ ছিল সুখ-সমৃদ্ধিময়, সে বিষয়টিও কবির চেতনা এড়িয়ে যায়নি। যেমন :

এখানে সমুদ্র ছিল
ছায়া ছিল দূর বনানীর।
কোনো এক আরণ্য রাত্রির
তীর ঘেঁষে কারা এসেছিলো,
বন্যার আবেগ নিয়ে কারা যেন ভালোবেসেছিলো।

... ...
আজ তারা নেই।
তারা আসে তারা ভালোবাসে,
আজ শুধু মনে পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

একদিন এসেছিলো কারা।

উন্মুক্ত হৃদয়ে,

দিগন্ত উধাও এক পাখির চঞ্চল ডানা ল'য়ে।

("প্রদক্ষিণ", *রাত্রিশেষ*)

অথচ কবি যে সময়ের মানুষ, সে সময় যারা ছিল শাসন করেছে এই অঞ্চলকে, তাদের কর্মকাণ্ড ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক। যেন সব কীর্তিই হারিয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল সমকালের শাসকদের অমানবিক আর মনুষ্য-হৃদয়বর্জিত শাসনকৌশলে। কবির সেই সময়টা ছিল বড়ই অসহনীয়—আঁধার-কবলিত রাত্রির মতো। তাই আজ যারা আছে, তাদের স্বরূপ কবিতায় প্রকাশ করেছেন কবি।

আজ তারা নেই, আজ আছে

তাদের বিকৃত সুর হৃদয়ের আনাচে-কানাচে।

আছে এই মন

আর আছে দুর্বিষহ অতীত স্মরণ।

ছিন্ন পালকের ছায়া দেখা দেয় কখনো আকাশে,

তার পাশে রৌদ্র-পীত পৃথিবীর ঘাসে
বিকেলে সোনারাঙা পলাতক রোদেরা মিলায়
ভেঙে পড়া আকাশের গায়।

("প্রদক্ষিণ", *রাত্রিশেষ*)

ইতোমধ্যে আমরা লক্ষ করেছি যে আহসান হাবীব ইতিহাস-ঐতিহ্যচেতনায় সচেতনভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন। আর রাজনৈতিক চেতনা তাঁর কবিতায় শুরু থেকেই শৈল্পিক ধারায় বহমান। এ কাব্যের শেষ অংশ 'পদক্ষেপে' এই প্রবণতাগুলো আরো বেশি লক্ষণীয়। যেমন "হে আকাশ হে অরণ্য" ও "হে বাঁশরী অসি হও" নামে পরপর দুটি কবিতায় একদিকে কবি এই অঞ্চলের সুখ-সমৃদ্ধিময় দিনকালের কথা স্মরণ করেছেন, অন্যদিকে প্রতীকী অর্থে সুরেলা বাঁশিকেই 'অসি' বা হাতিয়ার করে শত্রুকে মোকাবিলা করে অধিকার আদায়ের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রথম কবিতাটিতে তিনি মূলত পুরোনো দিনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। সমৃদ্ধ স্মৃতির সেসব দিন বাস্তবে না আসুক, অন্তত তার 'ছায়া' যেন আসে মর্ত্যলোকে। পরের কবিতায় বাঁশরিকে কবি 'অসি' হতে বলেছেন, সেই বাঁশি যেন কৃষ্ণের বাঁশির সমান তুল্য। কিন্তু তার সুর যত মধুর আর উপভোগ্যই হোক কেন, সমকালের পরিস্থিতিতে সেই বাঁশি সুরের ধারক হওয়ার বদলে বরং প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার হাতিয়ার হোক, কবির সেটাই একান্ত কাম্য। অসিকেই কবির যেন বেশি পছন্দ। তিনি মনে করেন সুরের মূর্ছনা আর নয় বরং এবার প্রয়োজন মানুষের বজ্রকঠিন হওয়া।

আমরা জানি, দ্বিতীয় মহাসমরোত্তর বৈদেশিক-দৈশিক অবস্থা এতই নাজুক হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষ অস্তিত্বে সংকটের ভুগছিল। তারা ওই সময় যেন মহাসমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচার শেষ চেষ্টা করছিল। পঞ্চাশের (১৩৫০) মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়া বাঁচার সেই প্রয়াসকে আরো কণ্টকাকীর্ণ করে তুলেছিল। 'কবিরাও এই পারিপার্শ্বিকতার উদ্‌ভ্রান্ত শিকারে পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। চারদিকের বিপন্ন মানবাত্মার হাহুতাশে আবহাওয়া ও পরিবেশ যেভাবে বিষময় হয়ে উঠেছিলো, সেখানে একজন কবির কাছে আশার আলো কামনা করা ছিলো নিরর্থক ও কবির কল্পনা। বাস্তবতার রূঢ় আঘাতে জীবন যেখানে নিঃশেষিত, সেখানে কবি কল্পনায় বাস্তবতা প্রকাশ করা মানবাত্মাকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কালো হাতকে প্রসারিত করে দিয়েছে, মন্বন্তর সৃষ্টি করে যে পুঁজিবাদ সাধারণ মানুষের অস্থিমজ্জা গ্রাস করেছে'[১০], সেখানে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

উদরের ক্ষুধা, পরাধীনতার তীব্র গ্লানি, সাম্প্রদায়িক উসকানিতে সৃষ্ট শঙ্কা সচেতন জনমনে 'তুষের আগুন' জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই আগুনে জ্বলেছিলেন কবি আহসান হাবীবও। এই 'আগুন' মূলত পরাধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির আকাঙ্ক্ষার আগুন—অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের আগুন। এই আগুনকে তাই ধ্বংসাত্মক বলে যাবে না। কেননা, সবকিছু পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত এই আগুন হানা দেবে রাজাসনে, সেটাই কবির প্রত্যাশা :

অরণ্যে আগুন জ্বলে, সে আগুন প্রান্তরে ছড়ায়।
আকাশ-সীমান্ত থেকে ভেসে আসা বেনামী হাওয়ায়
সে আগুন ঝরে অবিরাম,
সে আগুনে পৃথিবী নগরী ও গ্রাম
এক সাথে জ্বলে,
সে আগুন ধূমায়িত পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড তলে!
... ...
সে আগুন ক্ষণজীবী নয়,
সে আগুন ক্ষমাশীল নয়।

("আগুন", *রাত্রিশেষ*)

মূলত জনমনে ছড়ানো অবশেষে আগুনই দখলকারীদের বিতাড়িত হতে বাধ্য করে। আহসান হাবীব যেন ভবিষ্যদ্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বলেন :

নতুন আগুন জ্ব'লে সে আগুন ধূলিময় রথে,
আলো দেয় কোনো এক নামজানা পথে।
ঘরে ঘরে সে আগুন নিমন্ত্রণ রেখে যায় তার,
একদিন পথে আসে আগ্নেয় জোয়ার,
তারপর পথের সীমায়
সে আগুন হানা দেয় সিংহ দরোজায়!

("আগুন", *রাত্রিশেষ*)

আহসান হাবীবের সংগ্রামীচেতনা ক্রমান্বয়ে দৃঢ় ও স্পষ্ট হয়েছে তাঁর কবিচেতনার মধ্য দিয়ে। এ-কাব্যের শুরুতে যার আভাস ছিল, শেষের দিকে তারই স্পষ্ট বিন্যাস আমরা লক্ষ করি। "স্বাক্ষর" কবিতার শব্দবিন্যাসে তিনি সরাসরি বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত ধরে বন্ধুর পথের সঙ্গী হতে চেয়েছেন। কবি একপর্যায়ে এসে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন, রাজপথের জীবনবাজি রাখা ছাড়া প্রকৃত অধিকার আদায় করা অসম্ভব। তাই এতদিন যে পথে সরাসরি অংশ নেওয়ার প্রতি তাঁর অনীহা ছিল, সে পথকেই তিনি সর্বশেষ এবং সর্বোত্তম মনে করেছেন। যারা জীবনের বিনিময়ে হলেও নতুন জীবনপ্রত্যাশী, "স্বাক্ষর" কবিতায় কবি তাদেরই দলভুক্ত হতে চেয়েছেন। এর জন্য ব্যক্তিজীবনের স্বপ্নগাঁথাকে তিনি ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। অবিচ্ছিন্নভাবে 'সংগ্রামের রাজপথে হাতে হাত রেখে' আমৃত্যু তাদেরই শামিল হয়ে থাকতে চেয়েছেন কবি। বলেছেন তিনি: 'প্রতিজ্ঞা আমার—/ মুমূর্ষু মানুষে ডেকে জীবনের নতুন আহ্বান জানাবার।/ আমার কণ্ঠস্বর সেথা নিত্য উচ্চতর হবে,/ আমৃত্যু এ হাতখানি তোমাদের হাতে হাতে রবে।' ("স্বাক্ষর", *রাত্রিশেষ*) মানবতার স্বার্থে, দেশের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকারের পথে গিয়ে যদি মৃত্যুও হয়, সে মৃত্যু রেখে যায় অনেক প্রাপ্তির স্বাক্ষর আর প্রেরণার চিহ্ন। এই মৃত্যু যেন মৃত্যু নয়, বরং অগণিত প্রাণের প্রবাহে সঞ্জীবতার আবাহন। এমনকি মৃত্যু যে অথর্ব

Dhaka University Institutional Repository
জীবনের গায়ে আঘাত করে সংঘবদ্ধ জীবনকে করে বেগবান, সে কথাও কবি বলে গিয়েছেন "মৃত্যু" কবিতায়। "স্বাক্ষর" কবিতার সংযোজিত রূপ বা পরিণতির কথা ব্যক্ত করেছেন এই কবিতায়: 'এই মৃত্যু পথে পথে রেখে যায় মৃত্যুহীন নাম,/ এই মৃত্যু রেখে যায় মুক্তপ্রাণ কঠিন সংগ্রাম/ সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের। ("মৃত্যু", *রক্তিশেষ*)

অবিভক্ত ভারতের সাধারণ মানুষের ওপর চেপে বসা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা একপর্যায়ে এ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন মানুষের সচেতন প্রতিরোধের কারণে। কবি আহসান হাবীব তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবিমনের গভীর অভিনিবেশে। প্রতি মুহূর্তে তাঁদের হাত থেকে কবি দেশের মানুষের মুক্তি কামনা করেছেন। কবিতায় তার সফল সংযুক্তি আমরা লক্ষ করি। হতাশা-আশা আর অনুপ্রেরণার যৌথ মিশেলে দেশ-সমাজ আর জনসচেতনতাই শুরু থেকে তাঁর কবিতার বিষয় হিসেবে শিল্পিত হয়ে উঠেছে। ক্রমান্বয়ে তিনি প্রতিবাদী হয়েছেন। এমনকি মাঝে-মধ্যে নিপীড়িত মানুষের কাতারে নিজেকে স্থাপন করেছেন। আর কখনো কখনো রাজপথের কর্মীদের সঙ্গে নিজেকে একাকার করে উপস্থাপন করেছেন। তবে এ-কাব্যের নাম কবিতাটি যে ২০০ বছরের ইংরেজ শাসনের অবসানের ইঙ্গিতবহ, তাতে কোনো সংশয় নেই। কবিতাটির মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন পরাধীনতার সমাপ্তি আসন্ন। আর তারই প্রতীকায়িত রূপ তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর কল্পিত একটি রোডে রাতে জ্বালানো কৃত্রিম আলোর ফিকে দৃশ্যের চিত্র সৃজনে আর প্রভাতের আসন্ন অকৃত্রিম আলোর আবাহনের মধ্য দিয়ে। এই আলো হচ্ছে সার্বিকভাবে অধিকার-চেতন সাধারণ মানুষের আশাবাদী হয়ে ওঠার প্রতীক আর "রেড্ রোডে রাত্রিশেষ" হচ্ছে দীর্ঘ রজনীর অবসান। সম্পূর্ণ ব্রিটিশ শাসনের সময়কালকে তিনি রাত্রির সঙ্গে তুলনা করে তাদের শাসন-শোষণের অবসানকে রাত্রিশেষ বলেছেন। আর 'রেড্ রোড'কে তিনি গোটা ভারতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জাতির সামনে যে অন্ধকার ছিল এত দিন, কবি সেখান থেকে আলোর পথে যাত্রা শুরু করতে চান।

এই দীর্ঘ 'রেড্ রোড'কে কবি গোটা ভারতের ব্যাপ্তির প্রতীকে নির্দেশ করেছেন। যেমন দীর্ঘ সময় ধরে জেঁকে বসা ঔপনিবেশিক শাসনকে তিনি দীর্ঘকায় সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যার চলৎশক্তি কম বলে স্থবির হয়ে পড়ে থাকে শুধু। ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘকালকে তিনি অবিভক্ত দেশের জন্য স্থবিরতা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কবির ভাষায় :

এখানে এই বিশাল পথ জড়িয়ে
অন্ধকার প'ড়ে আছে
দীর্ঘকায় সাপের মত।
আর আছে রেড্ রোডের দু'পাশে
তীক্ষ্ণ চোখ জ্বালিয়ে
অন্ধকার শয়তানের পাহারা
তারা এখন মুমূর্ষু।

("রেড্ রোডে রাত্রিশেষ", *রাত্রিশেষ*)

ব্রিটিশ শাসনের সময়কালকে কবি এই কবিতায় 'দৈত্যকায়' অজগরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চল্লিশের দশকে মাঝামাঝি দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হওয়ার পর রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি পরিণত রূপ যখন আভাসিত হয়ে উঠছিল, তখন শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার মসনদও নড়েচড়ে উঠেছিল স্বভাবতই। কবি তাই সময়-সংক্রান্তিকে বিষক্রিয়ার অত্যাসন্ন অবসান হিসেবেই কল্পনা বরেছেন:

এখন সাপের দেহ নড়বে
তারপর আকাশ থেকে ঝরবে
তীক্ষ্ণ তির্যক বর্শা–
আর উড়বে অনেক দূরে

Dhaka University Institutional Repository

ছিন্ন ভিন্ন কালো সাপের দেহাংশ,
মিলিয়ে যাবে রেড্ রোডের বুক থেকে,
এগিয়ে যাবে কেল্লার মাঠ পেরিয়ে
তারপর আরো এগোবে।
গঙ্গার গভীর জলে ঘুচবে কি তার লজ্জা!

("রেড্ রোডে রাত্রিশেষ", *রাত্রিশেষ*)

কবি প্রতীকী অর্থে কিংবা স্থানিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে 'গঙ্গা'র কথা বলেছেন। বলেছেন সেই জলে 'ঝলকে উঠবে' মানুষের মুক্তি। এর পরই জাতির ভাগ্যাকাশে উদয় ঘটবে নতুন সূর্যের। যে সূর্যের আলোয় মুক্তির স্বাদ নেবে সর্বস্তরের জনসাধারণ। তবে এই স্বাধীনতার সূর্যটি ভারতের, না পাকিস্তানের জন্য—তার কোনো ইঙ্গিত কবি আমাদের দেননি। মূলত তিনি মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন—মানুষের মুক্তি চেয়েছেন দীর্ঘকায় সাপের হাত থেকে। আর সে জন্যই হয়তো স্পষ্ট কোনো দেশের চেয়ে মানবতার মুক্তিই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে :

এরা সেই আপনি গড়া খেয়া নৌকোয় হয়তো—
পেরিয়ে যাবে গঙ্গা
মিলিয়ে যাবে পশ্চিম সীমান্তে,
নদীর জলে ঝলকে উঠবে মুক্তি,
বন্যা আসবে রেড্ রোডের প্রান্তে
কেন না
এদিকে আবার জাগবে নতুন সূর্য!

("রেড্ রোডে রাত্রিশেষ", *রাত্রিশেষ*)

রাত্রিশেষ-এর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে আমরা দেখি যে 'রাত্রিশেষ'—এই পদবন্ধকে কেন্দ্র করেই মূলত গোটা কাব্যে সমাজ ও মানুষের প্রতি কবির দায়বদ্ধতা, নিঃস্ব মানুষকে নিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি পরিস্ফুট হয়েছে। 'রাত্রিশেষ' বলতে কবি মূলত একদিকে দ্বিতীয় মহাসমরে মানবতার বিপর্যয়ের সমাপ্তি, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানকে সংকেতিত করেছেন। আবার একই সঙ্গে নতুন রাষ্ট্রসম্ভবের আগাম-বার্তাকেও ইঙ্গিতময় করে প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তুষার দাশের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন :

> নতুন দিনের কামনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে এই কবিতা। এখানে ত্রিশোত্তর কবিতার হতাশা-গ্লানি থেকেই শুধু কবিতার উত্তরণ ঘটিয়েছেন কবি, এমন নয়—নিজের চেতনালোকের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হতে হতে নৈরাশ্য ও নৈরাজ্য এক প্রত্যয়ময়, দীপ্র, দীপ্ত সদর্থে উন্নীত হয়েছে—এ কথা বলা বোধ করি অসঙ্গত হবে না। এই আশাময়তায় পৌঁছাতে কবিকে খুব বেশি সময় নিতে হয়নি—এর কারণ একটিই—সমাজসম্পৃক্তির কারণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিশাল প্রাণস্পন্দনের অন্তর্শক্তিটি তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। আর কোলকাতার জীবনে তাঁকে কম সংগ্রাম করতে হয়নি বেঁচে থাকার জন্যে—সেটিও তাঁকে শক্তি যুগিয়েছিল সন্দেহ নেই।[১১]

কেননা, নতুনের প্রতিষ্ঠা মানেই পুরোনো ও জরাজীর্ণের সমাপন। তবে নতুন সেই রাষ্ট্রের জন্মবার্তাটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত, না সংখ্যাগুরু মুসলমান-অধ্যুষিত পাকিস্তানের, তেমন পক্ষপাতিত্ব কবিতার মধ্যে স্পষ্ট করেননি কবি আহসান হাবীব। তবে যা-ই হোক না কেন, এই অপেক্ষা আর এই রাত্রিশেষের অর্থ যে কবির জন্ম-দেশের আকাশে উদিত সূর্যের প্রভাতবেলার স্বাধীন আলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ দেশভাগের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও, এই কাব্যের জন্মসময়পর্বে রাজনৈতিকভাবে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের নেতিবাচক অবস্থা থেকে সামাজিকভাবে উত্তরণের পথ খুঁজছিল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

Dhaka University Institutional Repository

দুই

রাত্রি শেষ অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ার পর কবি আজন্মলালিত জন্মভূমিতে সশরীরে তো বটেই, ফিরে এসেছেন পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়েও। যে স্বপ্নের বাস্তবায়নে রাত্রি শেষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন কবি, সেটি ততদিনে রাজনৈতিকাভাবে বা কাগজে-কলমে অর্জিত হয়েছে। কিন্তু ঠিক কতটা রাত্রি শেষ হয়েছিল সাতচল্লিশ-উত্তর দেশবিভাগের ফলে, সেটা অবশ্য প্রশ্নবিদ্ধই রয়ে গেছে। তবে মানুষের নাভিশ্বাস ওঠা সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার জন্য কবির সামনে কোনো বিকল্পও ছিল না। কেননা, শোষণমুক্ত সমাজে মানবিকতার জয়গান নিত্য সুর তুলবে, তেমন সমাজই আহসান হাবীব চেয়েছিলেন। কবির সেই কাঙ্ক্ষিত রাত্রির শেষ তাঁর জীবদ্দশাতেও হয়নি, তবে আজীবন তিনি ছিলেন এই স্বপ্নচারিতার বিনম্র সাধক। তাঁর আশা ছিল, অপেক্ষার প্রহর শেষে কবির স্ব-আকাশে একদিন স্বাধীন সূর্যের আলোর প্রতিফলন ঘটবেই। কবি অপেক্ষায় ছিলেন নিজ দেশের মাটির সুবাসিত ঘ্রাণ আর তাজা বাতাস উপভোগের জন্য। যাঁকে তিনি 'মা'-এর মতো, প্রেয়সীর মতোই ভালোবাসতেন। এই দেশকে 'মা' বলার স্বাধীনতা, দেশকে প্রেয়সী বলে সম্বোধন করার অধিকার কবির ছিল না। সেটিই আমরা লক্ষ করি তাঁর *ছায়া হরিণ* কাব্যের শুরুতে। এ-কাব্যের বিষয়বস্তু মূলত দেশকে নিয়েই আবর্তিত হয়েছে। দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর দেশের প্রতি কবির যে অনুভূতি, তা যেমন এতে নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে, তেমনি প্রকৃতি থেকে শুরু করে আরো অনেককিছু বদলে যাওয়ার প্রক্রিয়াও তিনি কবিতার বিষয় হিসেবে তুলে এনেছেন। এমনকি মাঝে-মধ্যে কবি শ্লেষ ও ব্যঙ্গের ব্যবহার করেছেন স্বপ্নভঙ্গের কথা তুলে ধরার কৌশল হিসেবে। এক পরাধীনতা থেকে যে আরেক অধীনতার মধ্যে পড়েছে কঠিন রাত্রিশেষ হওয়া দেশ, তা-ও কবির মানসে অকৃত্রিমভাবে প্রভাব ফেলেছে।

এই দেশের প্রতি কবির যে ভালোবাসা তার অনন্যসুন্দর প্রকাশ "তোমাতে অমর আমি" শীর্ষক কবিতা। নিজের অস্তিত্ব আর দেশের সার্বভৌমত্ব যেন একাকার হয়ে গেছে এ কবিতার পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে :

একদা মায়ের মুখের সেই তৃষ্ণার আঁধার
অতঃপর আলো হয়ে আমার অধরে
রেখেছে চুম্বন; আমি মা বলে ডেকেছি মাকে।
আমি তোমাকে পেয়েছি আর মাকেও পেয়েছি।
... ...
মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই
দেশকে আমি ভালোবাসি সে কথা সে সোনার দেশের
আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে।
লিখেছি আপন মনে একা আমি আমার দিনের
সারা পথে: মাকে আর প্রেয়সীকে আর এই দেশকে
আমি ভালোবাসি এই ছোট কথাটি প্রত্যহ
নানা রঙে
এঁকেছি তোমার বিচিত্র রঙের তুলি হাতে নিয়ে।
... ...
জীবন মুকুর তুমি
কেননা তুমিই এ আত্মার পিপাসার বাণীরূপ
এবং তুমিই
মায়ের মুখের কথা প্রেয়সীর কবিতা।

Dhaka University Institutional Repository

("তোমাতে অমর আমি", *ছায়া হরিণ*)

সর্বশেষ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য করতে এসে ভারতীয় উপমহাদেশকে প্রায় ২০০ বছর পরাধীনতার নতুন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে। আর নানা আন্দোলন, দাবি ও ঘটনার মধ্য দিয়ে সাতচল্লিশে যে স্বাধীনতা বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান লাভ করে, তা ছিল কার্যত বায়বীয় বা ফানুশ-সদৃশ। *ছায়া হরিণ* (১৯৬২) কাব্যটি প্রকাশকালে তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল এ-অঞ্চলে, তাতেই কবি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর কাব্যিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন "ক্রান্তিকাল" কবিতায়। এর চেয়ে শ্লেষাত্মক চাবুক দিয়ে আর স্বদেশের বুকে আঘাত করেননি এই অভিমানী কবি। অভিনিবেশী পাঠকমাত্র কবিতাটি পাঠের পর এর রচনাকাল যেমন বুঝতে পারেন, তেমনি তাঁদের নিশ্চিত করে বলতেও দ্বিধা হয় না যে মানবতা বিপর্যয়কারী মহাসমর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দেশভাগ আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী কবি আহসান হাবীব হয়তো বানিকটা অতিষ্ঠ হয়েই তাঁর প্রিয় দেশটাকে গণিকার সঙ্গে, বহুভোগ্যা রমণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। বহুভোগ্যা নারীর প্রতীকে কবি মূলত বহু জাতি-গোষ্ঠী কর্তৃক শোষিত এই দেশের তৎকালীন সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। আসলে অন্যান্য অনেকের মতো কবিও ব্রিটিশশাসন থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন।

তবে বাংলাদেশের মানুষের ওপর নতুন প্রভু হিসেবে আবির্ভূত পাকিস্তানের অযৌক্তিক ও আগ্রাসী আচরণে কবির যে আশাভঙ্গ হয়েছিল, তা স্পষ্টই বোঝা যায় ওই সংকটকালকে ধারণ করা "ক্রান্তিকাল" নামক শাব্দিক কুশলতার মধ্যে। কবি স্বপ্নভঙ্গের সেই বেদনাকে কাব্যপ্রতিমায় ফুটিয়ে তুলতে তাঁর মাতৃভূমির প্রতিটি কণাকে বহু-ব্যবহৃত বণিকের পণ্যের সঙ্গে তুলনা করতেও পিছপা হননি। শাসনের নামে, স্বাধীনতার নামে সত্যি সত্যিই বাংলাদেশটাকে যে ধর্ষকামের সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই ভাবা হয়নি, কবি সেই খেদোক্তিই ব্যক্ত করেছেন এই কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলোর মধ্য দিয়ে। অথচ প্রচণ্ড উর্বরা জমিবিশিষ্ট এই দেশকে যেন তারা তাদের নায়িকা বা কাঙ্ক্ষিত নারীর মতো মনে করেছিল। কিন্তু সর্বস্ব লুটেই তাদের প্রশান্তি। কবির ভাষায় :

মধ্যরাতে রাজপথে দেখি এক নারীর শরীর—
যে নারী নায়িকা ছিলো কোনোকালে এই পৃথিবীর।

সর্বাঙ্গ পুড়েছে তার বণিকের তৃষ্ণার উত্তাপ,
হৃদয়ের রক্ত নিয়ে রেখে গেছে নখরের ছাপ;
দেখে মনে হয়
বহুভোগ্যা এই নারী,
এ হৃদয় সে হৃদয় নয়।

একদিন এই নারী ইতিহাস-বিন্যাসের ভার
নিয়েছিল নিজ দেহে,
পৃথিবীর সঙ্গীত-সভার
যে নারী সম্রাজ্ঞী ছিলো,
অন্ধকার রাত্রির প্রহরে
আজ দেখি সেই নারী রাজপথে আর্তনাদ করে।

("ক্রান্তিকাল", *ছায়া হরিণ*)

আহসান হাবীবের কবিতার সৌন্দর্যের অন্যতম দিক হলো নিসর্গের প্রতি তাঁর সাবলীল আকর্ষণ। তিনি মূলত নিসর্গপ্রবণ হয়ে উঠেছেন *ছায়া হরিণ*-এর মধ্য দিয়ে। গ্রামীণ নিসর্গের অকৃত্রিম সৌন্দর্য বাণীরূপ পেয়েছে এ-কাব্যের বেশ কিছু কবিতায়। বিষয় হিসেবে যেমন দেশ-গ্রামকে বেছে নিয়েছেন তিনি, তেমনি বিষয়ের সৌন্দর্য সৃজনে অন্যতম উপকরণ হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন নিসর্গকে। এই নিসর্গ যে কবির অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতার শরীরে গেঁথে যায়, কবিভাষ্যের সাবলীলতাই তা প্রমাণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

"জল পড়ে পাতা নড়ে" কবিতায় তেমন সাবলীলভাবে নিসর্গ প্রযুক্ত হলেও এর মূল বিষয় একদা কোলকতায় যাওয়া এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পর তাঁর জন্মগ্রামের পরিবর্তন নিয়ে কবিমনের শঙ্কা-আকাঙ্ক্ষা। নদীবিধৌত অঞ্চলের মানুষ কবি আহসান হাবীব। তাই নদী-তীরবর্তী মানুষের কথা ঠাঁই পেয়েছে এ-কবিতায়। তিনি যে গ্রামকে, যে দেশকে রেখে গিয়েছিলেন একসময়, সে গ্রাম কি আগের অবস্থায় আছে? এখনো জীবিকার তাগিদে গহিন নদী বা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া জেলের স্ত্রী তাঁর স্বামীর ঘরে ফেরার প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে? অনেক সময় গভীর সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়ে হয়তো জেলেটি প্রাণ হারায়, তবুও প্রতীক্ষা শেষ হয় না জেলেবধূটির। এসবই উঠে এসেছে এ-কবিতার বয়ন-কাঠামোতে। একেবারে শিশুবেলাকার গ্রামের নানা স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে কবির। সবই স্মৃতিচারণা কেবল। কেননা, কবি কোলকাতা মহানগরী থেকে ফিরে এসেছেন ঠিকই কিন্তু ঠাঁই নিতে হয়েছে আরেক রাজধানী শহর ঢাকায়। তাই গ্রামকে উপলব্ধি করার ভিত্তি কবির কাছে সেই সদ্য কৈশোর পেরোনো নবীন চোখ :

এখনো কি মাঝে মাঝে
বিকেলে ঘুঘুর ডাকে বুক ভরে কান্না পায়
মনে হয়—
সুমুখের মাঠ-বন
পেরিয়ে যে নদী বয় তার বুকে
শপ্ শপ্ বৈঠার আওয়াজ ;
... ...
এখনো কি শেষ বেলা
মুগের ক্ষেতের পাশে পথ ভেঙে
ঘরে ফিরে যেতে যেতে
কালো চোখ তুলে কোন জেলে-বৌ
প্রশ্ন করে :
এলো না কি?
এখনো কি ম্লান মুখে মাথা নাড়ো
আর বলো :
যে গেছে সে গেছে।
সে গেছে সে ভুলে গেছে,
ভুলেছে মোরগ-ভোর
দুপুরে ধানের ছড়া কুড়োবার দিন ;
("জল পড়ে পাতা নড়ে", *ছায়া হরিণ*)

আশাবাদী কবি আহসান হাবীব পুরোনোকে বিসর্জন দিয়ে নয়, বরং তাকে ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করে তার ওপর শৈল্পিক দরদ দিয়ে কবিতা সৃজনে বিশ্বাসী। ইতিহাসের প্রাচীনত্বের ওপর ভর করে নতুন ইতিহাস লেখার পক্ষপাতী তিনি। তাই তো কবি বলতে পারেন, নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে 'বানাই নতুন ইট নতুন দেয়াল'। নতুন পৃথিবীর স্বপ্নদ্রষ্টা কবি হাজারো পুরোনোকে ঘেঁটে ঘেঁটে কর্মক্লান্ত, তবু আশাই তাঁর একমাত্র ভরসা—সোনালী অতীতই হতে পারে আকাশে মুক্ত চাঁদ ওঠার একমাত্র অবলম্বন। তাই অতীতের ওপর ভর করে নতুন ইতিহাস লিখেই কবি তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে চান। কেননা, ব্যক্তিগত জীবনেও কবি বিশ্বাস করতেন, জীবনে যা কিছু নেই তা নিয়ে নয়, বরং যা কিছু আছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাই দুঃখ নিয়ে পিছিয়ে থাকা নয়, সামান্য সুখানুভূতিই তাঁর কাছে মহা মূল্যবান—তা নিয়ে ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন স্বপ্ন বুনে যেতে চেয়েছেন কবি। বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, যখন তিনি বলেন:

ভাঙাচোরা দেয়ালের স্তূপাকার পুরনো ইটের

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস-লাবণ্যের কিছু আভা পাওয়া যায় টের
মনে মনে। কী আবেগে দুহাতে সরাই
পুরনো ইটের স্তূপ, লিখে রেখে যাই
আরো কথা, আরো কিছু গান আর নতুন খেয়াল
বানাই নতুন ইট নতুন দেয়াল।

("জীবন", *ছায়া হরিণ*)

এই কাব্যের কয়েকটি কবিতায় আহসান হাবীব ক্রিয়াপদ গঠন ও ব্যবহারে জীবনানন্দ দাশের রীতি অনুসরণ করেছেন। জীবনানন্দীয় শব্দ ব্যবহার অবশ্য তাঁর ওপর স্থায়ী কোনো প্রভাব ফেলেনি। তবে *রূপসী বাংলা* কাব্য যেহেতু বাংলামায়ের প্রকৃতি আর বাংলার নানা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর পুরাণের চেতনায় আলোকিত, তাই আহসান হাবীবও অসচেতনভাবে অগ্রজতুল্য কবির শব্দ-সীমানায় ক্ষণিকের জন্য আটকা পড়েছেন। তার মধ্য দিয়েও কবির স্বভাবজাত সেই আশাবাদই ফুটে উঠেছে। আর স্বদেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম ও মানবপ্রেমের উদার জমিনেই তিনি মুক্তি খুঁজেছেন। এর পাশাপাশি এ কাব্যে মৃত্যুচেতনা-বিষয়ক একটি কবিতাও ঠাঁই পেয়েছে। যেখানে কবি খুব সচেতনভাবে জীবন-সমাপনের কথা তুলে ধরেছেন। কেমন করে দৃশ্যগোচর হবে কবিহীন কবির রেখে যাওয়া সাজানো সংসার—মূলত সেই অন্তহীন ভবিষ্যৎকালের উত্তরাধিকারের বাস্তবতার কথাও তুলে ধরেছেন। মৃত্যুর পর সংগতকারণে উত্তরাধিকারীরা শোকগ্রস্ত হয়। আর তার অব্যবহিত পরই তারা রেখে যাওয়া সম্পত্তির অংশীদারীর ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দিব্যি সেই শোক ভুলে যায়—কবি সেই আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন মৃত্যুচেতনা-বিষয়ক এই কবিতায়। কবির ভাষায় :

যেহেতু অনন্তকাল বাঁচবো না জানি
মৃত্যুর দর্শনে বহু কবিতার শরীরে স্বাস্থ্যের
অতীন্দ্রীয় উজ্জ্বলতা রেখেছি ; ভেবেছি
জীবন এবং এই জগৎকে দুদিনের পান্থশালা ;
... ...
ভেবেছি এবং নিত্য যথারীতি জমিয়েছি কড়ি
পাড়ের, এবং কিছু অনিত্য কড়িও
রেখেছি সঞ্চয় ক'রে ভবিষ্যৎ পথিকের প্রয়োজন ভেবে,
যেহেতু তারাও কিছু আশা করে।

("তামসিক একটি মুহূর্ত", *ছায়া হরিণ*)

তবে শুধু শব্দ ব্যবহারেই নয়, এই কবিতারই শেষদিকে জীবনানন্দ দাশের "কুড়ি বছর পরে" কবিতার বয়ন-ঢং লক্ষণীয়। বিষয় আলাদা হলেও জীবনানন্দের কবিতায় ব্যবহৃত কিছু নিয়মিত শব্দ এবং তাঁর প্রবহমানতাকে আহসান হাবীব এ কবিতার শরীরে প্রয়োগ করেছেন। যেমন :

তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে—তখন হলুদ নদী
নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়—মাঠের ভিতরে !
অথবা নাইকো ধান ক্ষেতে আর,
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখির নীড়ের থেকে খড়
ছড়াতেছে ; মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি, বছরের পার,—
তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার !
হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে
সরু-সরু কালো-কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,
শিরীষের অথবা জামের,
ঝাউয়ের—আমের ;
কুড়ি বছরের পরে তোমারে নাই মনে !
("কুড়ি বছর পরে", *বনলতা সেন*)

আর "তামসিক একটি মুহূত" কবিতায় দাশ-কবির প্রবহমান রীতি নিম্নরূপ :

পাতার আড়ালে ডাক শোনা গেলো
এবং অক্লান্ত স্বরে ডেকে গেলো একটি ঘুঘু নিজের মনেই
মনে হলো এ পৃথিবী আরো
অনেক অনেক দিন বেঁচে রবে
মৃত্যু হবে আমার এবং
যদিও অক্লান্ত স্বরে অপরাহ্নে ঘুঘুদের ডাক
শোনা যাবে
আমি তা শুনবো না। ঘরে ফিরে এখন যেমন
দেখা গেলো একটি মেয়ে বিকেলের ছায়ায় মিশিয়ে
শরীর, আপন মনে ব'সে আছে জানালার র'কে
ভাবছে কিছু
অথবা কিছুই ভাবছে না সে–
তার সঙ্গে এখানে এমন ক'রে আর কোনদিন
আমার হবে না দেখা।
("তামসিক একটি মুহূর্ত", *ছায়া হরিণ*)

দুজনের কবিচারিত্র্য ভিন্নতর হলেও এই কাব্যে কোনো কোনো সময় আমরা জীবনান্দনীয় আচ্ছন্নতা আমরা আহসান হাবীবের কাব্যিক দর্পণে লক্ষ করি। এ দুটি কবিতাতেই ভবিষ্যতের কথা বলা হয়েছে। সেটা যেমন কয়েকটি শব্দ ব্যবহারের ঢঙে, তেমনি পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের প্রবহমানতায়ও। বিষয়ের প্রভেদ থাকলেও ঘুঘু, শীতের সকাল, কুয়াশায় ক্লান্তমুখ, ডানা ঝাড়া, শিশির, মলিন চাঁদ প্রভৃতি শব্দযোজনার কারণে আমরা ক্ষণিকের জন্য হলেও জীবনানন্দের কবিতার কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হই। আহসান হাবীবের কৃতিত্ব এখানেই যে, এই আচ্ছন্নতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি তাঁর কবিতায়। আর পাঠকদেরকেও বেশিক্ষণ দূরে থাকতে হয় না আহসান হাবীবের স্বকীয় কাব্য-সীমানা থেকে।

ছায়া হরিণ কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি কবিতা "ক্রান্তিকাল"। সেই প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে মধ্যযুগ হয়ে আধুনিক যুগ শুরু হওয়ারও দেড় শতকের বেশি সময় পরও আমাদের এই বাংলাদেশ বিভিন্ন পর্যায়ে ভিনদেশীদের দাসত্ব স্বীকার করেছে। মেনে নিয়েছে তাদের অত্যাচার বঞ্চনা আর নিপীড়ন। প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন বণিক গোষ্ঠী এদেশে এসেছে বাণিজ্য করতে, মুনাফা অর্জন করে নিজেদের দেশের তথা ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে–আবার ফিরেও গেছে। তবে 'বাংলার অতীত ঐতিহ্য কবির চেতনাকে বর্তমানের দিকে টেনে এনেছে। যে দেশ একদিন ধনধান্যে

Dhaka University Institutional Repository

পুষ্পে ভরা (sic) ছিলো, বিদেশীদের কাছে ছিলো রূপকথার রাজ্য, সেই মধ্যযুগের বাংলার সুখ-সমৃদ্ধি আর ঐশ্বর্যের কথা কবির মনে বেদনা সৃষ্টি করেছে বাংলার বর্তমান হতশ্রী চেহারা দেখে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার ধন, জন ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বিদেশীদের লুণ্ঠন যেমন নির্মম, তেমনি বেদনাবহুল।'[১২]

ইতিহাস-চেতনা মাঝেমধ্যেই কবি আহসান হাবীবের কবিতায় বিষয় হিসেবে স্থান পায় করে। যে-কোনো সৃষ্টিশীল শিল্পে ইতিহাস-চেতনা স্রষ্টার আধুনিক মানসের পরিচায়ক হিসেবে গণ্য হয়। ইতিহাসকে অনেক সময় নতুন প্রাণে উজ্জীবিত করেন কবি-লেখকেরা। অবশ্য প্রয়োজন অনুযায়ীই তাঁরা ইতিহাসের পথে হাঁটেন বর্তমানকে অভিনব করে সাজাতে বিংশ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে। খোঁজেন ইতিহাসের পাতায়। আহসান হাবীব "ইতিহাস-বিন্যাসের পথে" কবিতায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের প্রসঙ্গ টেনেছেন। সেই বিদ্রোহকে অনেকে ভারতীয় উপমহাদশের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। তবে তেমন করে না বললেও, সেই সিপাহীদের আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় অবগাহন করে কবি মুক্তির ভিত্তি গড়তে চেয়েছেন। তাঁরা যে 'স্বাধীনতা' নামের তৃষ্ণার আগুন জ্বেলে দিয়ে গেছেন, সেই আগুন যে ষাটের দশকে কবির জন্মভূমির স্বাধীনতাকামী মানুষকেও আন্দোলিত করেছিল, তখনো যে মুক্তিকামী মানুষের জন্য তা প্রজ্বলিত দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্তমান, তাকেই কবি উচ্চকিত করে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁরা রক্ত দিয়ে চলে গেছেন কিন্তু রেখে গেছেন অমোঘ অনুকরণীয় পথের দিশা। সেই 'রক্তের অক্ষরে পথে স্বাক্ষরিত বহু ইতিহাসই কবিকে স্মরণ করতে প্ররোচিত করেছে আঠারোশ সাতান্ন সালের সিপাহী বিদ্রোহের চেতনাকে, যে চেতনা একটি অমর্ত্য, অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে বলেই কবির বিশ্বাস।'[১৩] অর্থাৎ তদানীন্তন পাকিস্তান যে ব্রিটিশদেরই ছায়রূপে বাংলাদেশকে শোষণ করেছে, এ কবিতার মধ্য দিয়ে কবি তা-ই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কবি অত্যন্ত সোচ্চার-কণ্ঠেই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে শিল্পিত কবিতা রচনা করেছেন, তার অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ কবিতাটি। কবি এর মধ্য দিয়ে মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নই দেখেছেন। যেমন :

আঠারশো সাতান্ন'র ঝড়ে—
এই পাখি, এ পাখার ঢেউ
এই হাওয়া, এই সুর, আর এই সমুদ্র-স্বপনে
প্রাণ ঢেলে
একান্ত প্রাণের আর্তি ঢেলে অবশেষে
নিঃশেষে হারিয়ে গেলো দূরে যারা
তারা গেলো—
রেখো গেলো একটি আবেগ অনির্বাণ
অমর্ত্য তৃষ্ণার জ্বালা জ্বেলে রেখে গেলো
প্রাণে প্রাণে।
বহ্নিমান সেই প্রাণ।

("ইতিহাস-বিন্যাসের পথে", *ছায়া হরিণ*)

এই কাব্যে আহসান হাবীব আলাদা বিষয় নিয়ে দুটি কবিতায় একধরনের নিরীক্ষা করেছেন। এর মধ্যে একটিতে স্থান পেয়েছে বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী দুর্ভিক্ষের চিত্র আর অন্যটিতে স্থান পেয়েছে একজন প্রতিবাদী লাঠিয়ালের বীরত্বগাথা। দুর্ভিক্ষের সময় কালোবাজারি আর ভূস্বামীর বিরুদ্ধে একজন অতি সাধারণ মানুষের কথন-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তীব্র শ্লেষ ও ব্যাঙ্গাত্মক বাণ ছুড়েছেন কবি "হক নাম ভরসা" কবিতায়। মূলত 'মহম্মদ তালেবালি'র নামের এক ভুক্তভোগীর জবানিতে বিদ্রোহাত্মক বাণই প্রয়োগ কবি করেছেন ভূস্বামী আর প্রতীকী কালোবাজারির বিরুদ্ধে। এই তালেবালি তৎকালীন ভূস্বামীদের নির্যাতনের শিকার মানুষের প্রতিনিধিনিত্ব করছেন এই কবিতায়। 'আমাতে ও আপনাতে আসমানজমিন ফারাগ'

Dhaka University Institutional Repository

বলেই একসময়ে দাসত্ব স্বীকার করা লোকটি তীব্র শ্লেষাত্মক বাক্যবাণে 'আজ আপনাকে/ নির্ভয়ে মনের কথা বলি' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকাশ করে দিয়েছেন অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অত্যাচার সহ্য করা অধিকারবঞ্চিত মানুষটি। কবিতার একপর্যায়ে কবি ওই ব্যক্তিটির বয়ানে বলেছেন :

হুজুর আপনার
মেহ্‌মানদারী বড় অদ্ভুত ব্যাপার।
দাওত করার পরে ঘরে খিল দিয়ে
জানালায় গিয়ে
দরজায় ভীড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে করুণার হাসি।
মোরা পাশাপাশি
হয়ে ক্ষুধার (sic) কাৎরাই,
ডালকুত্তা তেড়ে আসে তাই দেখে হঠাৎই পালাই।

("হক নাম ভরসা", *ছায়া হরিণ*)

এই মানুষটি যেন নিজের জন্ম-ঠিকানায় ফিরতে পেরে অপসৃত অতীতের জন্য ক্রমেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের মতো। নিঃস্ব মানুষও আপন ঠিকানায় পৌঁছে পরাধীনতার গ্লানি আঁচ করতে পারে, প্রতিবাদী হতে পারে, এমনকি সারা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জীবন বাজি রাখতে পারে—তেমনই একটি চরিত্রের মানস নির্মাণ করেছেন আহসান হাবীব এই কবিতায়। যেন সারা জীবন গোলামি করার পর, বংশপরম্পরায় কৃষিজীবী এই মানুষটি জীবনের সব সংকট মাড়িয়ে বেলাশেষে 'পুরনো লাঙল আর কাস্তে লয়ে' মুক্তির স্বপ্নে লক্ষ্য অবিচল রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পোড়খাওয়া জীবনের অধিকারী চরিত্রটি যে মূলত মুক্তিকামী মানুষেরই প্রতিনিধি, কবিতার মধ্য দিয়ে ক্রমেই তার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন কবি। তিনি বলতে চেয়েছেন, 'শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের এক মৌলিক চিন্তা এই কবিতায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। যে কালখণ্ডে মানুষ হতাশা ও নৈরাশ্যে নিমজ্জিত—রাষ্ট্রের সমাজের উপর বিশ্বাস নেই—নেই সামাজিক জীবনে স্থিরতা, পারিবারিক জীবনে ভীষণভাবে নেমে এসেছে বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক জীবনে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না, গ্রামের মানুষ ভূমিহারা হয়ে অন্ধের মতো ছুটে আসছে শহরের দিকে, শ্রমশক্তি বিক্রিত হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের কাছে দেহের রক্তের বিনিময়ে, সেই উৎক্ষিপ্ত কালখণ্ডে কবির মন গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ।'[১৪] তাই তাঁর ভাবনা, আর দাসত্ব নয়, এবার নিজভূমে স্বাধীন পেশাতেই নিজের অমিত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করার অকৃত্রিম প্রয়াস :

...শুনুন সাফ সব লেন-দেন
যখন চুকিয়ে দিয়ে এসেছি, তখন
আর কি কারণ
ভয় করে কথা কই
... ...
...যারা আচম্বিতে
আমাদের জিন্দিগীর শান কেড়ে নিতে
ফন্দি করে। তাহাদের পথে
আজ হতে
এই কাঁটা দিলাম।

("হক নাম ভরসা", *ছায়া হরিণ*)

Dhaka University Institutional Repository

আর "ছহি জঙ্গনামা" কবিতায় হুজ্জত্ সরদার নামের পরোপকারী এই লাঠিয়ালটি 'বেইমানীর কোনোকালে ধারে নাই ধার'। নিজের খেয়ে নিজের পরে ভালোই চলছিল তার। কিন্তু একদিন সে জানতে পারে, 'ইংরাজ-জার্মান নাকি লেগেছে লড়াই'। শুরুতে কিছু বুঝে উঠতে না পারলেও যুদ্ধের প্রভাব যে এমন সাধারণ হুজ্জত্ সরদারদের জীবনকে নিঃস্ব করে তুলেছিল, তা-ই কবি জানিয়ে দেন তাঁর সৃষ্ট অনবদ্য চরিত্রের মধ্যেই। যুদ্ধ-পরবর্তী মানবিক বিপর্যয় শুধু শহুরে নাগরিক মানুষকে ভোগায়নি, সর্বস্ব হারিয়ে গ্রামের সরলপ্রাণ মানুষের ভোগান্তিও ছিল মানবেতর পর্যায়ের। আমরা জানি, ওই সময়ে শুধু জীবন ধারণের জন্য নিরুপায় অনেক বাবা তাঁর মেয়েকে, স্বামী তাঁর স্ত্রীকে বিক্রি করে দিয়েছেন। কবিতার শেষদিকে হুজ্জত্ সরদারের জবানিতে আমরা শুনি যে ভিনদেশীরা যুদ্ধ করছে, অথচ এদেশের কৃষকের ধানের গোলা খালি হয়ে যাচ্ছে। মানবসৃষ্ট সেই অবর্ণনীয় দুর্ভোগে হুজ্জত্ সরদারের মতো এদেশের সাধারণ মানুষের অনেকেই তাদের স্বজনদের হারিয়ে শোকাভিভূত। এই হুজ্জত্ সরদারকে কবি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করে কবি বলেন :

কোথায় লড়াই হয় রাজার রাজায়
ধানের মরাই মোর খালি হয়ে যায়,
খালি হয়ে গেল মোর চালভরা জালা
বন্ধক পড়েছে কবে বাটি আর থালা।
সোনার সংসার মোর হল ছারখার
একমাত্র পুত্র গেল, মা-জননী তার
গেল সেই পুত্রশোকে। হুজ্জত্ সরদার
আমি একা বেঁচে আছি গজব খোদার।

("ছহি জঙ্গনামা", *ছায়া হরিণ*)

কবির অনবদ্য সৃষ্টি এই দুটি কবিতার দুটি চরিত্র বাংলা কবিতার ইতিহাসে, বিশেষ করে চল্লিশের দশকে অবিভক্ত ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সাংকেতিকভাবে চিহ্নিত করতে যথেষ্ট। একে বলা যেতে পারে, 'কবির নিজস্ব প্রত্যয় এবং দ্বন্দ্বময় অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস। এই অভিজ্ঞতা ও চেতনা কবিকে সমাহিত একাত্মতায় নির্জন করে তোলে নি। বহির্জগত তাঁর অভিজ্ঞতাকে আরো চেতনার আলোকে নিয়ে গেছে। নিজের জীবনকে তিনি উদ্ধার করেছেন সকল জরাজীর্ণতা ও সকল বন্ধনের কবল থেকে।'[১৫] এই কাব্যে "হক নাম ভরসা"ই একমাত্র কবিতা, যার প্রকাশকাল উল্লেখ করেছেন কবি। আর "ছহি জঙ্গনামা" একমাত্র কবিতা, রচনাকাল যার উল্লেখিত হয়েছে। আহসান হাবীবের সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই দুটি কবিতাই আরবি-ফারসি শব্দবহুল। এভাবে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করে তিনি আর কোনো কবিতা রচনা করেননি। কবিতা দুটি সম্পর্কে তুষার দাশের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> এ' কাব্যের সবচাইতে আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য কবিতা 'হক নাম ভরসা' ও 'ছহি জঙ্গনামা'। আকর্ষণ ও উল্লেখযোগ্যতা দু'টি বিশেষ কারণে। প্রথমত, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ছবি এখানে বিশেষ কালের পরিপ্রেক্ষিতে নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে। 'হক নাম ভরসা'য় তেরোশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরিবেদনার সঙ্গে সঙ্গে 'আমানীর পাড়ে'র 'মহম্মদ তালেবালি'র ভূস্বামী ও জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যঙ্গাত্মক আগুন জ্বলে উঠেছে আর 'ছহি জঙ্গনামা'য় বীর লাঠিয়াল 'হুজ্জত্ সরদারের' আর্থ-সামাজিক অবস্থার পাশাপাশি তার জীবনের করুণ ও বেদনাবহ শোকোচ্ছ্বাস। আর দ্বিতীয়ত, দু'টি কবিতাতেই প্রচুর পরিমাণ আরবী-ফারসী শব্দের অভিনব, কিন্তু অব্যর্থ প্রয়োগ।[১৬]

কৃষকের প্রতি অপরিসীম দরদ কবি আহসান হাবীবের। কৃষক তাঁর কবিতায় নানাভাবে উঠে এসেছে। তবে "সম্রাট" নামের কবিতাটি শুধু কৃষককে নিয়েই নির্মাণ করেছেন কবি। সাধারণত কবি-সাহিত্যিকেরা শব্দ দিয়ে নির্মাণ করেন কবিতা। অন্যদিকে কৃষক তাঁর শ্রমে-ঘামে একাকার হয়ে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে

Dhaka University Institutional Repository
ভিজে মানুষের জন্য ক্রমাগত ত্যাগ স্বীকার করেন। ফলে মাঠ ও কৃষিজমি সবুজের সমারোহে ভরে ওঠে। প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হয় অনাবিল সৌন্দর্য। যে সৌন্দর্য পরার্থপরতায় সার্থকতা লাভ করে। কবি কৃষকের ত্যাগের ফলে সৃষ্ট এই অনাবিল মহত্তম কবিতা বলতে চেয়েছেন। বাংলার কৃষকের যে ছবি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এঁকেছেন, তাকে বিশ্বখ্যাত চিত্রকর্ম 'মোনালিসা' বা 'ভার্জিন মেরী'র নান্দনিকতার মতোই অমূল্য সম্পদ মনে করেছেন কবি। এরই সুবাদে মহান শিল্পী জয়নুলকে কবিতার ভাষায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন কবি :

দেয়ালে ভার্জিন মেরী, মোনালিসা
তারি মাঝখানে
তোমার কোমল দীপ্তি জয়নুলের তুলিতে অমর।
মাঝে মাঝে অপলক দৃষ্টি মেলে দিয়ে
চেয়ে থাকি
... ...
আর ধন্যবাদ সে মহৎ শিল্পীকে জানাই
তুলি যার রেখায় রেখায়
দিয়েছে অক্ষয় দীপ্তি
তোমাকে;

("সম্রাট", *ছায়া হরিণ*)

কবি বলতে চেয়েছেন, এই কৃষকই তো যুগে যুগে মাঠে মাঠে ফসলের কাব্য রচনা করে সভ্যতার দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখে। তাই বাংলার কৃষককে সম্রাট বলেছেন তিনি। ষাষ্ঠাঙ্গে অবনত কবি তাঁদের উদ্দেশে। কারণ তাঁরা মাঠে-পথে-প্রান্তরে 'অমর কবিতাসম্ভার' ছড়িয়ে দেন। আত্মত্যাগী ভূমিকার জন্য কবি কৃষককে 'আমার কবিতালোকে মহাকবি তুমি' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে কবি আহসান হাবীব কতটা আত্মানুসন্ধানী, কতটা শেকড়সন্ধানী দেশপ্রেমিক কিংবা বাঙালি কবি হিসেবে কতটা অস্তিত্বসন্ধানী—তারও পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষকের উদ্দেশে নিবেদিত কবিতার পঙ্‌ক্তিতেই তার প্রমাণ মেলে :

আমার দেশের প্রাণ তুমি
আর তোমার বলিষ্ঠ বাহু
এ দেশের সহস্র জনের
প্রাণমনে ভাস্বর প্রতিভা জ্বেলে রাখে
হৃদয় জাগ্রত রাখে
সভ্যতার দীপশিখা
অনির্বাণ জ্বেলে রাখে পথে পথে
দাক্ষিণ্য তোমার।
... ...
সোনার সকালে আর সোনামাখা বিকেলে আমার
কবিতার উৎস তুমি
আমার কবিতালোকে মহাকবি তুমি।
... ...
তুমি আর শত শত কবিকর্মী তোমার মতন
কি আবেগে সৃষ্টি করে পৃথিবীর প্রাণের কবিতা

("সম্রাট", *ছায়া হরিণ*)

Dhaka University Institutional Repository

এই সম্রাটই কবির কাছে বিনম্র শ্রদ্ধায় সম্মানীয়। বাংলার কৃষকের প্রতি কবির অনন্ত ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটেছে এই কবিতার মধ্য দিয়ে। আর আশাবাদী কবি হিসেবে তাঁর যে খ্যাতি রয়েছে, তার প্রতিফলন ভিন্ন ভিন্ন কবিতার শরীরে ঘটলেও এ-কাব্যের সর্বশেষ কবিতায়, তার ছাপটি বেশ সুনির্দিষ্ট। *রাত্রিশেষ* কাব্যের শেষ যেমন হয়েছিল একটি ভোরের আবাহনের মধ্য দিয়ে, তেমনি *ছায়া হরিণ* কাব্যের শেষ কবিতায় আমরা দেখতে পাই, অন্ধকার সরিয়ে কবি ফুলসদৃশ নতুন প্রজন্মকে একটি নতুন ভোরের আশ্বাস দিতে চেয়েছেন, যে ভোরে 'আদিম আবেগে দেখা দেবে ধানের মঞ্জরী'। ফুল কিংবা ধানের মঞ্জরী এখানে মূলত জীবন ও প্রকৃতির প্রাণের প্রতীক। এই ফুল শুধু বাগানের ফুল নয়, এটি বাংলার কৃষকের খাদ্যশস্যের ফুল—ধানের মঞ্জরি। তা ছাড়া এই কবিতার মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাসী কাব্যশিল্পী প্রকৃত কাব্যফসলের 'আলোটুকু' 'হৃদয়ে' ধরে রেখে যেন যুগ বা সময়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের স্বপ্নের সূত্রপাতের ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি, যাদের আগমনে বাংলা আবারও আগের ঐতিহ্য ফিরে পেতে পারে। বিষয় পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয়, কবিতাটি আহসান হাবীবের আত্মবিশ্বাস আর প্রতিজ্ঞা—দুইয়েরই মোহনাবিন্দু। আর তাই তাঁর ভাষ্যটাও বেশ সোজাসাপ্টা :

আমরা ক'জন যুগের একান্ত ক'টি নাগরিক
আলোটুকু ধরে রাখি হৃদয়ে এবং কুড়িয়ে সব ক'টি ধান
সন্ধ্যার কয়েকটি নীল পাখির কাকলি
ধরে রেখে ঐক্যতান (sic) সারা রাত কাটাবো

... ...

আদিম আবেগে দেখা দেবে ধানের মঞ্জরী, সেই ধান
মুঠোমুঠো আমরা ছড়াবো সারা মাঠে
সঙ্গে তার কিছু মেধা আর কিছু প্রতিভা ছড়াবো
অজস্র ফসলে যারা এই সব অমর আত্মাকে
অন্ন দেবে
এবং বিশ্রাম দেবে রৌদ্র আর ছায়ার মিছিলে।
("ফুটবে ফুল", *ছায়া হরিণ*)

ছায়া হরিণ কাব্যের নাম শব্দটির মধ্যে সমস্ত কবিতার সারার্থ নিহিত। *ছায়া হরিণ* কাব্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে হোসেনউদ্দীন হোসেন বলেছেন :

> এখানে আহসান হাবীবের কবিতার কালখণ্ড বিভক্তি করার প্রয়োজন। 'রাত্রি শেষে' যে কালখণ্ড, 'ছায়া হরিণে' সে কালখণ্ড নেই। উভয় কাব্যের বস্তুগত ও গুণগত তারতম্য আছে। এক কালখণ্ডে 'বন্ধ্যা মাটির', 'ঝরা পালকের ভগ্নস্তূপ', 'বালুর চর, এবং বিশ্বাসঘাতক মাটির খোঁজ পেয়েছেন, সমস্যার গভীরতা তাকে আরও গভীরে টেনে নিয়ে গেছে, জীবন ও পৃথিবীর প্রতি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে, অপর কালখণ্ডে খুঁজে পাওয়া যায় অস্তিত্ব বিকাশের আস্থা। এক কালখণ্ডে হতাশা, নৈরাশ্য ও অস্তিত্বের জন্যে লড়াই, অন্য কালখণ্ডে আশা-আকাঙ্ক্ষার এক বিশ্বস্ত রূপ ফুটে উঠেছে। কবির মনও নির্বিকার নিরুত্তাপ হয়ে পড়ে নি। সকল সংশয়, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন।[১৭]

এ-কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলিতে যেসব বিষয় স্থান পেয়েছে, তার অধিকাংশই তৎকালীন সমাজ-সময়ের প্রতিচ্ছবি—যার গুরুত্ব এখনো অমলিন। সময় ও সময়ের প্রভাব—সবকিছুকেই বাস্তবতার ছায়া হিসেবে কবি তুলে ধরেছেন তাঁর সমস্ত কবিতায়। *ছায়া হরিণ* কাব্যটি, বিশেষ করে সময় ও পরিস্থিতির প্রতীকী রূপায়ণ হিসেবেই বাংলা কবিতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

তিন

প্রত্যেক সৃষ্টিশীল লেখকই সময় ও সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাইয়ে নেন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ইতিবাচক রূপান্তরের দিকেও ধাবিত করেন। সেই সঙ্গে সৃষ্টিজগতেও ঘটান প্রয়োজনীয় রদবদল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুগ ও জীবনের চেয়ে এগিয়ে থেকে, আর কোনো কোনো সময় সমান্তরালভাবে কবিশিল্পীরা ক্রমাগত এগোতে থাকেন। এই অগ্রগমন বা পরিবর্তন সাধিত হয় কখনো বিষয় নির্বাচনে বৈচিত্র্য আনার উদ্দেশে, কখনো বা শৈলী নির্মাণের জন্য শব্দের কারু-চাতুর্যে। আহসান হাবীবও তাঁর কাব্যাভিযাত্রায় এগিয়েছেন, আবার নিজেকে পেরিয়ে গেছেন আপন কুশলতায়। প্রথম দুটি কাব্যে যথাক্রমে সমাজ-দেশ ভাবনা ও ইতিহাস-চেতনার মধ্য দিয়ে শিল্পিত সৃজনপ্রয়াস প্রাধান্য পেলেও *সারা দুপুর* কাব্যে আমরা তাঁর মধ্যে দেখি নিজেকে শিল্পনির্ভরতায় আবিষ্ট করার অধিকতর প্রয়াস। তাই এ-কাব্যের বৈশিষ্ট্য দাঁড়ায় বিষয়ের গায়ে শিল্পের অবগাহন নয়, শিল্পের শরীরে বিষয়ের সুনিপুণ পরিবেশনা। প্রসঙ্গত, কবিদের অধিকতর শিল্পনির্ভরতা সম্পর্কে তুষার দাশ বলেছেন :

> কবিও সমাজের অংশ। তাই মানুষের সঙ্গে তার সহজাত সম্পৃক্তি। এই সম্পৃক্তির বোধ যত আলগা হবে, ততই মানুষের চাইতে শিল্প বড় হয়ে উঠে তাকে পৌঁছে দিতে চাইবে রূপগত বিবেচনার শীর্ষের দিকে, আঙ্গিকসর্বস্বতায় এবং সবশেষে বিচ্ছিন্নতার দিকে। যদিও শিল্পবিবেচনার ক্ষেত্রে কোনো কথাই শেষ বা চরম কথা নয়—তবুও বলতে চাই, শিল্প-সর্বস্বতা ও কেবলমাত্র নান্দনিকতা মানুষের বিজড়িত সম্ভাবনা সত্তা হারিয়ে কালের ধোপে টেকার যোগ্যতাও হারায়।[১৮]

কবিমাত্রই সৃজনশীল প্রাণপুরুষ—ক্রমাগত নিজেকে পেরিয়ে যাওয়ার নিরন্তর প্রয়াসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আহসান হাবীবও থেমে থাকেননি। কাব্যযাত্রার প্রথম দিকের মনোজগতে তাই নতুনত্ব দিয়ে সৃজন-স্বাদের পরিবর্তন ঘটান। এখানে আমরা তাঁকে দেখি একটু বেশি আত্মমুখী ও গভীর শিল্পকেন্দ্রিক। অর্থাৎ এ-কাব্যের মাধ্যমে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন সমাজ-সম্পৃক্ততা থেকে খাঁটি শৈল্পিক জগতের দিকে। এই শিল্পজগতের বাসিন্দা হতে গেলে অনেক সময় কবি-শিল্পীরা শুধু সমাজ নয়, মানববিমুখও হয়ে পড়েন। শিল্প তখন হয়ে যায় অন্তঃসারশূন্য। চেতনাগত বিবর্তন বা বৈচিত্র্যপূর্ণ যে কোনো রূপান্তরই কবির জন্য এগিয়ে চলার নতুন সোপান নির্মাণের শামিল। কেননা, 'যিনি বিবর্তনশীল নন, তিনি চূড়ান্ত বিবেচনায় সৃষ্টিশীল হিসেবে দাঁড়াতে পারেন না। শিল্পীর কাজই হচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়া এবং এ' অতিক্রমণের সময়ে নিজের একটি সুস্থির লক্ষ্যকে সামনে রাখা। শিল্পী নিজের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করে শিল্পরচনার মাধ্যমে তাকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেন। সেই বিশ্বাস যতো বেশি মানবমুখী, তত বেশি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।'[১৯] শিল্পের প্রতি সচেতন নিমগ্নতা সত্ত্বেও আহসান হাবীবের ক্ষেত্রে এই মানবমুখিতা প্রায় সময়ই অটুট থেকেছে। যদিও তা সচেতন সমাজঘনিষ্ঠতার তুলনায় অনেক বেশি আত্মগত। আর তা যৌক্তিক কারণেই আমাদের মান্য করতে হয়। সুনির্দিষ্ট বিন্দুর বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে তিনি তা ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করেছেন। এই কাব্যের সুবাদে তিনি নিজেকে নিয়ে গেছেন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের পরিসরে। এই অবস্থানের পরিবর্তনও দেখব আমরা *সারা দুপুরের* পরবর্তী পর্যায়ে। তবে এই কাব্যে তাঁর অভিনবত্বের সূত্র হিসেবে আমরা লক্ষ করব কবিতার শরীরে প্রতীক-চিহ্ন ও চিত্রকল্পের বিচিত্র ব্যবহার।

এই কাব্যের প্রথম কবিতায় 'পুতুল' প্রতীকে তিনি হয়তো সময়ের চালচিত্রে মানুষের অসার জীবনকেই ইঙ্গিতময় করে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু "প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা" কবিতায় আমরা দেখতে পাই, গ্রিক পুরাণের এক চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি মানুষের আপাত লোভীমনের চিন্তার অসারতাকে তুলে ধরেছেন। আপাত প্রাপ্তি যে আসলে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে মহিমান্বিত করে না, তারই স্বরূপ তিনি

Dhaka University Institutional Repository

উন্মোচিত করেছেন 'মিডাস-এর আর্ত অনুনয়ে'। বরং জীবনের মৌলিক চাওয়া-পাওয়া যে সাধনারই বিষয়, প্রাপ্তি যে কেবল সাধনাতেই অর্জন করা সম্ভব, অন্যথায় নয়—লোভী 'মিডাসের'[২০] পরিণতিটি তেমন ইঙ্গিতই বহন করে। তাই "পুতুল" যেমন ইঙ্গিতময় হয়ে শৈল্পিক গুণে ভাস্বর হয়ে ওঠে আমাদের সামনে, তেমনি "প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা" ভুল কর্মের প্রায়শ্চিত্যবাহী দৃষ্টান্ত হিসেবে চোখ খুলে দেয়। আবার 'মনে হয় গণ-উত্তরণের পথ ধরে এই পর্বের কবি চলে যাচ্ছেন আত্মগত ধ্যানের জগতে; কবিতার অতলান্তিক রহস্যময়তার জগতে। ফলে পারিপার্শ্বিকের বহুপরিচিত জনপদের মানুষের মুখ নিত্য কিষাণির রূপাবয়ব আহসান হাবীবের চেতনায় পরিস্ফুট হয় "প্রাণের পুতুল" হিসেবে। আসলে নাগরিক জীবনে ইতোমধ্যে ধাতস্থ ও অভিযোজিত কবিসত্তা কৃত্রিম নাগরিক পুতুলের প্রতীকেই তাঁর চৈতন্যকে খুঁজে পায়।' মূলত পুতুল নামের এই জড় অস্তিত্বের মধ্যেও কবির চৈতন্যের স্বাভাবিকতাই স্থান পেয়েছে। যখন তিনি বলেন :

পুতুল।
দু'হাত ভ'রে সারাদিন ফসল কুড়িয়ে
আদিম স্রোতের ঢেউয়ে হাত ধুয়ে
বিশ্রামের আয়োজন
আর
যে আছে আদিম সঙ্গী—তার
অমাবস্যা-হৃদয়ে নির্জনে
ফুল তোলে
নিজ হাতে খোঁপায় সাজায়
রাণী সাজে।

("পুতুল", *সারা দুপুর*)

এই পুতুল নিয়ে কবি আবার দ্বিবিধ সত্তারও উন্মোচন ঘটান অন্য কবিতায়। ভিতর-বাহির নামে মানুষের দ্বৈত সত্তা তার যাপিত জীবনে সত্যিকারের সঙ্গী, বাস্তবিক কারণেই নাগরিক জীবনে ধাতস্থ হওয়া কবি তা উপলব্ধি করেছেন। এর মধ্যে তিনি জীবনাচরণের বহিরাঙ্গিক দিকটির সঙ্গে নগরজীবনের কৃত্রিমতার তুলনা করতে গিয়েই পুতুলের দ্বিসত্তার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন :

সেই দু'টি ফুল
দু'টি পুতুলের হাতে তুলে দিয়ে
আসুন দু'জনে
নিবিড় সন্ধ্যার এই অন্ধকারে আমরাও এখন
অন্ধকার হয়ে যাই।
... ...
অকপটে
সব সত্তা আত্মা তুলে দিয়ে
দুটি পুতুলের হাতে
আমাদের কপট দেহের দু'টি শব
পড়ে থাকে পাশে।
আমরা এখন
অনায়াসে আমাদের পুতুল দু'টিকে
মুক্ত ক'রে দিতে পারি সব আবরণ থেকে;
খুলে নিয়ে সব পরিচ্ছদ
এখন তাদের
সহজে বানাতে পারি স্বাভাবিক আঁধারে স্বভাব।

("স্বরূপে মহিমা তার", *সারা দুপুর*)

Dhaka University Institutional Repository

আর যে কবি 'কিশোর সৈনিক দেশপ্রাণ'—দেশের প্রতি অপরিসীম অকৃত্রিম মমত্ববোধ যাঁর মনে-প্রাণে-চেতনায়-সৃষ্টিতে বিরাজমান, তিনি তো নিজেকে প্রাজ্ঞ বণিক দাবি করতেই পারেন। প্রয়োজনে শ্লেষ-বিদ্রূপের আশ্রয় নিলেও দেশের মানুষের প্রাণ কৃত্রিম 'সোনার কুৎসিত কর্কশ কাঠিন্যে' 'ওষ্ঠাগত' হোক, এটা কবি চাননি। আর চাননি বলেই নির্দ্বিধায় বলতে পারেন:

জানি শুধু
জনারণ্যে একদা নির্মল বাসনার মুক্ত সোনা
যখন ছড়ালো ভোরের প্রথম পাখি
তখন হৃদয়ে সোনার ছলনা নেই, আমি এক
কিশোর সৈনিক দেশপ্রাণ। সেই দেশ
মুক্ত আজ।

("প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা", *সারা দুপুর*)

প্রতিনিয়ত সাংকেতিক উপায়ে কবি তাঁর বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করেছেন এ-কাব্যের কবিতাবলিতে। তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শিকড়ের কাছাকাছি যাওয়ার উপায় খোঁজা। কবিতার ভাষিক সৌন্দর্য ঠিক রেখে বিষয়কে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করতে মাঝেমধ্যেই তিনি অতীতকে, পুরাতনকে, প্রাচীনকে গর্ব ভরে তুলে আনেন। সমাজ-প্রকৃতির প্রাচীনতা, কবির হারিয়ে যাওয়া শৈশব তাঁর কাছে অমূল্য সম্পদের মতো। বিশেষ করে "রোদে-মেঘে" কবিতার ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর ফেলে আসা অতীতকে, বৃক্ষে-ফুলে সুশোভিত স্মৃতিময় সত্তার কাছে তিনি নানাভাবে দর্শন ও ধর্মের প্রাচীনতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবিতাটিতে কবির দ্বৈত সত্তার সাক্ষাৎ পাই। যেখানে ব্যক্তি কবির কাছে শিল্পী-কবির কবিতাকেন্দ্রিক কিছু বিষয়ের মীমাংসা হয়েছে বলে মনে হয়। সেই অনুষঙ্গ কবি নিজেই তুলে এনেছেন দুই সত্তার আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে। ধর্ম কিংবা স্রষ্টা হাজার যুগের সমানবয়সী হয়েও যদি প্রবীণ না হন, তবে মানুষের অতীত—তাঁর অতীতচারণা কেন এত প্রাচীন হবে? রোদে-মেঘে মাখামাখি শৈশবও তাই কবির কাছে জ্বলজ্বলে চির নতুন। আর তাতে শুধু কবিতা নয়, আকাশও বিচিত্র রঙে তার স্বরূপ প্রকাশ করে। এ সবকিছুকে কবিতার শরীরে খচিত করে তিনি অম্লান রাখতে চান। আর এসবের সন্নিবেশ তিনি ঘটান স্বভাবজাত কারণেই।

কবিচেতনার বাঁক-বদলের সুবাদে আমরা কবির আত্মমগ্ন ও শিল্প-মগ্ন স্বরূপই খুঁজে পাই *সারা দুপুর*-এর বিভিন্ন কবিতায়। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাই তিনি শিল্পকেও মাঝে মাঝে বেছে নেন। আবার কখনো কবিতাই হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার বিষয়-আশয়। "নতুন কবিতা" তেমনই এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। প্রচ্ছন্নভাবে কবিমনের অন্তর্লীন ভাবনার নরম কিন্তু দৃঢ় একটা অবস্থান লক্ষ করা যায় এই কবিতায় উপস্থাপিত পরোক্ষ বক্তব্যের মাধ্যমে। 'ঝড়', 'বৃষ্টি', 'মেঘ' ছাড়াও প্রকৃতির প্রতিকূলতার মুখোমুখি যে মানবশিশুর কথা বলা হয়েছে কবিতায়, সে যে কবি নিজেই, তাও স্পষ্ট হয় কথন-ভঙ্গিতে। তবে কবিতা নামের শিল্পমাধ্যমটি যে কবিমনকে এই পার্থিব জগতেই আলোর সন্ধান দিয়েছে, সেটা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন প্রতীকের আশ্রয়ে। মধ্যবিত্ত জীবনের নিস্তরঙ্গ জীবনেও কবিতা 'সুরের জাল' বুনে আর 'প্রেমের বন্যা' বয়ে দিতে পারে, জীবনকে ভালোবাসায় পূর্ণতা এনে দিতে পারে, সেই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে এ-কবিতায়। কবি নিবিষ্ট হয়েছেন 'জন্ম দিতে নতুন কবিতার'। কেননা, ঝড়ের তীব্রতার মধ্যে যে বিহ্বলতা, তার পাঠ যেন তিনি সম্পন্ন করেন কবিতার কাছে অমরতার আশায়। এভাবেই কবি হয়ে ওঠেন কবিতাপ্রত্যাশী-অমরতাপ্রত্যাশী মানবশিশু :

বৃষ্টির সাহানা সুর তখন
আমাদের নিস্তরঙ্গ মনে
হয়ত কোনো নতুন সুরের জাল

Dhaka University Institutional Repository
বুনে দিতে পারে।

অথবা এ বৃষ্টি আর এই মেঘ এই ঝড়
যদি সুকঠিন নিষ্পেষণে
ভালোবাসে বাছাকে তোমার—
আবরণহীন উলঙ্গ সেই মানবশিশু
আর তার নরম তুলোর মত দেহ
যদি না-ও জেনে থাকে
অবিনশ্বর কবিতার মর্মকথা—
তার সহস্র সঙ্গীর হয়ে
তুমি ত পারো জন্ম দিতে নতুন কবিতার।
... ...
আজ এই শেষ ঝড়ের মুহূর্তে
তোমার বাসনা-বিহ্বল চোখের
চরম দৃষ্টি হানো
জন্ম দাও নতুন কবিতার
শিল্পীকে অমর করো।

("নতুন কবিতা", *সারা দুপুর*)

আহসান হাবীব তাঁর দেশ ও সমাজের ঐতিহ্য আর অতীত সমৃদ্ধির কথা সচেতনপ্রয়াসে কবিতায় তুলে আনেন। একসময় প্রকৃতির অকৃত্রিম সান্নিধ্যে থেকে তাঁর দেশের মানুষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন অতিবাহিত করেছে, কিন্তু আজ প্রকৃতি ও মানুষের সেই যূথবদ্ধ জীবন হারাতে বসেছে। কবি খুঁজছেন সেই হারানো জীবন। জীবন থেকে ক্রমাগত শিক্ষা নেওয়া 'কবি শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস থেকে মানব-ইতিহাসের পরম্পরায় পাঠও নিয়েছেন। কবি জানেন, যূথবদ্ধ জীবন ও সরল দিনাতিপাতের আবর্তে মানুষ প্রকৃতিলগ্ন ছিল। প্রকৃতির গভীর সংযোগে গড়ে উঠেছিল মানবিক শৃঙ্খলার সেতুবন্ধ। কিন্তু, বেসাতি, মুদ্রানির্ভর সভ্যতা ও বণিকী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে মানুষের আবাস ভেঙেছে, নতুন আবাসন উঠেছে। মানুষের কৃষিমুখী, হাটুরে জীবন ও সামান্য বিকিকিনি ধ্বংস হয়ে নদীর জোয়ারে কূল ভেঙে অন্য নদীর পারে অতি যান্ত্রিকতায় জীবনের পত্তন ঘটেছে।'[২১] এর পরও কবি আলোকের প্রত্যাশী। তাই তিনি বলেন :

ভোর থেকে ভোরে
জোয়ারে জোয়ারে নিত্য বহু অভিজ্ঞ বিষয়ী
প্রজ্ঞাবান গৃহস্থেরা আরো বহু ফসল কুড়িয়ে
ফিরেছে যে যার ঘরে।

সামান্য সঞ্চয় ঘর থেকে যা এনেছি
দিয়েছি বিলিয়ে
তার পায়ে—

("উত্তীর্ণ প্রহরের গান", *সারা দুপুর*)

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আহসান হাবীবের এই কাব্যে পুঁজিবাদের কবলে পড়া তীব্র অগ্রসরমান মানুষের অন্তঃসারশূন্য চিত্র আমরা প্রস্ফুটিত হতে দেখি। এমন চিত্র আরো লক্ষ করা যায়, "এসো সঙ্গী হই", "স্বজন", "মন বলে" প্রভৃতি কবিতায়। আবার খুবই আত্মগত ভাবনায় সিক্ত হয়ে কবি ফুল আর প্রেয়সীকে অভিন্ন অস্তিত্বে তুলে এনেছেন। সকল শুভ কাজের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপনের পাশাপাশি নারী-সৌন্দর্যের প্রতিসাম্যে ফুলকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন তিনি। প্রকৃতির মোহনীয় এই দানের প্রতি কবির যে শৈল্পিক কৃতজ্ঞতা, তা কোনো অংশে কবি-প্রেয়সীর চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়। ফুল নিয়ে কবিমনের যে অকৃত্রিম মুগ্ধতা, তারই শিল্প-স্মারক "তারা দু'জন" কবিতাটি। প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র সৃষ্টি কাব্যিক প্রকাশগুণে যে অনন্য হয়ে উঠতে পারে, হয়ে উঠতে পারে ব্যতিক্রমী শিল্পভাষ্য, তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এটি। বিশেষ করে সমাপনী পঙ্‌ক্তির আগ পর্যন্ত কবিতাটির প্রতি কবি যে মুগ্ধতার সৃষ্টি করেছেন, তাতে খুব সহজেই নিশ্চিত হওয়া যায় যে এটি কবিপ্রেমেরই স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। শেষ চরণে আমরা যে মীমাংসা পেয়ে যাই, তা বোধ করি শিল্প-সামর্থ্যকে আরও উচ্চকিত করে তুলেছে আমাদের সামনে। কেননা, ফুল যে কবিতারও অবিকল্প হতে পারে, তারও অত্যুজ্জ্বল কবিভাষ্য এটি। সম্পূর্ণ আত্মগত বিষয়বস্তু নিয়ে নির্মিত হলেও কবিতাটির আবেদন যে সর্বজনীন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না—

কবিতার লাবণ্যে শরীর তার সম্পন্ন !
যদিও তার কোন তৃষ্ণা নেই
অথচ তৃষ্ণার সমুদ্রও তার দেহে অনায়াসে লীন হতে পারে—
ট্রয়ের আত্মাকে আর হৃদয়কে জ্বালিয়েছে যে আগুন
তার সব দাহ দেহে তার শান্ত হতে পারে
আর তৃপ্ত হতে পারে
তার সব তৃষ্ণা সে দেহের লাবণ্য হৃদয়ে মেখে নিয়ে
মুহূর্তে এবং তৃপ্ত মানবের বিস্মিত হৃদয়
তখন সহজে বলে:
যেখানেই দেখি
বাগানে পথের পাশে পুকুরের ঘাটের কোণায়
এবং যখন হাতে ভালোবেসে তুলে নিই
তখন এ পৃথিবীতে ফুলের তুলনা নেই।

("তারা দু'জন", *সারা দুপুর*)

দেশপ্রেমের চেতনায় শেকড়-সন্ধানী কবি আহসান হাবীব শুরু থেকেই তাঁর সমাজ ও ঐশ্বর্য সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করেছেন অকৃত্রিম প্রয়াসে। তবে বাঙালির নববর্ষ ও বর্ষ শেষের মাহাত্ম্য এবং সেখানে কবির নিজস্ব অনুভূতি কেমন, "শেষ সন্ধ্যা—প্রথম উষা" ও "হে বৈশাখ" কবিতায় তার প্রতিফলন ঘটেছে।

যুগ যুগ ধরে বৈশাখ আসে বাঙালির জীবনে। কবিও মুগ্ধ হয়েছেন প্রকৃতির ঘূর্ণমান রীতিতে প্রতিবছর বৈশাখের আগমনে। জীর্ণতা-শীর্ণতাকে পেছনে ফেলার কতটাই বা সম্ভব ছিল কবির মতো আত্মসচেতেন সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে। কেননা পরাধীনতার গ্লানি কবির সমস্ত আনন্দ উপলক্ষকে ম্লান করে দিয়েছে। পরাধীনতার কারণেই 'চৈত্রের সন্ধ্যার আর বৈশাখের প্রথম উষার' আগমনকে কবির কাছে 'রিক্ত সন্ধিক্ষণ' মনে হয়েছে। কারণ বৈশাখের উদ্‌যাপনকে, তাঁর কাছে মনে হয়েছে 'দ্বিচারিণী জননীর পায়ে' পুষ্পার্ঘ্য দেওয়ার শামিল। কবিমনে দৃঢ় বিশ্বাস, পরাধীনতা এমন ঐতিহ্যিক আনন্দকেও ভাগ করে

Dhaka University Institutional Repository
ফেলে। এর পরও সমৃদ্ধ দেশের আলোকজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায় দেশাত্মবোধে উন্মুখ কবি। তবে খুব বিদ্রূপের সঙ্গে আত্ম-উন্মোচন করে কবিতা দুটিতে তিনি বলেন :

মৃগনাভি-ছলনায় নিজেকেই নিজে মুগ্ধ ক'রে রেখেছো
উষার লালিত্যে
আর মধ্যদিনের আগুনে তুমি অকৃত্রিম–
তোমাকে আমি কী দিতে পারি
কী দেব বলো হে বৈশাখ!
আজন্ম পিপাসার প্রতীক তুমি
তুমি অবিনশ্বর।
আমার তৃষ্ণা পুড়েছে দ্বিচারিণী জননীর পায়ে পায়ে
আর তার খোঁপার ফুলে
নিত্য খোঁপার ফুলে
নিত্য পুজো নতুন অতিথির।

("হে বৈশাখ", *সারা দুপুর*)

কবি সক্রিয়ভাবে কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শের অনুসারী না হলেও তাঁর যে নিজস্ব একটি আলোকিত জগৎ ছিল, তা তিনি নানাভাবে প্রকাশ করে গেছেন। অন্তত মানবতাবাদী চেতনায় তিনি তাঁর ভাবনার জগৎকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। ওই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আহসান হাবীব ব্যক্তি-চরিত্র-নির্ভর কবিতার মধ্য দিয়ে একধরনের গল্প বলার চেষ্টা করেন—যা শুধু অভিনবই নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার স্মারকও। *সারা দুপুর*কে তাই শিল্পশোভন কবিতাসম্ভার বলা হলেও, কবির অস্থিমজ্জায় ঠাঁই পাওয়া সভ্যতা-বিনির্মাণের কারিগর শ্রমিক শ্রেণীকে তিনি অকৃত্রিম দরদ দিয়ে তুলে আনেন। তার প্রমাণ মেলে "তোমাকে মৃত জেনে" কবিতায়। শ্রমিকেরা জীবনের বিনিময়ে জীবন গড়ার ব্রত পালন করেন। পার্কের বেঞ্চিতে, ফুটপাতে, মার্কেটের অবহেলিত স্থানে যাদের বিশ্রাম জোটে[২২], তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের হাত বাড়িয়ে দেন কবি। পাশাপাশি তাদের এই নিদারুণ বাস্তবতায় কবি নিজেদের শ্রেণীর ব্যর্থতার প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। "তোমাকে মৃত জেনে" কবিতায় কবির নির্মিত চরিত্রের নাম আবু হোসেন। জীবনের টানে আবু হোসেনের কর্মযজ্ঞের প্রতি দারুণ শ্রদ্ধাবনত কবি। তাঁর দৃষ্টিতে এই আবু হোসেনরাই মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়নে 'মহাকারণিক দফতরের গলিতে গলিতে' ফেরি করে মানুষের স্বপ্ন বিলি করে বেড়ায়। সভ্যতার পাদপ্রদীপের সেই নেপথ্য-কারিগরদের জন্য কবির নির্মোহ ভালোবাসা-মেশানো বেদনা ব্যক্ত হয়েছে এভাবে:

যখন যে মুখ দেখি
বাসে কিম্বা ফুটপাতে
অথবা পার্কের বেঞ্চিতে অলস দেহ,
অথবা—মার্কেট কিম্বা এভেন্যুয়ে—
যাকে দেখি যত মুখ দেখি
আহা তারা জীবনের যোদ্ধা কিম্বা
জীবনযুদ্ধের অভিনয়ে ক্লান্ত বটে!
তবু ক্লান্ত বিব্রত কয়েকটি মুখ চেনা যায়।
চিনি তাই লজ্জায় এ মুখ নত হয়—

Dhaka University Institutional Repository

হায় আবু হোসেন

... ...

এবং অতঃপর
বিনিদ্র রাতকে আমিও ভালোবাসতে শুরু করি
ভালোবাসি অসুস্থ আত্মার জয়গান—
তখন, তখন আমি আর্শিতে এমুখ দেখতে ভয় পাই,
ভয় পাই তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হতে।

("তোমাকে মৃত জেনে", *সারা দুপুর*)

দেশকে, দেশের মানুষ ও মাটিকে মায়ের মতোই ভালোবাসেন কবি। দেশমাতা আর জন্মদাত্রী মা কবির কাছে একাকার হয়ে ধরা পড়ে। দেশাত্মবোধ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় নানাভাবে উঠে আসে, যেসব কবিতায় দেশের অতীত ঐতিহ্য আর স্বাধীনতার প্রতি কবির তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। তেমন "আশা রাখি কেননা" শীর্ষক কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন যে, যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে। এটা তাদের কাছে প্রাচীন পিপাসার মতো। অনেক ভিনদেশী কর্তৃক শাসন-শোষণ, লাঞ্ছনা-বঞ্চনার পরও এই দেশ যে তাঁকে মায়ের প্রসন্ন আঁচলের মতোই আগলে রাখে, সে বিষয়টিই কবি উচ্চকিত করে তুলে ধরেছেন এ-কবিতায়। তাঁর ভাষায় :

আমি তোমার সঙ্গী অথবা তুমিই আমার—
আমার ক্লান্তিলগ্নে তুমি যখন কুঙ্কুম ছড়াও
আমার বিষণ্ন রাত্রিতে তুমি যখন তারা হয়ে জ্বলো
তখন আমি সান্ত্বনা পাই
মন জানে, একা নই
একজন আমার আজন্ম সঙ্গী হয়ে
আলো ধরে
এবং সে আলোর জ্যোতিতে
মায়ের প্রসন্ন দৃষ্টি খুঁজে পাই।
... ...
এই শিখা মানুষের আজন্ম সঙ্গী হয়ে
সঙ্গে থাকে
তাকে আজীবন লালনে অমর করে রাখে
সুপ্রাচীন এই পিপাসা।

("আশা রাখি কেননা", *সারা দুপুর*)

একটা বিষয় খুব নিশ্চিত হয়েই বলা যায়, জগৎকে দেখার ব্যাপারে আহসান হাবীবের একধরনের মুগ্ধতা কাজ করেছে। সেই মুগ্ধতা কখনো নিজেকে গড়ার জন্য সমাজের প্রতি, আজন্ম আশ্রয় দেওয়ার জন্য দেশের প্রতি, আবার অনেক সুন্দর মন নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এদেশের ঐতিহ্য-নিসর্গের প্রতি—সর্বোপরি যা কবির জন্য কল্যাণকর তার প্রতিই রয়েছে ওই মুগ্ধতা। আবার কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি-মানুষের প্রতি অসম্ভব মুগ্ধতা নিয়ে কবি নেমে পড়তেন কবিতার সৃষ্টিতে। এর আগে আমরা দেখেছি, কায়কোবাদ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রচণ্ড মুগ্ধতা নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। আর কাজী নজরুল ইসলামের ব্যক্তিত্ব যে কবি আহসান হাবীবকে আবিষ্ট করে রেখেছিল, তা প্রকাশ পেয়েছে "নজরুলকে মনে করে" কবিতায়। নজরুলের সৃষ্টিশীলতার প্রতি, তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার প্রতি অনাবিল আকর্ষণ ছিল আহসান হাবীবের। পূর্বসূরির প্রতি এই মুগ্ধতা-মগ্নতা যে তাঁর ভবিষ্য-পথের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক হয়ে উঠেছিল তা প্রকাশিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যেমন :

কী অসহ্য উজ্জ্বল এবং দুর্বার তোমার উপস্থিতি
আমার জীবনে!

Dhaka University Institutional Repository

তোমাকে উত্তীর্ণ হবো এ আশায়
আর উত্তরকালের এক প্রতিনিধি হবো এ আশায়
আমি কৃচ্ছ্রসাধনার প্রতীক।
বালখিল্য মত্ততায় কখন হঠাৎ
সব আলো নিবিয়ে পথের একাই অগ্রসর হয়েছি
এবং ভেবেছি
আমি এক স্বনির্ভর আলোর জগৎ!
... ...
তোমাকে ভুলতে গিয়ে বারবার পড়বে মনে
আমার কৈশোর আর সমগ্র যৌবন ঘিরে
তোমার নায়কমূর্তি
যে আমাকে নায়কের অহঙ্কার অর্জনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলো।
("নজরুলকে মনে করে", *সারা দুপুর*)

প্রখর সূর্যালোকের উত্তাপ সহ্য করেও প্রকৃতি যেমন তার সজীবতা থেকে পৃথিবীকে বঞ্চিত করে না; তেমনি, স্বভাবসুলভ সমাজনিবিষ্ট না থেকে অধিক শিল্পসচেতন হওয়ার পরও আহসান হাবীব কাব্য-সঞ্জীবনী রস থেকে পাঠককে বঞ্চিত করেন না। এর আগের কাব্য দুটিতে যে সমাজসচেতন কবিকে আমরা পেয়েছি, এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটলেও *সারা দুপুর* কাব্যের শরীরে বিষয়বৈচিত্র্যের মাধুর্য তিনি বজায় রাখতে পেরেছেন। বিষয় নির্বাচনে বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি তিনি নিজেকে এখানে আলাদা করে চেনাতেও সক্ষম হয়েছেন। উপর্যুক্ত কবিতাবলিই এ-কাব্যের অন্তর্গত প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা, যেগুলোতে খুব আত্মগত থাকার পরও কবি বৈচিত্র্যসন্ধানী হয়েছেন।

চার

জনজীবনে ঘন কালো রাত্রির শেষ দেখে ফেলে যে আশাবাদী কাব্যাভিযাত্রার সূচনা আহসান হাবীব করেছিলেন ইঙ্গিতে-প্রতীকে—*আশায় বসতি* (১৯৭৪) রচনার মধ্য দিয়ে তিনি যেন তাঁর কবিতার মৌল বৈশিষ্ট্যেরই সনদ ঘোষণা করলেন। সনদ এই কারণে যে, মাঝে-মধ্যে আশা-নিরাশা-হতাশায় পর্যবসিত হলেও তাঁর কবিতা কখনোই সর্বৈবভাবে জীবনের নেতিবাচকতায় মুষড়ে পড়েনি, পথহারা হয়নি। বরং শূন্যতাকে পূরণ করার তাগিদের মতোই তিনি সমাজচৈতন্যে যৌক্তিকভাবে আশাবাদকেই ঘনিয়ে তুলেছেন। তবে, মুক্তিপিয়াসী চেতনার দরুন কবি কাব্যসূচনাপর্বে 'ব্রিটিশ শাসন' নামের রাত্রির সমাপ্তিদৃশ্য অঙ্কন করেছিলেন ১৯৪৬ সালেই। ঠিক তেমনি তিনি আরেকটি মুক্তির আশায় বসতি গড়তে চেয়েছেন সত্যিকারের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর অগেই। কেননা, এরই মধ্যে বড় কয়েকটি ঘটনা—যেমন : ভাষা-আন্দোলন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, শিক্ষা-আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান প্রভৃতি কবির চোখকে অনেক পরিণত করে দিয়েছিল। তিনি ষাটের দশকের উত্তাল সময়কে অনুধাবন করে ভবিষ্যদ্রষ্টার মতো মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়কে ভিত্তি করে মুক্ত স্বদেশভূমিকে নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। মূলত সেই আশাবাদিতাই এ-কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। যদিও এ-কাব্যের সব কবিতাই একাত্তরের মার্চ মাসের আগে লেখা। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত বলে এ-নিয়ে পাঠকের বিভ্রান্তিতে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন কবি। তাই তিনি নিজেই *আশায় বসতির* 'মুখবন্ধে' পাঠককে সব ধরনের সংশয় থেকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

এ-কাব্যের কবিতার জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তু, কবিতায় প্রতিফলিত আবেগ ও মানুষের চেতনা-জাগনিয়া বক্তব্যে কবি নিজেই এর সাম্প্রতিকতা নিয়ে সংশয়াপন্ন হয়েছিলেন। সব বড় কবিরই যে ভাবীকালকে দেখার বিশেষ চোখ থাকে এমন নয়। তবে দুটি মহাসমরের সংস্পর্শ পাওয়া আহসান হাবীব নিঃসন্দেহে সেই চোখকে অর্জন করেছিলেন। সংগতকারণেই ষাটের দশকের উত্তাল বৈরী পরিবেশকে কবিতার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেও তিনি সমাজ জীবনকে 'প্রাণের হাওয়ায়' উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন।

...শোনা যায়
বৈঠার ছলাৎছল, ওঠে সুর কাঁপে চরাচর।
এবার ফেরাবে মুখ বৈরী বাতাসের মুখ ফেরাবে, শপথ।
অমলধবল পাল তুলে দেবে প্রাণের হাওয়ায়।

("বৈরী বাতাস, অতঃপর...", *আশায় বসতি*)

সমাজদেহের বাহ্যিক পারিপার্শ্বিকতা যেমন আহসান হাবীবের কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে, তেমনি ক্রমান্বয়ে সমাজচৈতন্যও কবিতাতে আত্তীকৃত হয় পরম মমতায়। সমাজকে প্রভাবিত করতে যে ঋদ্ধ চেতনা প্রবাহিত করতে হয়, তা-ই তিনি করেছেন এই কাব্যের বেশির ভাগ কবিতায়। যদিও 'সাধারণভাবে সমাজান্তর্গত মানুষই তাঁর কবিতার মুখ্য বিষয়। তাঁদের দুঃখ-বেদনা ও স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে তিনি অবলম্বন করেছেন কবিতা-রচনায়...। প্রথমাংশে তাঁকে আকৃষ্ট করেছে সমাজদেহ কিন্তু তিনি ক্রমাভিসারী সমাজচৈতন্যের।'[২৪] কবির মানবিক-চেতনা যে সমাজচৈতন্যের পরিপূরক ছিল, তা বলার অপেক্ষ রাখে না। সমুদ্রের জোয়ারের মতো মানুষের জাগরণের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল অধিকারবঞ্চিত মানুষের কাঁধে। শোষকের মুখে মানুষ যেন মাটি কামড়ে নিজের ও দেশের অস্তিত্ব রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তেমন আভাসই তো পাওয়া যায় "নদীকে সামনে রেখে" কবিতায়। যেমন :

ভাটার নদীকে কেউ বাঁধতে পারে না, আর
জোয়ারের পানি
রুখতে পারে না কেউ
... ...
নিজের বাগানে স্থির সতর্ক দু'হাতে
জোয়ারের বুক থেকে নেবো কিছু লাবণ্য, এবং
যখন ভাটার টান...
দীপ্তি যার ফুরিয়েছে ভাসাবো, তা বলে
আজন্ম-লালিত এই পুরাতন মসজিদের
আত্মা এই একান্ত 'মিম্বার'
জোয়ারে দেব না ডুবতে এবং ভাটায়
ভেসে যেতে দেব না।

("নদীকে সামনে রেখে", *আশায় বসতি*)

ইঙ্গিতময় প্রকাশ হলেও কবি যে 'ভাটার নদী' বলতে পাকিস্তানের তৎকালের রাজনৈতিক দেওলিয়াপনাকেই বোঝাতে চেয়েছেন, তাতে অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না। এমনকি এই ভাটার সময়ে নিজের বাগান অর্থাৎ দেশমাতাকে কোনোভাবেই ভেসে যেতে দিতে রাজি নন কবি। কারণ শত শত বছর ধরে নির্মম নির্যাতন-শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের স্বপ্নকেও পাঠিয়েছিলেন নির্বাসনে। তারা আস্তে আস্তে জেগে উঠছে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে। পঞ্চাশ

Dhaka University Institutional Repository

পেরিয়ে ষাটের উত্তাল সময় যখন কড়া নাড়ছিল তাদের চেতন্য-দ্বারে, তখন তারা নিজেদের শানিয়ে নিয়েছিল, যোগ্য নেতৃত্বের আহ্বানে। সেই সময় তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো যখন একের এক পর জেগে উঠছে আন্দোলনের জোয়ারে, তখন কবিও শামিল হয়েছেন সাধারণের কাতারে। শুধু তা-ই নয়, "মায়ের ডাকের ছড়া" বলার মধ্য দিয়ে দেশের সন্তানেরা যেন বিদেশী প্রভুদের প্রভাবে স্বকীয়তা থেকে বিচ্যুত না হয়, সে জন্য তিনি দেশের প্রতি মমত্ব বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন :

চৌমাথার এক ঘন্টিওয়ালা পাগলাঘন্টা বাজাচ্ছে
সেথায় আসন পেতে খোকন নিজেকে নিজে সাজাচ্ছে
হাত পা ছুড়ে ঘন্টিওয়ালার নাচানাচির নেইক শেষ
ঘন্টিওয়ালা নাচছে দেখে খোকন বলে, নাচছি বেশ!
... ...
মা কেঁদে কন, হায়রে অবোধ
বুড়ো খোকন বুঝলিনে,...
সং সেজে নেই সুখের সীমা
নিজের আদল খুঁজলিনে।
দুধ-সাগরে নাইয়ে দেবো আয়রে খোকন ঘরে আয়!
শীতলপাটি বিছানা দোবো খোকন ফিরে আয় রে আয়!!

("মায়ের ডাকের ছড়া", *আশায় বসতি*)

এই কাব্যের মুখবন্ধে কবি যে কৈফিয়ত দিয়েছেন, তা বোধকরি "মিছিলে অনেক মুখ"-এর মতো কবিতার জন্যই। কবিতাটির বিশেষত্ব কবির উদ্দেশ্যকে সফলতা এনে দিয়েছে। ঐক্যবদ্ধ জনরোষের উন্মাদনায় যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া শুরু করেছিল এ দেশের প্রতিটি সচেতন প্রাণ, তা কবিকেও দৃঢ়চেতা করে তুলেছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া তরুণ-যুবাদের জন্য যেমন তাদের স্বজনেরা সম্পর্ক-ভেদে প্রতিক্ষারত ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব সময়ে রচিত হওয়া সত্ত্বেও এই কবিতাটিতে আমরা সেই চিত্র লক্ষ করি। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব কাব্য হয়েও এতে প্রধান বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র। ভাবীকালকে বর্তমানের করে গড়তে পারায় কবির কৃতিত্ব এখানে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সেই সঙ্গে কবিতাটি যে স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য প্রণোদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই দিক থেকে এটি শুধু এই কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিতা নয়, ওই সময়ের অর্থাৎ সার্বিক বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব সুলিখিত কবিতা হিসেবে এর একটি অনন্য অবস্থান 'বাংলাদেশের কবিতায়' চিরকাল স্থায়ী হয়ে থাকবে বললে অত্যুক্তি হবে না। মুক্তিযুদ্ধে ছিল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। তাদের সফলতা প্রত্যাশায় কারো মা প্রার্থনা করেছেন, কারো বোন অপেক্ষা করেছেন, কারো বা প্রেয়সী ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে তার প্রিয় মানুষটি যেন দেশের প্রতি দেওয়া অলিখিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পারেন, সে জন্য করেছেন অশেষ শুভ কামনা। সেই বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধে ছিল এ দেশের প্রত্যেক মুক্তিকামী মানুষেরই প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। দুর্বিনীতি শাসকের বিরুদ্ধে সর্বৈব আন্দোলনের 'জোরালো প্রতিফলন কবির কাব্যে আমরা পাচ্ছি এর পর থেকে—এখান থেকে মুখ ফেরানোর, চোখ ফেরানোর কোনো উপায় এদেশের মানুষের ছিলো না। আর সমাজের সবচাইতে সচেতন অংশ হিসেবে পরিচিত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই সংগ্রামী চেতনার ঢেউ সর্বাগ্রে লাগবে, এটাই স্বাভাবিক।'[২৫] বিষয়টি অনুধাবন করার অব্যর্থ দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যদ্রষ্টা কবি আহসান হাবীবের। তাঁর ভাষায় :

Dhaka University Institutional Repository

দেখো লক্ষ জনতার প্রাণ

অমর দীপ্তিতে জ্বলে মিছিলের সারা মুখে দেখো।

মিছিলে অনেক মুখ

আর সেই মুখের আভায়

পথের ধুলোয় দেখো আলো জ্বলে,

জানালার মুখ
উদ্ভাসিত এবং চঞ্চল।

মা বলে আমার দোয়া।
বোন বলে আছি অপেক্ষায়

ফুলের সম্ভার নিয়ে,

প্রিয়ার দু'হাত

প্রার্থনায় উত্তোলিত

পথের জনতা

ছড়ায় অসংখ্য ফুল উচ্চকণ্ঠে বলে জয় হোক।

("মিছিলে অনেক মুখ", *আশায় বসতি*)

পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন ১৯৭০ সালের ২ মে এমনই একটি কবিতা লেখেন—নাম "দগ্ধ গ্রাম"[২৭]। মুক্তিযুদ্ধপূর্বকালে রচিত হওয়া সত্ত্বেও তা পড়লে সহজেই মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চিত্রপট খুঁজে পাওয়া যায়। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কার ধ্বংসযজ্ঞ, অসংখ্য প্রাণহানি, স্বজনদের জন্য ভারাক্রান্ত মনের ভাষ্য—সবই আছে সেই কবিতায়। নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অতর্কিতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বর্বরোচিত আক্রমণের মুখে পড়লে যে হৃদয়বিদারক ঘটনার অবতারণা হয়েছিল, তেমন বিষয়বস্তুই স্থান পেয়েছে "দগ্ধ গ্রাম" কবিতায়।

এইখানে ছিল কালো গ্রামখানি আম-কাঁঠালের ছায়া

টানিয়া আনিত শীতল বাতাস কত যেন করি মায়া

তাহারি তলায় ঘরগুলি ভরে মমতা মুরতি হয়ে
ছিল যে তাহারা ভাইবোন আর বউ ছেলেমেয়ে লয়ে

... ...

কীসে কী হইল পশ্চিম হতে নরঘাতকেরা আসি
সারা গাঁও ভরি আগুন জ্বালায়া হাসিল অট্টহাসি
মার কোল হতে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল যে খান খান

পিতার সামনে মেয়েরে কাটিয়া করিল রক্তস্নান

কে কাহার তরে কাদিবে কোথায় যূপকাষ্ঠের গায়

শত সহস্র পড়িল মানুষ ভীষণ খড়্গ ঘায়।

("দগ্ধ গ্রাম", *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, আবুল হাসনাত সম্পাদিত)

বাহান্ন পেরিয়ে ষাটের নানা ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে সময় যখন সত্তরের দশকের দিকে ধাবিত, তখন সাধারণ মানুষও এক সারিতে মিলিত হয়েছিল তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্নের পক্ষে আন্দোলনের জন্য। সব ধরনের আত্মদ্বন্দ্ব ভুলে মানুষ শামিল হয়েছে মিছিলে। "মিছিলে অনেক মুখ" কবিতার মতো বিষয় নিয়েই আরও কয়েকটি কবিতা কবি লিখেছেন। তার মধ্যে একটি হলো "ডাক"। বিপদগ্রস্ত মানুষের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যেমন প্রতিপক্ষকে রুখে দেওয়ার শেষ সুযোগ আসে, তেমনি সুযোগ এসেছিল বাঙালির জীবনে। মূলত মানুষের জাগরণের নবমাত্রা যুক্ত হয়েছে এই কবিতায়।

Dhaka University Institutional Repository

কবি নিজে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে কৌশলে অর্থাৎ পরোক্ষ প্রেক্ষণের সুযোগ নিয়ে দেশপ্রেমের মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষের ভেতরে লালিত ক্রোধের ফুঁসে ওঠা অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে সরাসরি দৃশ্যপটে না এনে সুদূরপ্রসারী অনুভবকে স্থায়ী রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ অস্তিত্বের প্রশ্নে তখন দলমত-নির্বিশেষে সবার মতো একাত্ম হয়েছিলেন দেশপ্রেমের আদর্শে। বরং কবিরই যেন বিলম্ব হয়েছে তাদের সঙ্গে শামিল হতে। কবিতা থেকে তেমন ইশারাই পাওয়া যায় :

সব মুখে দেশের আত্মার
আরশি যেন। সব মুখ দেশের আরশিতে আঁকা যেন।
সারা দেশ সবাই মিছিলে।
আমি যাকে ডাক দেবো সঙ্গে নেবো
সে আমার অনেক আগেই
মিছিলে শামিল, আমি
তারই সঙ্গী, সে আমাকে লজ্জার মুকুট পরিয়েছে।

("ডাক", *আশায় বসতি*)

নিত্যনতুন বিষয়কে কবিতায় শিল্পিত করা আহসান হাবীবের কবিস্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে এ-কাব্যের "ক্ষমাই প্রার্থনা" কবিতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬০ থেকে '৭০—এই দশকটি ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়। নানা বঞ্চনা আর গ্লানির ঘেরাটোপে বাঁধা পড়েছিল মানুষের জীবন। সেই সময় প্রকৃতিও যেন বিরূপ আচরণ করে এই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর প্রলয়ংকরী এক ঘূর্ণিঝড়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কয়েক লাখ মানুষের প্রাণহানি আর হাজার হাজার মানুষের বাস্তুহারা হওয়ার ঘটনায় তখন সারা বাংলা আর্তনাদ করে উঠেছিল। সেদিনের ঘটনায় মানুষ নতুন করে উপলব্ধি করে যে তারা অভিভাবকহীন। কেননা, এই মানবিক বিপর্যয়ের সময়ে বহু দেশ ত্রাণকাজ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে এগিয়ে এলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সৌজন্যের খাতিরেও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। ফলে মানুষ আরো বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। সত্তরের নির্বাচনেও ছিল তার সুস্পষ্ট প্রভাব। কবি আহসান হাবীব খুব অসহায় বোধ করেছিলেন ওই মানবিক বিপর্যয়ের কালে। তিনি তাঁর শব্দ-শক্তি নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আত্মিক সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। "ক্ষমাই প্রার্থনা" নামক দীর্ঘ কবিতায় রয়েছে তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন। কবি যে তাঁদের জন্য কোনোভাবেই সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে পারেননি, সেটা যেন অপরাধবোধ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে আলোচ্য কবিতার পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে। যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে, কবি তাঁদের শোকে স্বজনহারানো মানুষের মতোই ব্যথিত হয়েছেন। সব শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কেননা, কবি মনে করেন, এই সমাজ-সংস্কৃতির চাকা সচল রাখতে তাঁদেরও ছিল সক্রিয় ভূমিকা। কবি বলেন :

তবুও পারিনি হতে
সেই ভাই,
প্রলয়ের অন্ধকারে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া ভাই-এর বোন-এর।
পারিনি সন্তান হতে সেই বৃদ্ধ পিতা কিংবা মার যার
সর্বশেষ নিঃশ্বাসেও উচ্চারিত রেখেছিলো
আমার জীবন আর কল্যাণ কামনা।
... ...
আমার এ অক্ষমতা,
ক্ষমাপ্রার্থী হতে পারি
মৃত আর মৃতপ্রায়

Dhaka University Institutional Repository

এই সব আহত আত্মার কাছে
গলিত শবের
পবিত্র দুর্গন্ধ কিছু গায়ে মেখে
রুগ্ন (sic) এ আত্মার শুশ্রূষায় রত হতে পারি।
("ক্ষমাই প্রার্থনা", *আশায় বসতি*)

আহসান হাবীব যে সারা জীবন ধরে ক্রমাগত শিল্পিত কবিতা লিখেছেন মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে, তার স্মারক-দৃষ্টান্ত "শিল্প-মানবিক" কবিতাটি। তিনি যে আজীবন মানবিক মূল্যবোধকে উচ্চাসনে স্থান দিয়ে কবিতাকে শিল্পময় করার সাধনায় লিপ্ত ছিলেন, তা তাঁর সৃষ্টিকর্মের শরীরেই ছড়িয়ে রয়েছে। তবুও 'শিল্প যে মানুষের জন্য, মানুষ যে শিল্পের জন্য নয়'—বিষয়টি স্পষ্ট করে বলার মধ্য দিয়ে তিনি জীবন-ক্যানভাসের বিশালতাকে আরো ব্যাপকতা দান করেছেন এই কবিতার মধ্য দিয়ে। বক্তব্যপ্রধান এই কবিতাটি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মের সাপেক্ষে এবং বিষয়বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে একটা নতুন সংযোজন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্পীদের প্রসঙ্গ এনে তিনি শিল্পের প্রতি মানুষের যে রয়েছে এক সহজাত দুর্বলতা ও কমিটমেন্টের সম্পর্ক—সে-বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। একজন শিল্পী শিল্পের জন্য অপরিহার্য, কারণ শিল্পী না টিকলে শিল্পের উৎসও ধ্বংস হতে বাধ্য। তবে মানবজীবনে শিল্পের অকুণ্ঠ বিস্তার এবং শিল্পের কলুষমুক্ত সৌন্দর্য ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে কী অতল অনুধ্যানে প্রভাবিত করে তারই আত্মস্বীকৃতি এই কবিতা। তবে কবিতাটির সারকথা হলো শিল্পের স্বার্থেই যে কোনো উপায়ে শিল্পীকে বাঁচাতে হবে। কেননা কবির আধেয় হলো মানুষ, তাই শ্রদ্ধার্ঘ্য পাওয়ার যোগ্য একমাত্র মানুষই। বিষয়টি স্পষ্ট হয়, যখন তিনি সরাসরি বলেন :

গগাঁ কিংবা ভ্যানগগের
কোনো মূর্ত বিষাদ আমাকে সঙ্গ দেয়
আমি সেই বিষণ্ন সঙ্গীর
সুমুখে নিজেকে সুখে নম্র করি আর
আত্মার লালিত্য তার চার পাশে বিছিয়ে সহজে
সুখী হই। সেই সুখে অনন্ত দুঃখের
ভরা নদী পার হয়ে মুহূর্ত কয়েক
শত বৎসরের পথ হেঁটে যেতে পারি অনায়াসে।
... ...
(হয়তো অনন্য কোনো চিত্র যার
জুড়ি নেই, পুড়ে যাবে,
কালজয়ী শিল্পের স্বাক্ষর ধ্বংস হবে)
তাকে পুড়তে দাও, তবু
তার আগে বাঁচাও বৃদ্ধকে যার সযত্ন লালনে
শিল্পাগার সুসজ্জিত ছিলো এত কাল
যে এখন অগ্নিকুণ্ডে আটক। মানুষ।
শিল্প মানুষের জন্য মানুষ শিল্পের জন্য নয়।
("শিল্প-মানবিক", *আশায় বসতি*)

ষাটের উত্তাল আন্দোলনের ক্রমোন্নতিই যে এ দেশের মুক্তির চূড়ান্ত আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল, ঐতিহাসিকভাবেই তা আজ প্রতিষ্ঠিত। এই আন্দোলন সফলভাবে সঞ্চালিত হয়েছিল মধ্যবিত্তসহ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে শুধু সংগ্রামমুখর থাকে, অধিকার আদায়ে ব্যাপৃত থাকে, সামাজিক প্রয়োজন ও দেশমাতৃকার কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা-ই নয়—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রয়েছে আরেকটি স্বভাবধর্ম। আর তা হলো পলায়নপর মনোবৃত্তি। এই শ্রেণী যেমন অধিকার আদায়ে জীবন বাজি রাখতে পারে, তেমনি সবকিছু থেকে নির্বিকারও থাকতে পারে। মধ্যবিত্তের এই দ্বান্দ্বিক চরিত্র নিয়ে বাংলাদেশ অনেককিছু যেমন অর্জন করেছে, তেমনি হারিয়েছেও

Dhaka University Institutional Repository

অনেককিছুই। এই মধ্যবিত্ত সমাজেরই একজন প্রতিনিধি হিসেবে কবি যেমন প্রতিবাদী মিছিলে শামিল হয়েছেন এবং ভাবীকালের সমাজের বসবাসের জন্য আশার বসতি গড়ার বুক বেঁধেছেন, তেমনি নিশ্চুপ থাকার কথাও তুলে ধরেছেন, যেখানে কবি শুধু কিছু 'কথার কাঙাল' হতে চেয়েছেন। এই কাব্যেই যে-কবি অধিকারে আদায়ে সোচ্চার হওয়া মানুষের 'মিছিলে অনেক মুখ' দেখতে পেয়েছেন, সেই কবিই বলেছেন, 'আমার তেমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। কোনো মসৃণ সদয় মই/আমার আয়ত্তে নেই।' ("নৈঃশব্দে (sic) নিহিত আমি", *আশায় বসতি*)

মধ্যবিত্তের এই চারিত্র্য যে কবিকে স্ববিরোধীও করে তুলেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আশাবাদী কবি যখন সবকিছুতেই অনুভব করেছেন নেতিবাচকতা। এত এত মানুষের সান্নিধ্য সত্ত্বেও তিনি এ সময় নিঃসঙ্গতার বলয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। সংগতকারণে তিনি উচ্চারণ করেন :

কোথাও কথার মালা পড়ে না আমার চোখে, আমি সারাদিন
নৈঃশব্দের (sic) ভয়াবহ ভারী এক শব কাঁধে নিয়ে
ঘুরিফিরি। কথার কাঙাল
আমি। তবু এই নৈঃশব্দের (sic) নির্মম তাড়ায়
সমস্ত শহর আর জনপদ প্রদক্ষিণ আমার নিয়তি যেন
নিশিলগ্ন নিঃসঙ্গ পথিক।

... ...

কোথাও কি শব্দ নেই? আছে।
ঘরে ঘরে সড়কে সরাইয়ে আর রেস্তোরাঁয় কি উদ্দাম অঙ্গভঙ্গি আর
সঙ্গে তার অবশ্যই শব্দের আরাব অনুমিত,
অথচ আমার কাঁধে এই নৈঃশব্দের (sic) শব। আমি
শব্দ নয় কথার কাঙাল।

("নৈঃশব্দে (sic) নিহিত আমি", *আশায় বসতি*)

যদিও 'এতে আর কিছু না থাক্, স্বীকারোক্তি আছে। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে আর সর্বোপরি নিজের শ্রেণীর প্রতি তীব্র-তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের কশাঘাত আছে।'[২৬] কবিমনের দ্বান্দ্বিক অবস্থা সত্ত্বেও, মাঝেমধ্যে জীবনকে নিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও বেশ কিছু আশাবাদী কবিতা এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করায় আমরা তাঁকে ইতিবাচক কবি হিসেবেই গণ্য করব। কেননা, আহসান হাবীবের কবিতায় নেতিবাচকতা কবিতায় ভর করে আশাবাদের প্রেরণাস্বরূপ। "বাস নেই", "আপন-স্বভাব", "বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আমরা", "অসুখ" প্রভৃতি কবিতায় কবির উপর্যুক্ত চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। তবে বিষয় সংযোজনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতেও কবি এমন স্ববিরোধী হয়ে থাকতে পারেন, এমনটি ভাবাও অনুচিত হবে না। কারণ আহসান হাবীব ক্রমাগত নিজেকে, উপরন্তু সময়কে পেরিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন।

আবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আরেকটি প্রবণতা অতীতচারিতা, সেটাও বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে এ-কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতায়। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো "সেই নদী", "আরশি", "কাহিনী নিরন্তর" প্রভৃতি। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় শিশুবেলা কাটানোর সুবাদে কবি যেমন প্রকৃতির আনুকূল্য পেয়েছেন, তেমনি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রকৃতির ভয়াল প্রতিকূলতাও। তবে আহসান হাবীবের কবিতায় প্রকৃতি সব সময় ইতিবাচক দর্শনে উত্তীর্ণ হয়েছে। শিশুবেলায় কবি নির্মল প্রকৃতি ঘেরা খুব শান্ত যে নদীকে দেখেছিলেন, সেই নদীর কূল আজ জনাকীর্ণ। মানুষের কোলাহলে, বিদেশী জাহাজের ভিড়ে সেই নদী তার মৃদুকণ্ঠ জলধ্বনি হারিয়ে ফেলেছে। এ-কবিতায় এক অর্থে তিনি তিনকালকে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। স্বকালে তিনি নদীকে সমহিমায় দেখেছেন আর অবগাহন করেছেন। আবার এই নদীকেই তিনি তাঁর চৈতন্যের উদ্দীপক হিসেবে ধারণ করেছেন। এমনকি সভ্যতা-সন্ধিৎসু পরিভ্রমণে কয়েক শতাব্দীর ঐতিহ্য অতীতচারণার মধ্য দিয়ে তুলে এনেছেন। অথচ সমকালে সেই নদীকূলে ঠাঁই পেয়েছে 'খরিদদারদের' অবাধ আনাগোনা। কবির মতো আরো অনেকের কয়েক পুরুষ একসময় এই নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করেছে এবং সদলবলে গা-ভাসিয়ে আনন্দানুভূতি লাভ করেছে। সেইসব শৈশবস্মৃতি রোমন্থন করে কবি তাঁর বাল্যবন্ধুদের উদ্দেশে বলেছেন :

এখন সে নদী
বিদেশী বিচিত্র পালে রুদ্ধশ্বাস
তীরে তার হাটে হাটে নতুন পশরা,
আমাদের আত্মীয়েরা
এখন কাঞ্চন মূল্যে সেই সব হাটে আজ
কাঁচের (sic) খরিদদার উন্মাদ হাটুরে তারা, আহা
এখন সে নদী
তার সেই আজন্ম লালিত মৃদু কলকণ্ঠ হারিয়েছে
উন্মাদ চীৎকারে।...

("সেই নদী", *আশায় বসতি*)

মধ্যবিত্ত মানসিকতার টানাপোড়েনের ফলে সৃষ্ট দ্বান্দ্বিক অবস্থান কবিতার শরীরে সহজেই বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দিয়েছে। আর নানা বিষয়ের বৈচিত্র্যময় সমাবেশ ঘটিয়ে কবি *আশায় বসতি* কাব্যটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন।

পাঁচ

দীর্ঘ সংগ্রামের পর বাঙালি জাতিসত্তার হাজার বছরের পথ-পরিক্রমার সাধনালব্ধ স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটে—ঘুচে যায় পরাধীনতার গ্লানি, অর্জিত হয় স্বাধীনতা। বাহান্তর-পরবর্তী সময়ে সদ্য স্বাধীন দেশে সমাজজীবন থেকে শুরু করে পেশাগত জীবন, ব্যক্তিজীবন থেকে কর্মজীবন, সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে রাজনৈতিক জগৎ—সবকিছুতেই প্রধান অনুষঙ্গ ছিল মুক্তিযুদ্ধ। শিল্প-সাহিত্যের জগৎও এর বাইরে ছিল না। তবে সদ্য স্বাধীন দেশে সাধারণ মানুষকে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করে আশাবাদী হয়ে ওঠার আগেই সামাজিক বিশৃঙ্খলার মুখে পড়তে হয়েছিল। ষাটের দশকের উত্তাল আন্দোলনে নানা ত্যাগ স্বীকার করা মানুষ তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পায়নি। তবে সেই সময়ে বিরাজমান অস্থিরতায় সমাজের প্রাগ্রসর মানুষ হিসেবে কবি-সাহিত্যিকেরাও নিজ নিজ সাধনায় লিপ্ত ছিলেন—সেটা যেমন কবিতায়, তেমনি শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও। মানুষের অধিকার আদায়ের সঙ্গে সে সময় অন্যান্যের মতো কবি আহসান হাবীবও একাত্ম হয়েছিলেন, সোচ্চার ছিলেন কবিতার ভাষ্য-সৃজনে। তীব্র শ্লেষাত্মক বাণও ছুড়েছেন তিনি *আশায় বসতি* কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হলেও সে সময় তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এ-কাব্যে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কোনো কবিতাই স্থান পায়নি বরং 'সেসব কবিতা আর একটি পৃথক সংকলনে প্রকাশের আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।'[২৮] এই 'সেসব' কবিতা নিয়েই স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* (১৯৭৬)। অন্যান্য কাব্যের মতো এখানকার কবিতাতেও বিষয় হিসেবে যথারীতি স্থান পেয়েছে আশাবাদ, অতীতচারিতা, মধ্যবিত্তের

Dhaka University Institutional Repository

পলায়নপরতা, নিসর্গপ্রেম, দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা প্রভৃতি। এ ছাড়াও অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তুলে এনেছেন মুক্তিযুদ্ধোত্তর সামাজিক অরাজকতা, সমাজজীবনে সৃষ্ট হতাশা, আর ইঙ্গিতময়তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদী উচ্চারণ।

এ-কাব্যের নামটির মধ্যেই রূপকের আবডালে তিনি বলে ফেলেছেন তাঁর অপ্রকাশিত অভীপ্সার কথা। শুষ্কতাকে সিক্ত করার জন্যই তো মেঘ। বাঙালির সমস্ত শুষ্কতা ও জীর্ণতাকে তিনি আশাবাদী মেঘ দিয়ে সজীব করে তুলতে চেয়েছেন। জলসিক্ত সঞ্জীবনী ধারায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন প্রকৃতি এবং ঐতিহ্যকেও। তাহলেই তো জনজীবনে ফিরে আসবে স্বস্তি। কিন্তু সেটা কীভাবে? মানুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মানুষ খুঁজে চলেছে স্বনির্মিত জগৎকে। সেখানেই সে রচনা করতে চায় আপন ভুবন। ক্রমাগত এমন দৃশ্য দেখে কবি নিজের মনেই বলে ওঠেন "আমারত কোথাও না কোথাও যেতে হবে"। কবিতায় প্রকাশ ঘটান মনস্তাপের। তবে তাঁর যেতে চাওয়ার অর্থ হলো যতটা সম্ভব নীড়ের টানে নাড়িপোঁতা মাটির কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করা :

আমারত কোথাও না কোথাও যেতে হবে।
পথ না পেলেই পথ ছেড়ে দেব?
এই দাপাদাপি
এই অস্থিরতা সার হবে?
আমি কি কোথাও পৌঁছবার মত আলো
পাবো না জীবনে?
... ...
পুরনো পিঞ্জর খুলে
সোনাদানা যতই ছড়াও
বলো আয় আয়!
আমি এই পথ থেকে ফিরবো না, কেননা
মানুষকে কোথাও না কোথাও যেতেই হয়
স্বকালসমৃদ্ধ এক সুস্থির আবাস তাকে
অবশ্যই গড়ে নিতে হয়
কোনোখানে।

("আমারত কোথাও না কোথাও যেতে হবে", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

এরপর তিনি স্বগতোক্তির মতো বলেছেন "আমার যাওয়া হয় না"। নাগরিক জীবনের ইট-পাথরের দেয়াল ভেঙে তিনি চাইলেই ফিরে যেতে পারেন না আপন বিবরে। তবে যাওয়ার উত্তুঙ্গ আগ্রহ তিনি প্রকাশ করেন অবলীলায়। কিন্তু কেন? বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে, সেই সময়টায় জীবন-সর্বস্বের বিনিময়ে চলছে মুক্তিযুদ্ধ। অথচ কবি ফিরতে চান ফেলে আসা ঐতিহ্যের কাছাকাছি। শুধু মধ্যবিত্তের পলায়নপর মনোবৃত্তির কারণেই এমন ভাবনা ভাবা কবির পক্ষে সম্ভব হয়েছে। যাঁরা যুদ্ধরত, তাঁদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত আবার কবিও এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি। কিন্তু সেই সময়ে নিজের শহর পিরোজপুর, তাঁর শৈশব-কাটানো স্কুলের মাঠ, বাগানবাড়ি, পুকুরপাড় সবকিছুই চোখের সামনে স্মৃতি কড়া নাড়ছে—যুদ্ধের প্রতি তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই যেমন :

আমার যেতে ইচ্ছে করে
এক এক সময়ে খুব যেতে ইচ্ছে করে
স্কুলমাঠের সেই অন্ধকারে
সেই আঠারো বছর বয়সের গা ছুঁয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আস্তিনছেঁড়া গেরুয়ারঙ কামিজের ভেতরে ঢুকে
আমার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে
কিন্তু আমার যাওয়া হয় না
আমাকে যেতে দেয় না।

("আমার যাওয়া হয় না", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

মূলত এই কবিতাটিই এই কাব্যের নামকরণকে অর্থাৎ সার্বিক চেতনালোককে ধারণ করে রেখেছে। সংকটকালে কোনো সোনালি অতীতকে সবুজ করে পেতে চাওয়ার প্রবৃত্তি তো অস্বাভাবিক নয়। কেননা, নিজের অবস্থান আরেকটু ভালো থাকা, স্বস্তিতে থাকার প্রচেষ্টাই তো মধ্যবিত্তের অন্যতম প্রবৃত্তি। এমন বিষয়-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এ-কাব্যের আরো কিছু কবিতায়। তার মধ্যে রয়েছে, "ওকে ডাকো", "ফিরতে হবে" প্রভৃতি। এই অতীতবিধুরতা বা নস্টালজিয়াই পরবর্তী কাব্যে আহসান হাবীবকে কবি হিসেবে সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

আবার অন্যদিকে দেখা যায়, তৎকালে চলমান স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি রয়েছে তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদের স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর পূর্বোক্ত কাব্যের কবিতাবলিতে। এখানেও অত্যন্ত শান্ত গলায় তীব্র আবেগে মানুষকে স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার হতে বলেছেন তিনি। এর জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে তিনি মানুষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। আর কবি নিজে অমর করে রাখতে 'শব্দের মালায় গাঁথতে' চেয়েছেন স্বাধীনতাকে। মুক্তিকামী-সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে দেশপ্রেমের গভীর আবেগে তিনি একাত্মতা প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে—যেমন করেছেন ষাটের আন্দোলনের সময়ও। এবার আর কোনো রাখঢাক নয়। সরাসরি তিনি বলেন:

মানুষকে ডেকে ডেকে বলি, এসো
স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে
আমরা সোচ্চার হয়ে আকাশকে সচকিত করে তুলি
আর হাওয়ায় ছড়াই কিছু নতুন গোলাপ,
দেখি জানালায় ঝুলে আছে নীলাকাশ
সামনের বাগানে
গোলাপ। বুকের মধ্যে
তুমি
মনোহর শব্দমালা।

("স্বাধীনতা", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

স্বাধীনতা-বিষয়ক আরো কয়েকটি কবিতায় আহসান হাবীব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে এনেছেন সে সময়কার চিত্র। "সার্চ" সেগুলোর মধ্যে একটি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কিংবা এদেশীয় দোসরদের অত্যাচার ও ভীতি-সঞ্চারী তৎপরতা থেকে স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থী ও কিশোরবয়সী ছেলেরাও যে মুক্ত ছিল না তার একটি নমুনা-দৃষ্টান্ত এই কবিতাটি। আবার এটাও সত্যি যে এই বালকেরাও তো তাদের মগজে-মননে ধারণ করেছিল স্বাধীনতার মূল মন্ত্র। শত্রুকে মোকাবিলা করার তাদের ছিল না কোনো ধাতব-অস্ত্র, তাদের মোক্ষম অস্ত্র ছিল বুকভরা আত্মবিশ্বাস। তাই যতই ভয়-ভীতি ছড়ানো হোক না কেন, তাতে বুকের গভীরে প্রতিষ্ঠিত দেশপ্রেমকে তারা বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। তাই 'হল্ট বলে হুঙ্কার ছেড়ে' যতই 'যম' নামক নরপশুরা সামনে দাঁড়াক, তাতে বালক-বয়সীদের অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে কেউ সরাতে পারেনি। কবির ভাষায় সেই চিত্রটি খুব স্পষ্ট :

'হল্ট' বলে হুঙ্কার ছেড়েই যম সামনে খাড়া।
লোমশ র্কশ হাত ঢুকে গেলো প্যান্টের পকেটে...

Dhaka University Institutional Repository

কিছু পয়সা দুটি ফুল সুতোর বান্ডিল
অতঃপর
ভারী হাতে কোমর জরীপ। কিছু নেই।
("সার্চ", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

কিন্তু তাদের কাছে যা আছে, তা তো খালি চোখে দেখা যায় না। তাই মুক্তির নেশায় পেয়ে বসা বালকটি ঠিকই প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকে। আর সেই কারণেই পরক্ষণেই কবি বলেন:

বুকের গভীরে
মহত্তম সেই অস্ত্র যার
দানবের স্পর্শযোগ্য অবয়ব নেই কোনো
ধ্বনি যার অহরহ প্রাণে তার বাজায় দুন্দুভি:
স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা!

আর সেই প্রিয়তম মহত্তম অস্ত্র বুকে
লুকিয়ে সন্তর্পণে ধীর পায়ে
অনন্য কিশোর তার
সঠিক গন্তব্যে যায় হেঁটে।
("সার্চ", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পাতা উলটালে দেখা যাবে, এমন দৃষ্টান্ত আছে ভূরিভূরি। পরের কবিতা "আমার সন্তান"-এ দেখা যায়, কবি নিজের ছেলের হঠাৎ বদলে যাওয়ার কথা অবগত করেছেন পাঠককে। যুদ্ধকালে অনেক শিশু-কিশোর তাদের প্রতিভার চৌকষতায় দেশের জন্য সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক চিন্তার স্বাক্ষর রাখতে অংশ নিয়েছিল, যা ছিল তাদের বয়স-উত্তীর্ণ সিদ্ধান্ত। কবি নিজের ছেলের ক্ষেত্রে দেখেছেন, তাঁর ছেলে হঠাৎ অধিক বয়সী মানুষের মতো কথা বলছে, করছে অভিজ্ঞ মানুষের মতো আচরণ। কবি আশ্চর্যই হয়ে যান তাঁদের কিশোর ছেলের এমন পরিবর্তন দেখে। আর তিনি তাঁর চোখে এই বদলে যাওয়া ছেলেটিকে পবিত্রতার প্রতিমূর্তি 'পয়গম্বর' হিসেবে আখ্যা দিতেও দ্বিধা করেন না। এ কবিতা সম্পর্কে এক আলোচক যথার্থই বলেছেন, 'কিশোর মুক্তিযোদ্ধাকে পয়গম্বরের সাথে তুলনা করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন পবিত্র মহিমার আবরণে। এরকম তুলনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক সাহিত্যে আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।'[২৯] দেশপ্রেমের পবিত্রতায় সিক্ত এই কিশোরটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী হাজারো কিশোর মুক্তিযোদ্ধার প্রতিনিধিত্ব করছে, তা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়। বিশেষ করে তিনি যখন বলেন :

জানতে চাই, এই অন্ধকারে
কোথায় সে যেতে চায়, বলে
সামনে যাবো।
সামনে কী ভয়াল অন্ধকার। বলে
অন্ধকার পেরোলেই আলো। বলি তাকে
ওপথে অনেক
হিংস্র জন্তুর তীক্ষ্ণ নখর তোমাকে চায়
... ...
ওপথে নিশ্চিত মৃত্যু বলে আমি যখন আবার
অসহায় শিশুর মতই কাঁদতে থাকি
তখন বয়স্ত কোনো পিতার কণ্ঠস্বরে খোকা বলে:
'মৃত্যুই জীবন'। এবং সে আরো বলে:
... ...

Dhaka University Institutional Repository

তোমার চারপাশে বড় অন্ধকার তাই

সামনে যাবো

আরো সামনে

সূর্যোদয়ে যাবো।

("আমার সন্তান", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

এ-রকমই মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা-আর্দ্র কবিতা "কথা বলতে বলতে" ও "খোকন ফেরেনি"। স্বাধীনতার স্বাদ কতটা মধুর, কতটা উপভোগ্য, কতটা নির্ভার অনুভূতি হতে পারে, তারই নিদর্শন "কথা বলতে বলতে" কবিতা। মুক্ত স্বদেশকে কবি উপলব্ধি করেছেন নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্য দিয়ে। পরাধীন দেশে ব্যবহারিক জীবনে নানা বিড়ম্বনায় পড়া ছিল সবার জন্য নিত্যদিনের ঘটনা। সে সময় ছিল না স্বাধীনভাবে কোনো কিছু করা বা বলার অধিকার। ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাটুকু মেটাতে গেলেও প্রতিবন্ধকতার শেষ ছিল না। কবি মুক্ত জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে চান, কারণ 'দৈত্যকুলের সেই পুলিশটা'র মুখোমুখি হতে হবে না আর। কবি এই ভেবেই আনন্দিত যে, ভিনদেশীদের সেই ব্যারিকেড আর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। যেহেতু বিস্মিত হওয়ার দিন শেষ, তাই সময় এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার—কবি সদ্য স্বাধীন দেশে নতুন স্বপ্ন নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চান। আর "খোকন ফেরেনি" কবিতাটি স্বাধীনতা-বিষয়ক হলেও এটি "আমার সন্তান" কিংবা "সার্চ"-এর ঠিক বিপরীত মেরুর কবিতা। হয়ত যদি ধরে নেওয়া যায়, "আমার সন্তান"-এর কিশোর ছেলেটি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং ফিরে আসেনি আর। মুক্তিযুদ্ধে অনেক সেনানীর মুখে তো এমন ঘটনা শোনাও যায় যে তাঁদের কেউ কেউ খেলার মাঠ থেকে কয়েক বন্ধু একসঙ্গে বাড়ি না ফিরে রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের কেউ ফিরেছেন বীরের বেশে আবার কেউ সেখান থেকেই বীর বিক্রমে চলে গেছেন না-ফেরার দেশে। অথচ 'খেলোয়াড়দের' জন্য তাঁদের মা-বাবা, বিশেষ করে প্রিয়জনদের অপেক্ষার প্রহর কখনোই শেষ হয়নি। এই কবিতাতেও কবি (প্রথম পুরুষে লেখা) সে-রকম একটি ঘটনারই অবতারণা করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে কবিমনের অভিব্যক্তি একজন বাবা হিসেবে যথার্থ বলেই মনে হয়। কবিতাটির এই 'খোকন' যে কাউকে না জানিয়ে যুদ্ধে যেতে পারে, তার পূর্বপ্রস্তুতি আমরা লক্ষ করেছি "আমার সন্তান" কবিতায়।

স্বাধীনতার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির অচরিতার্থতা লক্ষ করা যায় স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের সমাজে। যে স্বপ্ন এবং সাধ নিয়ে মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, যে স্বপ্ন-সাধের প্রেক্ষাপটে মানুষ জীবন বাজি রেখেছিল, তা যেন ধূলিস্যাৎ হয়ে যেতে বসেছিল বাহাত্তর-পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের প্রতি কিছু সুযোগসন্ধানীর অন্যায় দাপট ও ক্ষমতাসীনদের অরাজকতায়। কবি মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যেমন আবেগী ছিলেন, খুব যৌক্তিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নিজের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন, তেমনি আবার ক্ষুব্ধও হয়েছেন। সংগতকারণে রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় সংঘটিত জন-অকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড আর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন তিনি। সদ্য স্বাধীন দেশে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করার আগেই মানুষকে এমন বিবেকহীনতার মুখোমুখি হতে হবে, তা কোনোভাবেই কবির কাম্য ছিল না। সেই ক্রোধও তিনি ব্যক্ত করেছেন অত্যন্ত শিল্পিত ভাষায়। এ-কাব্যের কবিতাগুলোর মধ্যে এটিও খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট তৎকালীন সামাজিক সংকটের কারণে সাধারণ মানুষ যে শুধু তার মৌলিক অধিকারই হারাতে বাধ্য হয়েছিল তা নয়, তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মতো ন্যূনতম নিশ্চয়তা হারিয়েছিল। কাব্যজীবনের শুরু থেকে সাধারণ মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল কবি সমাজজীবনের এই অনাচারকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই এর জন্য দায়ীদের খুঁজে বের করে রাষ্ট্র বা দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর 'জনাব'কে গণ-আদালত কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

কোনো বিবেকী আদালতের সম্মুখীন হতে বলেছেন কবি। কেননা, অন্যায়কারীরা বীরদর্পে ঘুরে বেড়ায় 'জনাবের' সামনে দিয়ে। "আসামী-বিষয়ক" কবিতায় কবিমনের এই সংক্ষুব্ধ অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। বোধ করি, এই কবিতার মাহাত্ম্য আজকের বাংলাদেশে আরো সতেজ, আরো সজীব। কেননা, এতদিন পরও এই কবিতাটিকে খুব প্রাসঙ্গিক এবং সমকালীন মনে হয়। বিশেষ করে কবি যখন বলেন :

দর্পভরে ছড়ায় চারদিকে আর দিনদুপুরে ডাকাতির মত সব
কারবার ঘটেই যাচ্ছে হাটে হাটে দেখেও দেখেন না কিংবা
দেখতে চান না অথবা সাহস নেই সামনে দাঁড়াবার শুধু এখানেই
এই ক্ষুদ্র-ফুটপাত-দোকানী আমি আমাকে নিয়েই যত হম্বিতম্বি
... ...
যেহেতু জনাব জানি একান্তই অসহায় হাতে নেই সিকিমূল্য
চালের ডালের কিংবা পরিধেয় সামান্য বস্ত্রের নেই শূন্য হাতে
ঘরে ফিরে স্ত্রী অথবা অর্ধনগ্ন কন্যার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাবার
নির্লজ্জ স্বভাব কিন্তু আপনি কি কখনো এই ভরা হাটে
একটিবার লক্ষ্য করেছেন কালো বোরখা ব্যতিরেকে আপনার পাশেই
জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল দেহে মানব সন্তান কিছু বীরদর্পে ঘোরে ফেরে

("আসামী-বিষয়ক", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

সব অন্যায়ের যৌক্তিক প্রতিবাদ করে আহসান হাবীব রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচেতন হওয়ার ইঙ্গিতময় পরামর্শ দিয়েছেন। তাই এ নিয়ে কোনো হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হোক, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তুমুল সংকটময় অবস্থায় পতিত হোক, কবি তা কখনো চাননি। স্বাধীনতা-উত্তর ঘোলাটে সামাজিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যখন স্বাধীনতা ও দেশবিরোধী অপশক্তি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করে, তখনো সোচ্চার ছিলেন। ওই ন্যক্কারজনক ঘটনাকে কবি মধ্যযুগের পৈশাচিক বর্বরতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। উজ্জ্বল রৌদ্রালোকও অন্ধকারে পর্যবসিত হয়েছিল সেই দিন। কবি জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডকে মেনে নিতে পারেননি বিধায়, হত্যাকারীদের তাঁর নিজের বুকেও ছুরি চালাতে বলেছেন। পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের হত্যাকাণ্ড[৩০] কবিকে যে কতটা বিমূঢ় করেছিল, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "হত্যাই উদ্দেশ্য যদি" কবিতাটি। পৈশাচিকতার এমন নগ্ন উদাহরণ সৃষ্টিকারী সেইসব ঘাতকের উদ্দেশে কবি বলেছেন :

পারো যদি
নদীকে নিজের পথে যেতে যেতে থেমে যেতে বলো
পাখিদের বলো গান ভুলে যেতে
এই আলো সবুজ ঝালর এই সজ্জিত নিসর্গ
এই হরিণীকে হত্যা করো
আমার বুকের
গভীরে বসাও ছুরি
দেখি তুমি সেই হন্তারক কি না
যাকে আমি প্রবল ঘৃণায়
প্রাচীন কোনো গুহায় এসেছি ফেলে
তুমি সেই পুরাতন হিংস্র ঘাতক কি না দেখি,
তা না হলে
এই হত্যা এখানে সম্ভব নয়!

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকার রৌদ্রালোকে যাই।

("হত্যাই উদ্দেশ্য যদি", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

আরেকটি কবিতার বিষয়গত মূল্য কবির সমকালীনতা পেরিয়ে আজকের সমকালীনতায় স্থায়িত্ব পেয়ে গেছে। বিষয়টি পরিবেশ-সচেতনতামূলক। এই আধুনিক সভ্য যুগে নগরায়ণের ফলে ধ্বংস করা হচ্ছে প্রকৃতিকে। নিসর্গের সঙ্গে কবির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তাই তিনি নগর-সভ্যতার কারিগরদের প্রতি অনুরোধ করেছেন, তারা যেন প্রকৃতির স্বাভাবিকত্বকে নষ্ট না করে। আর তা নাহলে তেমন সভ্যতাকে নাকচ করে দিয়েছেন কবি। নিসর্গপ্রেমী কবি বলে তিনি বলতে পেরেছেন, 'তোমার এমন হন্তারক উপস্থিতি চাই না চাই না।' ("দোহাই তোমার", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*) বছরের পর বছর ধরে টিকে-থাকা শ্যাম বনানীর প্রতিনিধিত্ব করা প্রাকৃতিক বনায়ন মানুষের কৃত্রিম নগরায়ণের দাপটে বিলীন হবে—এমন লোভ সংবরণ করতে বলেছেন কবি। একপর্যায়ে তিনি লোভী সভ্যদের গ্রিক পুরাণের চরিত্র মিডাসের[৩১] ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে প্রকারান্তরে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। কবিতাটিতে বিজ্ঞানকে স্বাগত জানিয়েও কবি বিজ্ঞানের নেতিবাচক প্রয়োগের বিষয়টি উল্লেখ করতে ভোলেননি। সর্বোপরি চারদিকে যান্ত্রিক সভ্যতার যে করাল ছোবল আমরা বর্তমান সময়ে দেখতে পাই, যে কারণে আজ পরিবেশের স্বাভাবিকত্ব ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, সে বিষয়টিই তিনি আজ থেকে প্রায় তিন যুগে আগে উপলব্ধি করে গেছেন। আর এই কারণে কবিতাটি আজও শুধু আমাদের জন্য নয়, সারা বিশ্বসভ্যতার জন্যই প্রাসঙ্গিক। যান্ত্রিক সভ্যতাকে তীব্র আক্ষেপের স্বরে তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় বলে গেছেন :

আমার বাগানে
সজ্জিত সম্পন্ন এই ফুলভারে নম্র নত
অস্তিত্বের উৎস এই আমার বাগানে
তোমার এ হন্তারক উপস্থিতি
চাই না চাই না। যাও
আজন্ম ঘাতক ফিরে যাও।
... ...
সভ্যতা মহান বটে!
বিজ্ঞান অবশ্য বলিয়ান (sic)!
সুখ আছে
স্বস্তি আছে
আছে উজ্জ্বলতা!
তবুও মিনতি
মিডাসের কাহিনী ভুলো না।

("দোহাই তোমার", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

এই কবিতাটির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তুষার দাশ বলেছেন, 'ঢাকা শহর উন্নয়নের নামে এবং তাকে সজ্জিত করার মিথ্যে স্তোকে স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলোতে প্রচুর পুরোনো গাছ কেটে ফেলা হয়।'[৩২] কবি হয়তো সেখান থেকেও এই কবিতা লেখার তাড়না অনুভব করে থাকতে পারেন। কবিতাটির গাঁথুনিতে কোনো কোনো স্থানে কাব্যগুণ সামান্য খর্ব হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি ধ্বংস হলে পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে, আবহাওয়া বিরূপ আচরণ করতে পারে, সেই সঙ্গে নষ্ট হয়ে যেতে পারে প্রাকৃতিক

Dhaka University Institutional Repository
নান্দনিক সৌন্দর্য—সে বিষয়গুলো একজন পরিবেশবিজ্ঞানী না হয়েও কবি আহসান হাবীব সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আর তা-ই তিনি এই কবিতাটিরই অন্য এক জায়গায় বলে গেছেন :

দোহাই কেটো না
দোহাই তুলো না ঊর্ধ্বে নির্মম কুঠার!
স্বহস্তে নিশ্চিহ্ন করে নিজের ভুবন
অস্তিত্বের বাসভূমি
বলো ত বানাবে তুমি আর কোন্ কোন্ নতুন ভুবন?
কোথায় দাঁড়াবে এই ধোঁয়া আর
ধুলো আর
যন্ত্রের যন্ত্রণা আর
সর্বগ্রাসী দানবনিনাদ
("দোহাই তোমার", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ, প্রকৃতি ও অস্থির সমকাল-সংক্রান্ত কবিতাবলির বাইরে এই কাব্যে কবির মননজাত সংকেত ও ইঙ্গিতধর্মী বেশ কয়েকটি কবিতা রয়েছে, যেগুলো কাব্যগুণে এই গ্রন্থে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে। যেমন: এ-কাব্যের একমাত্র সনেট "ফিরতে হবে"তে ধ্বনিত হয়েছে প্রাকৃতিক জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার গৌরবকে রক্ষা করার উদাত্ত আহ্বান। ইট-পাথরের নগরসভ্যতায় লীন হয়ে না থেকে ফিরতে হবে গ্রামে, শেকড়ের কাছাকাছি সরল জীবনে। "মনীষা মনীষা ব'লে" কবিতায় কবি অনুসন্ধান করেছেন মানব-মনীষার গূঢ়ার্থ। সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস থেকে উচ্চারিত মনীষা শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে কবির যথেষ্ট দ্বিধা আছে বলে কবিতার পাঠান্তরে মনে হয়। কবির জিজ্ঞাস্য, মনীষা যদি এতই প্রশংসনীয় শব্দ হবে, তবে রাজনৈতিক ক্ষোভ, যন্ত্রণার আর্ত চিৎকার বা পারমাণবিক ও নাপাম বোমা কি মনীষার ফসল? "দেয়াল দ্বিবিধ" কবিতায় নাগরিক সমাজের আত্মনির্মিত খাঁচা থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুক্তির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। কবিতার প্রধান উপাদান 'শব্দ' আর প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত দুটি শব্দ 'ফুল' আর 'নীলিমা' শিল্প সৃষ্টির অশেষ উপাদান হিসেবে একাকার হয়ে গেছে। "মুখের ছবি" প্রভৃতি কবিতায় শেকড়-বিচ্ছিন্ন আর সুতা-ছেঁড়া ঘুড়ির মানুষদের গতিময় জীবনের পথে ধাবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আর "সমীপেষু" কবিতায় কবি প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছেন শ্লেষ ও বিদ্রূপকে। এখানে নগরজীবনে অপসংস্কৃতির ক্রমাগত বিস্তারের কথা জানিয়ে সেসবের বিলোপের আবেদন জানিয়েছেন তিনি নগরপ্রধানের প্রতি। আলোচনার এই প্রান্তে এসে এই কাব্য সম্পর্কে আহমদ রফিকের বক্তব্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। তিনি বলেছেন, '*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*র চরিত্রলক্ষণ ঐ নামেই পরিস্ফুট। বাহাত্তর-পরবর্তী নৈরাজ্যের চাপে ক্ষণিক হতাশা সত্ত্বেও কবিতা বিশ্বাস হারায় না কিংবা বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয় না। চৈতী খরার দাবদাহ সত্ত্বেও মনে হয়, মেঘের দাক্ষিণ্যে শুকনো মাটির বুক সজল হয়ে উঠবে, মধ্যসত্তরেও পুরনো বোধের নতুন মোহনায় জাগরণ অনিবার্য মনে হয়। "স্বাধীনতা" নামক শব্দটি সময়ের জীর্ণ দেহে-মনে দুন্দুভি বাজাতে থাকে।'[৩৩]

ছয়

গত শতকের চল্লিশের দশক ছিল বাংলাদেশের কবিতার জন্য তিরিশ ও পঞ্চাশের সংযোগকারী দশক। আর এই সংযোগকারী সেতু-নির্মাতাদের একজন ছিলেন আহসান হাবীব। পঞ্চাশের বাংলাদেশের কবিদের কাব্যভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছিল চল্লিশের কবিদের কাব্যচর্চার সফলতা। অথচ অনেক কাব্যবোদ্ধা মনে করেন, পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশে যে কাব্যাভিযাত্রা শুরু হয়, তা ছিল রবীন্দ্রত্তোর বাংলা কবিতার সবচেয়ে প্রবল ধারা তিরিশের উত্তরাধিকার। প্রচলিত এই ধারণাটি ভুল নয়। কিন্তু তিরিশের পর হঠাৎ যদি কেউ পঞ্চাশের কাব্যকর্মকেই বাংলাদেশের কবিতার একমাত্র উত্তরাধিকার

Dhaka University Institutional Repository
বলেন, তাহলে চল্লিশের দশককে বাংলা কবিতার জন্য 'অনুৎপাদনশীল' দশক হিসেবে আখ্যায়িত করতে হয়। প্রকৃত অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা, পঞ্চাশের কবিতায় প্রতিফলিত সামাজিক দায়বোধ এবং সমাজ ও রাজনীতি-সচেতনতার বিষয়গুলো প্রথম পাওয়া যায় চল্লিশের কবিদের কবিতাতেই। অবিভক্ত বাংলায় নিজেদের কবিপ্রতিভার স্বীকৃতি আদায় এবং বাংলাদেশের কবিতার পথপ্রতিষ্ঠা—দুটি কাজই তাঁদের করতে হয়েছিল। দেশ-বিভাগের ফলে বাংলাদেশের কবিতার পৃথক সত্তা চিহ্নিত হলেও যে কোনো বাঙালি কবির কবিতা আবহমান বাংলার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করাই যৌক্তিক। সেই দিক থেকে তিরিশের পর অন্যতম প্রধান কবিব্যক্তিত্বের নাম আহসান হাবীব।

রাত্রিশেষ থেকে মন ও মেজাজে যে আধুনিক কবিচেতনা নিয়ে অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন কবি আহসান হাবীব, তার সফলতম রূপায়ণ *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*। এই কাব্যটি কবির সবচেয়ে পাঠকপ্রিয়ও বটে। *রাত্রিশেষের* পর মধ্যবর্তী দু-একটি কাব্যের কিছু কবিতার শিল্পশৈথিল্য যে ছিল সাময়িক, *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* হাতে পাওয়ার পর পাঠকেরা তা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। শব্দযোজনা, ভাষা ও বিষয়ের বৈচিত্র্য, হাজার বছরের চেনা মানুষ, পরিচিত সামাজিক অবয়বকে নিয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে নতুনত্ব, দেখার ক্ষেত্রে গতানুগতিক বলয়কে ভাঙা, ইঙ্গিত ও সংকেত ব্যবহারে শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়া—এর সবই একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায় এই কাব্যের শরীরজুড়ে। ভাষার নতুন ব্যবহার ও বিষয়-বিন্যাসের দিক থেকে সমালোচক-পর্যবেক্ষকেরাও এই কাব্যকেই আহসান হাবীবের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ শিল্পমহিমার দিক থেকে এই কাব্যের যে উত্তরণ, তা সমকালের বিবেচনায় শুধু নয়, বাংলাদেশের কবিতার ক্ষেত্রে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঈর্ষণীয় সাফল্যের স্মারক হয়ে আছে। এ কাব্য সম্পর্কে আহসান হাবীবের কবিতা নিয়ে প্রথম গ্রন্থপ্রণেতা তুষার দাশের বক্তব্যটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ :

> আহসান হাবীবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর'—বাংলা আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রেও যা একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। বিশ্বের অনেক মহৎ কবির শ্রেষ্ঠ রচনার নামসহ উল্লেখের মতো আহসান হাবীবের এই গ্রন্থের জন্যে আমরা তাঁকে 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর'-এর কবি হিশেবেও আখ্যায়িত করতে পারি। শ্রমে, অনুধ্যানে-মেধায়-মননে, প্রকাশভঙ্গীতে, বা বৈদগ্ধ্যে, সংহতিতে আর শিল্প-প্রতিমা নির্মাণে, দর্শনের সূক্ষ্মতায়, শব্দ-কুশলতায় সাঙ্কেতিকতায়—বিস্তৃতি আর পরিপ্রেক্ষিত-রচনায়, সঙ্কল্প-বিশ্বাসের ঋজুতা ও দৃঢ়তায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রয়োগ অসাধারণত্বে, যা পূর্বের কাব্যগুলোতে চূড়ান্ত সিদ্ধি পেতে পারে নি বলেই আমাদের ধারণা। সমাজ-সময়-মানুষ প্রভৃতির সমাবেশের তাৎপর্যময়তায়, উপমা-প্রতীক চিত্রকল্পের সুচারু বিন্যাসে, মহত্তম সত্যের বিশুদ্ধ উচ্চারণে, কবিত্বের আবেগী অহঙ্কারে, আত্মপরিচয় প্রদান আর আত্ম-আবিষ্কারের বিস্ময়কর কল্লোলে তিনি মুখর করে দিয়েছেন বাংলা কবিতার নিস্পন্দ প্রাঙ্গণকে।[৩৪]

অন্যান্য কাব্যের মতো আহসান হাবীবের এই কাব্যের নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ। এই কাব্যনামের মধ্যে যে সাংকেতিকতা রয়েছে, তা আমাদের মানবেতিহাসের একেবারে গোড়ায় নিয়ে যায়; নতুন করে ভাবিয়ে তোলে। সভ্যতার আদিযুগে মানুষ ছিল পাথরের ওপর নির্ভরশীল। জীবিকার জন্য যেসব হাতিয়ার মানুষ ব্যবহার করত, তার প্রায় সবই ছিল পাথরের তৈরি। শিকার করা থেকে শুরু করে আগুন জ্বালানো, খাদ্য-উপকরণকে ভোজন-উপযোগী করা—সবকিছুতে ছিল পাথরের অবিকল্প ব্যবহার। প্রশ্নের উদ্রেক হতেই পারে যে, এই আধুনিক কালে এর তাৎপর্য কী? আমরা আগে থেকেই জানি, আহসান হাবীব শেকড়সন্ধানী-সমাজসচেতন, মানবপ্রেমী কবি। পাথর ব্যবহার না করলেও আমাদের দেশের কৃষকদের যাপিত জীবন এখনো সনাতন। তাদের জীবিকার উপকরণ এখনো সেকেলে। আর তাঁদের কায়িক শ্রম এখনো অবিকল্পভাবে সমাজের সব মানুষকে অন্ন জুগিয়ে যাচ্ছে। সভ্য যুগের জটিলতাহীন, নিষ্কলুষ ওই জীবনের প্রতি কবি আহসান হাবীবের রয়েছে আজন্ম দরদ—পক্ষপাতিত্ব। কবি মনে করেছেন, আধুনিক

Dhaka University Institutional Repository

যুগযন্ত্রণার সময়ে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি নির্ভার। কবিমননে লালিত ঐতিহ্যের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকেন তাঁরাই। সভ্যতার চাকাও সচল রাখেন তাঁরা। অথচ তাঁদের পশ্চাতে রেখে শেকড়বিমুখ মানুষ সভ্য হতে নগরের বাসিন্দা হয়। কবিই এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিনি শারীরিকভাবে নগরের বাসিন্দা হলেও কৃষিজীবী মানুষকে, বাঙালি-সংস্কৃতিকে, ঐতিহ্যকে , ইতিহাসকে, পুরাণকে মননে ধারণ করে মৌলিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ফেলে আসা অতীতের ওপর কবি তাঁর কাব্যশরীর নির্মাণ করতে চেয়েছেন। সমৃদ্ধ অতীতের কাছে ফিরেই তিনি কাঙ্ক্ষিত শান্তি অর্জন করতে চেয়েছেন, যার মধ্য দিয়ে কবি হিসেবে তাঁর প্রকৃত বাঙালিয়ানার পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে। কেননা, তিনি ফিরে যেতে চান মাটির কাছাকাছি। ফেলে আসা গ্রাম, গ্রামের মানুষই তাঁর আপনজন—আসল স্বজন, তা বোঝা যায় তাঁর কাব্যবয়নের সরলতায়। এ প্রসঙ্গে আহমদ রফিকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ...সম্ভবত তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর' গ্রন্থের কবিতাগুচ্ছ।...বঞ্চিত, নিরন্ন জীবনের প্রতি ভালোবাসার টানে বৈঠায় বা লাঙ্গলে হাত রেখে স্বদেশের চিরকালীন মাটিতে শিকড় চালিয়ে এক মহৎ আত্ম-আবিষ্কারের কাজ সম্পন্ন হয় এই ঘোষণায় যে, 'আমি কোনো আগন্তুক নই?' কবি যে এ মাটির চিরকালীন সন্তান এমন প্রত্যয় এ সময়কার বিভিন্ন কবিতায় প্রতিফলিত।...দু'হাতে দুই আদিম পাথর প্রাচীন জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতায় কর্মনিষ্ঠ সংগ্রামী জীবনের প্রতীক, যে-জীবনের আদিম ছায়া এখনও এদেশের গ্রামান্তরে জেগে আছে। এখানে কৃষি-জৈবনিক গ্রামবাংলার সমকালীন অস্তিত্বের পাশাপাশি শ্রমনির্ভর পাথুরে যুগের জীবনসংগ্রামের ঐতিহ্য প্রতিফলিত। তাই ধানের মঞ্জরীর পাশে অকাল-বার্ধক্যে নত কদম আলীর ক্লান্ত চোখের অন্ধকার যেমন সত্য, তেমনি সত্য জমিলার মার শূন্য খাঁ খাঁ রান্নাঘরে শুকনো থালার অস্তিত্ব। এখানে শ্রেণীচেতনার পরিবর্তে কালচেতনাই সমাজচেতনার প্রকাশ সম্পূর্ণ করেছে।[৩৫]

দীর্ঘ চার দশকের কাব্যচর্চায় তিনি মানুষকে নিয়ে সাধনার একটা সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন। আগের কয়েকটি কাব্যে তিনি মাঝেমধ্যে দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। সেসবে কাব্যোপাদান খুব সংযত-সংহতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। তবে এই কাব্যের কবিতাবলির উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে অনেক সংহতভাবে। পরিচিত বিষয়কে তিনি চমৎকারিত্ব দান করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সঙ্গে এখানকার কবিতায় স্থান পেয়েছে উপলব্ধির গভীরতা। প্রতিটি পঙ্‌ক্তি যেন বিশাল পরিপ্রেক্ষিতকে ধারণ করে আছে। শব্দের প্রতি রয়েছে অবিশ্বাস্য নিয়ন্ত্রণ—খুব সহজ-সরল জীবনভাষ্যে তিনি পাঠককে যুক্ত করেছেন বিশেষ সুরের আবহে। মনে হয়, 'পঁয়ষট্টি-উত্তীর্ণ তরুণ-দার্শনিক যেন কথা বলেছেন আহসান হাবীবের কণ্ঠে—কেননা দার্শনিক বক্তব্য থাকলেও নির্ভার ঋজুতা আর তরতাজা তারুণ্যে যেন ঝল্‌ঝল্‌ সবগুলো কবিতাই। সত্যি সত্যিই এ'কাব্যে বাংলা কবিতার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন ত্রিশের দশক আর পঞ্চাশ দশকের মাঝে এক যথার্থ এবং সার্থক সেতু-নির্মাতা, সংযোগ-স্থাপনকারী আধুনিক কবি বাংলাদেশের আহসান হাবীব।'[৩৬] তবে সবকিছুর পরও এ-কাব্যে শেষ পর্যন্ত কবিজীবনের সবচেয়ে বড় যে প্রবণতা, সেই আশাবাদের মধ্য দিয়ে কাব্যের সমাপ্তি ঘটে। শুরুটা তিনি করেছেন "সারা দিন আমি" কবিতার মধ্য দিয়ে। সারা দিনকে যদি গোটা জীবনের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাবে, কবি যে মন-মেজাজে সারা জীবন মৃত্তিকা-সংলগ্ন থাকার প্রয়াস চালিয়েছেন, যার জন্য সমালোচনায় বিদ্ধও হতে হয়েছে, সেই জীবনের কথাই এখানেই বলেছেন তিনি। নিসর্গ, ফুল, মাটি, মাটির ধুলোর সঙ্গে ভালোই কেটেছে তাঁর সময়। কেননা, কবি কবিতার মধ্য দিয়ে স্বকীয় অস্তিত্ব অনুভব করেন। এ ছাড়া কবি এখানে আরো একটি বিষয়ের ইঙ্গিত করেছেন, সেটি হলো মানুষের চিরন্তন গন্তব্য। জীবননাট্যের সমাপ্তি ঘটলে মানুষ তার আপন-ঘরেই ফিরে যায়; যেখানে ধুলোর সঙ্গেই মিতালি করে

Dhaka University Institutional Repository
থাকতে হবে। তবুও, শেষ অবধি আশাবাদের তীক্ষ্ণতা দিয়েই শেষ করেছেন কবিতা। তাই কবিতাই তিনি বলেন :

কেউ বলে তুই দু'চোখ পদ্মপত্রে দেখলিনে জল,
এই যে এত বৃষ্টিপতন রক্তক্ষরণ তবু অটল
রইলি বসে, দেখলিনে এই ধুলোর মধ্যে বাসা রোগের,
জানলিনে এই সারাটা দিন ধুলোর সঙ্গ কি দুর্ভোগের।
কেউ বলে অরণ্যচারী পশুর চোখেই শুদ্ধ আলো
আমার কিন্তু ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে যাওয়াই লাগছে ভালো।

("সারা দিন আমি", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

রাত্রি শেষ করার মধ্য দিয়ে যে স্বাপ্নিকতার পরিচয় কবি দিয়েছিলেন, সেই স্বপ্নের আক্ষরিক বাস্তবায়ন ঘটলেও কবি দেশের মধ্যে সত্যিকারের স্বস্তিকর পরিবেশ কখনো পাননি। কিন্তু তাতে কী। কবি এর পরও দেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে চেয়েছেন, এমনকি সংগ্রামেও পাশে থাকতে চেয়েছেন। এমনকি 'প্রস্তরে ছিলাম' বলে কবি যেন আদিম পাথুরে যুগের বাসিন্দা হয়ে স্বপ্নের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে ইতিহাস চেতনার প্রতি কবির ইঙ্গিতও স্পষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করত, কবি মৃত্যুকে লঙ্ঘন করার মধ্য দিয়ে সেই আদিম সাম্যবাদী সমাজে নিয়ে যান পাঠককে। কবি সেই থেকেই আজ অবধি সেই 'স্বজনলোকের' সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। "আমি আছি" কবিতা ওই ভাবনারাশিরই অভিজ্ঞান।

আমাকে পাবে না এই মৃত্তিকার গহ্বরে, কেননা
আমি এই মৃত্যুকে লঙ্ঘন করি বারম্বার
মৃত্যুকে লঙ্ঘন করে বহমান ইতিহাসে যাই
এবং নিজেকে আমি বারম্বার পারে হয়ে ইতিহাসে লগ্ন হই
ব্যাপ্ত হই তোমাতে এবং তোমার স্বজনলোকে। আমি
তোমার অস্তিত্বে গাঁথা। খররৌদ্রে ঝড়ে ও বর্ষায়
আজন্ম তোমার সঙ্গী, আমি নই তুমিই আমার
প্রতিবিম্ব। আমি প্রস্তর অরণ্য আর ধাবমান হরিণের কাল
পার হয়ে অবিশ্রান্ত তোমাতে ধাবিত

("আমি আছি", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

কবিতার খানিকটা অংশে এভাবে তিনি মানবেতিহাসের প্রারম্ভ থেকে সম্মুখ গতিধারাকে ধারণ করেন। ত্রিকালের পাঠকের সঙ্গে কবিতার মাধ্যমে যোগাযোগে পারঙ্গম কবি আহসান হাবীব। মহাকালের প্রবহমান ধারায় অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে সংযুক্ত করেন তিনি ইতিহাসের সহায়তায়। তিনি স্বপ্ন আর সংগ্রামকে একাকার করে সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় ইতি টানেন কবিতার। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে কবি অতীতের ঐতিহ্যে লীন করতে চান। এই কাব্যের কবিতায় আরোপিত বিষয়ের বৈচিত্র্যের চেয়ে প্রকাশের চমৎকারিত্বটা বেশি। তাই কাছাকাছি বিষয় নিয়ে কবিতা লিখলেও প্রকাশনৈপুণ্যে তা আলাদা মাত্রা অভিষিক্ত হয়। তেমনই একটি কবিতা "আবহমান"। কবিতায় সাধারণ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে কবি নিজের শেকড়কে যেমন চিনিয়েছেন, তেমনি একটা ক্ল্যাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। বলতে দ্বিধা নেই, এই শাশ্বত চেনা মানুষ, চিরচেনা গ্রাম-বাংলাই কবিকে নস্টালজিক করে তুলেছে। কবি তাদের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছেন। তবে একথা ঠিক যে 'বুর্জোয়া সমাজ, শোষিত সমাজের ক্ষত, অস্তিত্বহীন

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের দিশেহারা দৃষ্টি কবিতার প্রতি ছত্রে লেগে থাকে।...খালেক নিকিরি, ভুবন কামার এরা গ্রামের মানুষ। আবহমান গ্রাম; এক সময় যেখানে ছিল সামন্তবাদী জমিদারের শাসন, প্রচলিত কাঠামোয় যুক্ত করে যারা ভূস্বামীদের নিকট নিজেদের সমর্পিত করেছিল, দীর্ঘ সময়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে অনেকেই; নগরের ভুঁইকোঁড় আধুনিকতার জ্বলজ্বলে আলোতে অনেকেই একভাবে বেঁচে থাকে; হয়তো অনেকের সর্ব-নিশ্চয়তায় হয়ে উঠেছেন নব্য-পুঁজিপতি কিন্তু গ্রামের সামন্তবাদ ওঠেনি—ভিন্ন প্রক্রিয়ায় তা জেঁকে বসেছে আলেফ মুনশীর মেয়ে সখিনার কাঁধে।'[৩৭] আহসান হাবীবের ইতিহাস-চেতনা নতুন নয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই তিনি ইতিহাসের প্রতি যত্নশীল—ইতিহাসকে কবিতার প্রকরণে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট দায়িত্বশীল। জীবনানন্দ দাশ তাঁর বিখ্যাত "বনলতা সেন" কবিতায় যেমন হাজার বছর পার হয়ে নাটোরে এসে স্থিত হয়েছিলেন, তেমনি আহসান হাবীব নীলনদের তীরে গড়ে ওঠা খু-ফুর সাম্রাজ্য, বেবিলনীয় সভ্যতা পেরিয়ে স্বজনে গা-ছুঁয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে চেয়েছেন "যতবার ভোর হলো কবিতায়"।

এ-কাব্যের অন্যতম প্রধান বিষয় সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান চিত্রিত করা। এর আগে আমরা *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যের কিছু কবিতায় এই প্রবণতা লক্ষ করলেও তা এত স্বচ্ছ, এত স্পষ্ট ছিল না। কবি নিজেও ছিলেন সমাজের এই মধ্যশ্রেণির প্রতিনিধি। তাই মধ্যশ্রেণির মানসিক প্রবণতা, তাদের দোলাচলতা, সব সময় সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার প্রচেষ্টা, অনেক সময় সংকটকালে পলায়নপর মনোবৃত্তি—এসব সম্পর্কে কবির নির্দিষ্ট কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে। সেই অনুযায়ী কবি মধ্যবিত্তের আসল চিত্তবৃত্তিকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। নিজে তাদের একজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি মধ্যবিত্তের 'স্ব নির্মিত দেয়াল' উন্মোচিত করে গেছেন। তাদের নিয়ে কবিতায় ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েননি কবি। এটা সত্যি, সব সময় টানাপোড়েনের মধ্যে থাকতে হয় সামাজিক স্তরায়নের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকা এই শ্রেণিকে। আবার তাদের চারিত্র্যও যে স্বেচ্ছানির্মিত বলয় দ্বারা পরিচালিত, সে বিষয়টিও উন্মুক্ত করে গেছেন তিনি। "থাকো মধ্যম সারিতে" কবিতার বিশেষত্ব এখানেই। একই বিষয়ের আরেকটি কবিতার নাম "পালাতে পালাতে", যেখানে শুধু মধ্যবিত্ত নয়, নগরজীবনের অন্তঃসারশূন্যতাকে কটাক্ষ করেছেন কবি। মূলত এ দুটি কবিতায় মধ্যবিত্তের শ্রেণিকরণকে নির্দিষ্ট ধাঁচে নিরূপণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বিনম্র কণ্ঠস্বর সত্ত্বেও তিনিই প্রকৃতপক্ষে সমাজের এই শ্রেণির চরিত্রটি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর তাই তাদের বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি। তুমুল সামাজিক সংকটকালেও মধ্যশ্রেণির মানুষগুলো আত্মগোপনে কিংবা পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করে থাকে। তাদের এই প্রবণতাকে কবি বালক-স্বভাবী বলেছেন। সমাজ যখন ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ, উত্তাল যখন পরিপার্শ্ব, তখন চাইলেই কি বাঁচা যায় ? কবি এই প্রশ্নই সরাসরি ছুড়ে দিয়েছেন সমাজের মধ্যসত্তাকে। কবির ভাষায় :

থাকো মধ্যম সারিতে তুমি
সামনে চোখ
পেছনে প্রবল থাবা টেনে নেয় প্রচণ্ড আক্রোশে
বারম্বার সামনে নামে ধস্।
দিনরাত্রি টানাপোড়েনের খেলনা
আছো তুমি স্বনির্মিত খাঁচার কবলে।
... ...
তুমি যতই সাবধানে দাও হামাগুড়ি, তুমি
যতই সন্তর্পণে পা রাখো মসৃণ পথে
কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথের তীক্ষ্ণ কামড় দু' পাশে, তুমি
এড়াবে কি করে?

("থাকো মধ্যম সারিতে", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবিত্ত নিয়ে কবির এই ভাষ্য কোনো দার্শনিক দিক থেকে নয়। তাঁর এসব দৃষ্টিভঙ্গি জীবনাভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধিরই ফসল। যেমন: গ্রাম থেকে শহরের বাসিন্দা হওয়া শিক্ষিত উন্মূল মধ্যবিত্তের প্রতি শেকড়-সন্ধানী কবি-হৃদয়ের অকৃত্রিম অভিব্যক্ত প্রকাশ পেয়েছে "যাবার আগে" কবিতায়। "তুই" বলে কবি যেন নিজেরই অন্য সত্তাকে সম্বোধন করেছেন। কিংবা সেই সময়ের শহরমুখী ভাবী নাগরিক নতুন প্রজন্মের উদ্দেশেই জানিয়েছেন আবার ফিরে আসার আকুতি। কারণ শেকড়-বিমুখ অস্তিত্ব-অসচেতন স্বপ্ন নিয়ে বেশি দূর এগোনো যায় না। সর্বোপরি গ্রাম্য এক কিশোরের স্বপ্নগাঁথা জীবনের কথা বলতে গিয়ে কবি নিজে যেমন ফিরে গেছেন 'আত্মবিবরে', তেমনি 'রূপালি শিশির', 'ধানের শীষ', 'টিয়ে পাখির রঙ', 'বটবৃক্ষের ছায়া'র কথা না ভুলে স্বপ্নের বন্দরে যাওয়ার কথা বলেছেন। এই আহ্বান যেন কোনো একজন বালকের প্রতি নয়, কেউই যাতে স্বপ্নের কথা বলে স্বপ্ন থেকে দূরে না সরে যায়, কেউই যেন প্রকৃত 'স্বপ্ন বেচে দিয়ে দুঃস্বপ্ন' না কেনে, সেই বিষয়টিই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি নিজের অভিজ্ঞতার বিনিময়ে :

যা তুই, ভোরের রোদ পোহাতে পোহাতে যা রে
যতদূর ইচ্ছে চলে যা।

পুরনো কাঁথার উম একলা প'ড়ে থাক। তুই
মার রাত্রে ঢেকে রাখা গরম উনুন ছেড়ে
ঘর থেকে নেমে
নগ্ন শিশিরে রাখ। চ'লে যেতে যেতে
মাকে বল, 'আসি', মাকে কখনো বলিসনে 'যাই'
... ...
মনে রাখবি যে যায় সে ভাটার পথিক আর
ফিরে আসা মানেই জোয়ার, তবে যা!

("যাবার আগে", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

এই কবিতাটিরই পরিপূরক আরেকটি কবিতা "ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে"। এই কবিতাটিকেও দুইভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কবি এ ধরনের প্রায় সব কবিতাতেই 'তুমি' বা 'তোমরা' কিংবা 'তোমার' সম্বোধন করে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে কবি নিজের সম্বন্ধেও অনেক কিছুই বলেছেন। তাই ধরে নেওয়া যায় কবি মাঝেমধ্যে নিজের আরেকটি সত্তাকেও 'তুমি' সম্বোধন করেছেন। এই কবিতার বিষয় আগের দুটি কবিতার কাছাকাছি হলেও প্রকাশভঙ্গিতে বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এখানে কবি বন্ধু-স্বজনদের, যাঁরা শেকড়ে ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলেন কিন্তু আর ফিরে আসেননি, তাঁদেরকে স্মরণ করেছেন। পূর্ণ বয়সী কবি শেষবেলায় যখন দেখছেন তাঁর আশপাশে কেউ নেই—তিনি ভুগেছেন একাকিত্বে। তাই একসময় কবি তাঁর না-ফেরা বন্ধু-স্বজনদের উদ্দেশ করে বলে ওঠেন :

মাঝে মাঝে তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। তুমি
কাম্যু কাফ্‌কা জাঁ পল সার্ত্রের কথা বলো
নানাবিধ জটিলতা এবং যুদ্ধের কথা বলো
কিছু কিছু দ্বন্দ্ব সমস্যার কথা বলো...
আমারও একটাই সমস্যা
তুমি জেনে গিয়েছিলে।
... ...
স্মৃতিহননের এক উন্মত্ত খেলায় তুমি তোমার বিবরে
আমি এই খা-খা মাঠ শুকনো নদী ধূসর বনানী
মৃত নীল পাখি নিয়ে একলা পড়ে আছি। তুমি
জলস্রোত শস্যবীজ সবুজতা এইসব নিয়ে
ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে।

("ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

Dhaka University Institutional Repository

এই কবিতার নায়ক হিসেবে যাকে কবি শনাক্ত করেছেন, তা মূলত বর্তমানে আমাদের বড় সমস্যা। কেননা, উন্নতির ছোঁয়া পেলেই আমরা অতীতকে ভুলে যাই। ভুলে যাওয়ার এই প্রবণতায় আমরা একসময় ইতিহাসের দিকেও ফিরে তাকাই না। ফলে ক্রমাগতভাবে আমরা শিকড়-বিমুখ জাতিতে পরিণত হতে বসেছি। এই কবিতা সম্পর্কে তুষার দাশ বলেছেন :

> আগে তবু গ্রাম-শহরে ক্ষীণ হলেও একটা যোগাযোগ ছিল—এখন সেটিও গেছে কেটে। এ'জন্যে কবি দায়ী করেছেন এই কবিতার নায়ককে—যে তার সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পাশ্চাত্য-জীবনযাপন ও পাশ্চাত্যভূমির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে। এরা হচ্ছে গ্রাম থেকে উঠে আসা হঠাৎ গড়ে ওঠা ইন্টেলেকচুয়াল, এরা গ্রামের মানুষের কাছে বহুভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ অব্দি ভুলে যায় তাদের পেছনে ফেলে আসার মুখের ছবি—গ্রামের মানুষ, আত্মীয়-স্বজন প্রতীক্ষায় থাকে—কিন্তু ওরা আর ফেরে না—আর ওদের এই না ফেরার, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের বেদনা বহন করে প্রায় অশিক্ষিত, সহজ-সরল গ্রামের মানুষ।[৩৮]

উপর্যুক্ত বক্তব্য পুরোপুরি সঠিক না হলেও অনেকাংশই বর্তমান সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। কারণ শেকড় ও স্বকীয় সংস্কৃতি বিমুখতায় ধারাবাহিকভাবে আক্রান্ত আমাদের জাতি। কবি হিসেবে আহসান হাবীব তিন দশকের বেশি সময় আগে সেই উদ্বেগের কথা কবিতায় শিল্পিত কৌশলে প্রকাশ করে গেছেন।

এ কাব্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে প্রাচীন অ্যাসিরীয় সাহিত্যের বিখ্যাত মহাকাব্য *গিলগামেশ* মহাকাব্যের কাহিনী নিয়ে রচিত কবিতা "গিলগামেশ কাহিনী"। গিলগামেশ[৩৯] হচ্ছে তার নায়ক। এক দেবীর ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান করায় দেবীর শাপগ্রস্ত হয় গিলগামেশ। একপর্যায়ে তার জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ সংকট। একটা সময় গিলগামেশ একা হয়ে যায়। কিন্তু এখানে সেই প্রেক্ষাপটকে কবির নিজের জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ করে প্রকাশের প্রয়াস লক্ষণীয়। কবিও একসময় একা হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ বন্ধু-স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায়ই তাঁর থাকার কথা ছিল। শেষাবধি কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ফিরে যেতে হয়েছে সেই শেকড়ের কাছে। কিন্তু কবির ভালোবাসা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর কারো নেতিবাচক ভূমিকার কারণে কবিকে এই একাকিত্ব বরণ করতে হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট নয়। আর যে চিত্রকল্প নির্মিত হতে দেখি, সেটা একেবারে এ দেশীয়, অ্যাসিরীয় নয়। পৌরাণিক কাহিনী ব্যবহারে এটা একটা সফলতারও দিক। তবে এখানে ভালোবাসা-বিষয়ক চিত্রটা বিপরীতধর্মী হিসেবে ফুটে উঠেছে। কেননা, এখানে কবিকে ভালোবাসার কাঙাল মনে হয় :

ভালোবাসা ভালোবাসা বলে আমি গেলুম এগিয়ে
তাকে কোথাও দেখি না। আমি
যতই সামনের দিকে চলে যাই
একে একে সব
সঙ্গীরা হারিয়ে যায় একা পড়ে থাকি।
... ...
প্রাসাদ জলসাঘর সরোবর এইসব ছেড়ে
বিধ্বস্ত খামার আর মলিন ফুলের রেণু
পার হয়ে আমিও একজন গিলগামেশ।
... ...
একটা ঘোড়া জোয়ান অথচ তার এক পা নেই, তবু
প্রবল বিক্রমে যায় ছুটে যায়
যেতে যেতে বলে

Dhaka University Institutional Repository

ফিরে যাও, ফেরার পথেই
ভালোবাসা অপেক্ষায় আছে।

("গিলগামেশ কাহিনী", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

নস্টালজিয়া এবং নতুন প্রজন্মের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা বিবেচনায় নিয়ে "কিছু কিছু চিত্রকল্প আছে" কবিতাটি রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। কবির জীবনজুড়ে অর্জিত হওয়া ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা অভিজ্ঞতাকে এই 'চিত্রকল্প' শব্দটির মধ্য দিয়ে ধারণ করেছেন কবি। তবে তিনি তাঁর জীবনপথের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে নয়, ভবিষ্যৎকে আলোড়িত করা যাবে—এমন অভিজ্ঞতাই নতুন প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে চান। যা থেকে তারা এগিয়ে যাওয়ার সম্বল খুঁজে নিতে পারে। তিক্ততা, দুঃখ-বেদনা-গ্লানিকে কবি নিজের ভেতরেই বন্দী রাখতে চেয়েছেন। আর নতুন প্রজন্মের জন্য ঐতিহ্যের সম্ভার আর 'ভাতের উষ্ণতা' ও 'সৌরভের কথা' রেখে যেতে চান। কবির বক্তব্যেই বিষয়টি খুব স্পষ্ট :

কিছু কিছু চিত্রকল্প আছে আমার নিজস্ব
আছে আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে
স্থির জলে অস্থির পালঙ্ক আছে
... ...
কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে,
কয়েকটি ধর্ষণের কাহিনী
তোমাদের জন্যে নয়।
তোমাদের আমি শেষরাত্রির পাখিদের কথা বলবো
অবিলম্বে দরজা খোলার কথা বলবো।
আমি তোমাদের শোনাবো
শাদা ভাতের উষ্ণতা আর সৌরভের কথা
আর হাওয়া বৈরী হাওয়ার আগেই
ভাতের থালা সন্তর্পণে ঢেকে রাখবার কথা জানাবো।

("কিছু কিছু চিত্রকল্প আছে", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

এখানে কবি নিজের সংগ্রহে রাখছেন অস্থির পালঙ্ক, ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড, রক্তপাতের মতো তিক্ত অভিজ্ঞতা কিন্তু উত্তরসূরিদের জন্য কামনা করেছেন সুস্থতা। তবে তিনি ভালোবাসা ও আঘাত–বিপরীতধর্মী দুটি বিষয়কে পাশাপাশি রেখেছেন তাদেরকে সতর্ক করার জন্যই। কবির বক্তব্য:

আমি তোমাদের ভালোবাসার কথা শোনাবো
ভালোবাসা, তাই আঘাতের কথা আমি তোমাদের শোনাবো।

তোমাদের জন্যে এই সব:
এই পাশাপাশি দাঁড়াবার চিত্র
সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনের এই চিত্র।

("কিছু কিছু চিত্রকল্প আছে", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

তবে "আমি কোনো আগন্তুক নই" পাঠান্তে এই বিশ্বাসে সহজেই উপনীত হওয়া যায় যে এই কবিতাটিই হচ্ছে এই কাব্যের সারবস্তু ধারণকারী কবিতা। বিভিন্ন কবিতায় অন্য যেসব বিষয়ের অবতারণা কবি করেছেন, তার মধ্যে প্রায় সব বিষয়ই ছুঁয়ে গেছে শব্দ, ধ্বনি, উপমা, চিত্রকল্প প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। অতীতচারিতা, নিসর্গপ্রেম, ঐতিহ্যে ফেরার তাগিদ, দেশপ্রেমের দৃঢ়তা, চেনা স্বজনদের কাছাকাছি থাকার ঘোষণা, গ্রামীণ আবহ, মাটি ও প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিজের অস্তিত্বকে নিবিড় করার প্রয়াস, নীড়ে ফেরার আকুতি—এর সবই ব্যক্ত হয়েছে 'আমি কোনো আগন্তুক নই' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। সর্বোপরি, তিনি

Dhaka University Institutional Repository

নীড়ে ফেরার কথা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মাতৃত্বের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা বলার সামর্থ্য রাখেন, সেই বিষয়টিই যেন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এই কবিতার মধ্য দিয়ে। 'আমি কোনো আগন্তুক নই' অর্থাৎ তিনিই এইসব বলার অধিকার রাখেন। এর অর্থ আগে যেমন ছিলেন মাটি-মানুষের সংলগ্ন, এখনো তেমনই আছেন। যে যা-ই বলুক, তিনি যে তাঁর স্বকীয়তায় গড়া অস্তিত্ব থেকে কখনোই সরে যাননি, মনে-প্রাণে ছিলেন এই দেশেরই, এই সমাজেরই একজন, সেই কথাই স্পষ্ট করে বলে গেছেন দৃঢ়তার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন তাঁর *সেঁজুতি* কাব্যের "পরিচয়" কবিতায় বলে গেছেন, 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,/ আমি তোমাদেরই লোক,/আর কিছু নয়—এই হোক শেষ পরিচয়'। কবি আহসান হাবীবও তেমনি তাঁর চিরচেনা প্রকৃতিবেষ্টিত নিবাস আর চিরকালীন বাঙালি স্বজনদের সামনে রেখে বলতে পারেন :

আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পুবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থিরদৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে
আমি কোনো আগন্তুক নই
("আমি কোনো আগন্তুক নই", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

তাঁর অস্তিত্ব এই দেশের আলো-হাওয়ায় গড়ে উঠেছে—এটি যেন তারই আত্মঘোষণা। তিনি ইতিহাস-চেতনা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সবকিছুকে নিজে ধারণ করে, এমনকি 'খোদার কসম' খেয়ে তাঁর শেকড়কে চেনাতে চেয়েছেন। তিনি যে বারবার ফিরে যেতে চেয়েছেন আপন বিবরে, তার কারণ তিনি মনোচিত্তে তা ধারণ করেন। কিন্তু তিনি যে কোনো 'আগন্তুক' নন, তা কেন এমন শোরগোল করে বলতে হলো তাঁকে। তিনি তো শুরু থেকেই এই দেশের সমাজ-সংস্কৃতি-মানুষকে নিয়ে কবিতা-শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। তারও একটা প্রেক্ষাপট আছে।[৪০] তবে তিনি এও প্রমাণ করে গেছেন, মাটির সুবাসের সঙ্গে কেমন আত্মীয়তা থাকলে, তা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। কৃষিজীবী মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক কতটা নিবিড় থাকলে লাঙলে-বৈঠায় হাতের স্পর্শ লেগে থাকে, তা তাঁর কথন-ভঙ্গি দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। দেশজননীর অনাবিল সৌন্দর্যে 'মুগ্ধ এক অবোধ বালক'-এর মতোই মন-প্রাণ উজাড় করে এই মাটি-মানুষের অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্বকে লীন করতে তিনি আজন্ম প্রয়াস চালিয়েছেন, তারই বড় দৃষ্টান্ত এই কবিতাটি। তিনি বাঙালি কবি, বাংলাদেশের কবি, সর্বোপরি তিনি শেকড়-সন্ধানী কবি। তাই তিনি বলেন:

কার্তিকের ধানের মঞ্জরী সাক্ষী
সাক্ষী তার চিরোল পাতার
টলমল শিশির, সাক্ষী জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা
নিশিন্দার ছায়া
অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলী
তার ক্লান্ত চোখের আঁধার
আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন। আমি
জমিলার মা'র
শূন্য খা খা রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি
সে আমাকে চেনে।
হাত রাখো বৈঠায় লাঙলে, দেখো

Dhaka University Institutional Repository

আমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে কেমন গভীর। দেখো
মাটিতে আমার গন্ধ, আমার শরীরে
লেগে আছে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস।

("আমি কোনো আগন্তুক নই", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

কবি আহসান হাবীব সর্বোপরি দেশ-কালের মাটিলগ্ন থাকতে চেয়েছেন আজন্ম। তিনি এ দেশেরই জলে, আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা এ দেশেরই সন্তান। কবি এই কবিতার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি-নিসর্গের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং এই মাটি-জল-হাওয়ার জন্য নিজেকে অপরিহার্য এক সন্তান হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেননা, আত্ম-আবিষ্কারের ঋজু চেতনা তাঁর মধ্যে প্রাগ্রসর। নিসর্গ-প্রকৃতি আর মানুষের অবিশ্রান্ত মুখরতা এবং ঐতিহ্যকে সাক্ষী মেনেও কবি নিজেকে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন।

সাত

আহসান হাবীবের কবিজীবনের ব্যতিক্রমী সংযোজন *প্রেমের কবিতা* (১৯৮১)। *রূপসী বাংলা* (১৯৫৬) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর যেমন জীবনানন্দ দাশকে নতুন করে চিনতে হয়েছিল, তেমনি আহসান হাবীবও নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করেন *প্রেমের কবিতা* প্রকাশের পর। প্রায় চার দশকব্যাপী যিনি সমাজ-চিন্তনশীল কবিতা দিয়ে মুখর রাখলেন বাংলা কবিতার জগৎ, তিনি কিনা এক নিখাদ প্রেমিক কবি হিসেবে আবির্ভূত হলেন ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের একেবারে পরিণত বয়সে। কবিদের এই প্রবণতা, যাকে বিশেষায়িত অর্থে বলা হয় রোমান্টিকতা, তা সচরাচর সৃষ্টির প্রথম পর্যায়েই সূচিত হয়। দিনে দিনে তা হয় পরিণত এবং আরো সমাজনিবিষ্ট। কিন্তু আহসান হাবীব তাঁর *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যে চূড়াস্পর্শী সফলতার পর বাংলা কবিতায় নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন এই কাব্যটি প্রকাশের মাধ্যমে। প্রেমের কবিতা তো প্রায় সব কবিই লিখেছেন। এর আগে প্রেমের কবিতা আহসান হাবীবও লিখেছেন দু-একটি, অন্য কবিতার বইয়ের মোড়কে আমরা সেসবের পরিচয় পেয়েছি। প্রেমকে বৃহত্তর পরিসরে—মানবপ্রেম, দেশপ্রেম, বাৎসল্য প্রেম বিবেচনা করলে, সে সংখ্যা আরো বেশি; কিন্তু নর-নারীর প্রেম হিসেবে গণ্য করলে অন্য কবিতার বইয়ে তা আলাদা মাত্রা সৃষ্টি করেনি। তবে তাঁর *প্রেমের কবিতা* সন্দেহাতীতভাবেই আলাদা মাত্রা সৃষ্টি করেছে। কেননা, শুরু থেকেই যে মানুষটি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে পুঁজি করে কবিতা লিখেছেন, অনর্গল বলে গেছেন সময়ের সংকট আর সম্ভাবনার কথা, মানুষকে নিয়ে আশাবাদের কথা, তাঁর লেখা প্রেমের কবিতাও তো অন্য কবিদের মতো শুধু কল্পনাবিলাসী হতে পারে না, হয়ওনি। কাব্যের প্রারম্ভেই, কেউ কিছু ভাববার আগেই—উৎসর্গপত্রেই সেসব কথা অবলীলায় বলে গেছেন তিনি। মূল প্রবণতার কবিতার মতোই এসব কবিতা রচনার পেছনেও রয়েছে বাস্তব ভিত্তি। একজন সৎ কবি বলেই সম্ভব হয়েছে ব্যক্তিগত জীবনের ভালোলাগা-ভালোবাসার কথা অকপটে স্বীকার করা। এমনকি এটাও বোঝা যায়, এসব প্রেমের কবিতায় অঙ্কিত প্রেমিক-নায়ক চরিত্রটি আর কেউ নন, কল্পনার আবেশে মাখা কিন্তু শিল্পিত রক্তমাংসের মানুষটি কবি নিজেই।

আহসান হাবীব মূলত প্রেমিক কবি হয়ে উঠেছেন এই কাব্যের মধ্য দিয়ে, যার ছিটেফোঁটা লক্ষণও আগে বোঝার উপায় ছিল না। আর উৎসর্গপত্রই বলে দেয়, ভাবনার ভেতরে কিশোর বয়স থেকে শুরু করে কাব্য প্রকাশের আগ পর্যন্ত যেসব নারীর প্রতি কবির ভালো লাগার অনুভূতির জন্ম হয়েছে কিংবা যেসব নারী কবির সংস্পর্শে এসেছেন অথবা যেসব নারীর সঙ্গে ভালোলাগা-ভালোবাসার পারস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে—কবিজীবনের দীর্ঘ সময়জুড়ে, তাদের নিয়েই নির্মিত হয়েছে *প্রেমের কবিতা*। পূর্বেকার কাব্য প্রকাশের একই সময়ে হয়তো তিনি ঠিকই লিখে গেছেন প্রেমের কবিতা। কিন্তু তা প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

না করে তিলে তিলে সঞ্চয় করেছেন নিজেকে বিশেষভাবে তুলে ধরার জন্য। দু-একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া এ-কাব্যের অধিকাংশ কবিতা পাঠের পর আগেকার বাস্তববাদী, সমাজবাদী, রাজনীতি-সচেতন, দেশপ্রেমিক আহসান হাবীবকে চেনা যায় না। বুঝে নিতে হয়, এখানে অন্য ভুবনের অন্য এক আহসান হাবীবের আবির্ভাব ঘটেছে। যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েই যে তিনি এই পর্বের যাত্রা শুরু করেছিলেন, এতে এ বিষয়টিও স্বীকৃত হয়।

বাস্তবের এসব নারী হয়তো কখনো প্রেয়সী হিসেবে এসেছিলেন তাঁর জীবনে। হয়ত সৃষ্টি হয়েছিল পাওয়া না-পাওয়ার বেদনা। এসব নিয়ে আনন্দ-বেদনাময় প্রেমানুভূতির কথকতাই ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে এ-কাব্যের কবিতায়। এইসব নারী কবির জীবনকে নানাভাবে আলোড়িত করেছিলেন। এই স্বীকারোক্তিই কবি অকপটে করেছেন তাঁর উৎসর্গপত্রে। তবে এ-কাব্যের উৎসর্গপত্র শুধু উৎসর্গপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং শব্দচয়নের সৌকর্য, ভাষার সাবলীলতা আর ইঙ্গিতের আবহ নির্মাণের কারণে উৎসর্গপত্রটি নিজেই কবিতা হয়ে উঠেছে। একজনকে সম্বোধন করে অনেকের মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিনব প্রয়াস বিরল দৃষ্টান্তের দাবি রাখে। কবির বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবনা ধরা পড়া এ-কাব্যের প্রথম সংস্করণে উৎসর্গপত্রটি এ রকম :

> সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় সুচরিতাসু
>
> চল্লিশের দশকে আপনি থাকতেন হাজরা রোডে এখন কোথায় জানা নেই। রসা রোডের দিকে এগিয়ে এলে ডানদিকের একতলা শাদা বাড়িটায় টুনুরাও থাকতো মনে পড়ে? যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়, বলবেন, আমি এই বইটি ওর নামেই উৎসর্গ করেছি। আর আপনি যদি মনে করেন, একটু ঘুরিয়ে এ বই আমি আপনারই নামে উৎসর্গ করছি, ভালো লাগবে তাও। তবে রিচি রোডে এ সবের কিছুই জানাবেন না; জবাবদিহি করে হয়রান হয়ে যাবো। আপনার ছোট বোন শ্রীলেখাকে কিছু বলবেন কি বলবেন না সে ভাবনা আপনার। আর আমার স্ত্রীকে যা বলবার আমিই বুঝিয়ে বলবো। অবশ্য এত কথা যখন উঠছেই তখন কৈশোরের জোবেদা, নূরজাহান, রমলা আর প্রথম যৌবনের সেই সরুচেন শ্যামলাঘাড়, আরো সেই যে কলেজের পথে প্রায় নিত্যসঙ্গী নাম না জানা শ্যামাঙ্গিনী এরাই বা...আসলে কি জানেন? এই উৎসর্গ ফুৎসর্গের ব্যাপারে যাওয়াই উচিৎ (sic) হয়নি।[৪১]

বোঝাই যাচ্ছে, এক-দুজন নয় আরো অধিকসংখ্যক নারী তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, যাঁদের প্রায় সবাইকে নিয়ে লিখিত কবিতার আয়োজনই *প্রেমের কবিতা*। কবির জীবদ্দশায়েই যে গ্রন্থটি পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল, তা স্পষ্ট হয় কবিকর্তৃক এর দ্বিতীয় সংস্করণেও উৎসর্গপত্রেই আবার কিছু সহজ-সাবলীল এবং শাশ্বত স্বীকারোক্তি দেখে। গদ্যে সাজানো উৎসর্গপত্রের প্রতিটি বাক্যেই রয়েছে অনিন্দ্যসুন্দর কবিতার স্বাদ। ব্যক্তিগত সম্পর্কের সব মানুষই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা 'স্মৃতির পাতায় অমলিন' হয়ে আছেন কবির অন্তরে। পাঠকের কাছে যে অলিখিত কৈফিয়ত দিয়েছেন তিনি, সেখানেও তিনি সততার সঙ্গে সৃজনে-মননে অভিন্ন থাকার চেষ্টা করেছেন। কারণ উৎসর্গপত্রের চরিত্রগুলো কেউই অবাস্তব নয়। তিনি শুধু নিজের প্রেমের কবিতা নিয়ে নয়, মানুষের ভেতর প্রেম-রূপায়ণের ছোট্ট কিন্তু চিরন্তন একটা ব্যাখ্যাও দাঁড় করান। সামাজিকভাবেই নর-নারীর প্রেমকে খুব স্পর্শকাতর হিসেবে দেখার দরুন এ নিয়ে আমাদের সমাজে একধরনের পলায়নপর মনোবৃত্তি কাজ করে। পরের সংস্করণের উৎসর্গপত্রে কবির কথা সেইসব বিষয় নিয়েও। এখানে তার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এড়ানো যায় না। একেবারে শুরুতেই কবি বলেছেন :

> প্রেমের স্বভাবে আছে একজন যাযাবরের বাস এবং এই সত্যটি আমরা প্রায়শ অস্বীকার করি। কৈশোরিক আবেগটাবেগ বলে তুচ্ছ জ্ঞান করি একদিকে প্রবলতর অতীতকে অপরদিকে বর্তমানটি থাকে কখনো আত্মপ্রতারণা, কখনো পলায়নপরতার কবলে। 'তুমিই জীবন তুমিই মরণ।' ঘোষণা করে একদিকে একজনের সামনে নতজানু যখন, তখনো কখনো কখনো দু-কাঁধের পাশ ঘেঁষে 'পাখির নীড়ের মতো' দুটি চোখ জ্বলতে-নিভতে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

আসলে আমরা অতীতকে কখনো মুছে ফেলি না এবং তার পরেও সারা জীবনই সময়ে অসময়ে প্রেমে পড়ি আর একজনকে না একজনকে সারা জীবনই ভোলাতে থাকি।...এ কথা তাই শপথ করে বলা যাবে না যে, আমার সবগুলো প্রেমের কবিতারই উৎস বা প্রেরণা একজনই। এবং এ কারণেই বিচিত্র দুর্লভ কতগুলো সকাল-বিকেলকে পূর্ণাঙ্গ এক জীবনের মতো করে গাঁথতে চেয়েছিলাম প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্রে।...আমার স্ত্রীর প্রসঙ্গও এসে যায় এবং আরো কিছু প্রসঙ্গ আসবার আগেই উৎসর্গ-পত্রটি প্রত্যাহার করে নেয়ার একটা কৌশল প্রয়োগ করি এই বলে যে,... 'আসলে কি জানেন? এই উৎসর্গ-ফুৎসর্গের ব্যাপারে আসাই উচিত হয়নি।'

উৎস যখন এক নয় আর 'কার প্রাপ্য কাকে দিই' এই যখন ভাবনা, তখন থাক না এ বই সেই নাম করা আর নাম না করা সকলের জন্যেই।[৪২]

এই কাব্যের কবিতাগুলোর প্রধান বিষয় হিসেবে ধরা পড়েছে মানব-মানবীর প্রেম। তবে বিষয়ের ক্ষেত্রে তেমন বৈচিত্র্য না থাকলেও রয়েছে চমৎকারিত্ব। যেমন শুরুতেই "ভালোবাসা নাম" কবিতায় স্বাভাবিক কোনো অনুরাগের বার্তা আমরা পাই না। অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তিতে কবির কাছে প্রেমাস্পদকে বলে গুরুত্বহীনও মনে হয়নি তাঁর কাছে। বিশেষ করে, এই কবিতায় কোনো এক বিকেলে স্মৃতি আর ভালোবাসা দ্বারা পিষ্ট হওয়ার যন্ত্রণাকে কবি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যা এখন ভালোবাসা তাঁর কাছে স্মৃতিহরণের বেশে দণ্ডায়মান। তাই তিনি বলেন, 'সে এখন আমার স্মৃতিহরণের উদ্যোগে নিরন্তর।' ("ভালোবাসা নাম", *প্রেমের কবিতা*)

তাত্ত্বিকভাবে রোমান্টিকতার অনেক তাৎপর্যপূর্ণ দীর্ঘ ব্যাখ্যা থাকলেও ইদানীং রোমান্টিক কবি হিসেবে নরনারীর প্রেম-নির্ভর কবিতা রচনাকারীকেই বোঝায়। তাঁরাই বেশি রোমান্টিক লেখক-কবি, যাঁরা নর-নারীর প্রেম নিয়ে সাতকাহন গাইতে পারেন। আমাদের স্বাপ্নিক কবি আহসান হাবীব অবশ্য তত্ত্ব মেনেই রোমান্টিক কবি। তা ছাড়া প্রেম-নির্ভরতা তো রয়েছেই। তেমনই একটি কবিতা "কে কেমন আছে" পাঠান্তে মনে হয়, কৈশোরের স্মৃতিচারণা, বদলে যাওয়া পোশাকে বসে থাকা সজ্জনেরা—কে কখন কোথায় কাকে তার আবেগী ভালোবাসা নিবেদন করে কষ্ট পেয়েছিল, সেই কুঁকড়ে যাওয়া কষ্ট আজো তেমনই জ্বলজ্বল করছে নায়কের বুকের ভেতর। যেমন :

কেউ জানে না পৃথিবীর কোথায় কখন
কি রকম দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কে কখন বালকস্বভাবে
জ্বলন্ত পেরেক একটি তুলে নিয়ে অর্বাচীন আবেগে
নিজের বুকে বিঁধিয়ে গোলাপ গোলাপ বলে নৃত্য করে
দু-একবার তারপর থেমে যায়, তারপর জ্বলতে থাকে!

("ভালোবাসা নাম", *প্রেমের কবিতা*)

উপর্যুক্ত উক্তি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবির বেদনার সঙ্গে, নায়কের কষ্ট আর পাঠকের বেদনা একাকার হয়ে যায়। প্রেমের এই স্বরূপ তখন আপনা-আপনিই সবার বলে গণ্য হয়। আর "পরিস্থিতি" কবিতার পরিস্থিতি তো সবার জন্যই ভয়াবহ। কবির মানসপুত্র এখানে নারীদেহের সৌন্দর্য যেন উপভোগ করছে না, রীতিমতো 'ভোগ' করছে। টেবিলে কমলার রস, নাশপাতি, আপেল, দুধের গ্লাস সবই আছে কিন্তু নায়কের ক্ষুধা নেই। সে এসবের পরিবর্তে অখাদ্য জেনেও খাচ্ছে 'নরম চুলের গোছা', 'নত কাঁধ', 'বাঁকানো চিবুক', 'খড়ের বেগুনী চটি', 'লাল টিপ', 'আধখোলা পিঠ', 'রূপালী ঘামের কুচি', 'গভীর চোখের তারা' প্রভৃতি। কবির ভাষায় :

খড়ের বেগুনী চটি
লাল টিপ
আধখোলা পিঠ
রূপালী ঘামের কুচি
এই সব খেয়ে বসে আছি

("পরিস্থিতি", *প্রেমের কবিতা*)

কবিতায় কবি শেষ পর্যন্তনায়ক নাও হতে পারেন, তবে কবির বোধের সঙ্গে পাঠক যে একাত্ম হয়ে যান, সেখানেই আহসান হাবীবের *প্রেমের কবিতার* সার্থকতা। আর কোনোকিছুর অভাব বোধ যে কবিকে

Dhaka University Institutional Repository

তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, নিজের ভেতরের একধরনের সংকট যে বিরাজমান, সেই বিষয়টির জানান দেন কবি "যে পায় সে পায়" কবিতার মধ্য দিয়ে। কবিপ্রেয়সী যখন মুখ ফিরিয়ে নেন, তখনই তিনি তাঁর অভাব বোধ করেন আর প্রেমাস্পদের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ক্ষণিকের বিচ্ছেদ-বেদনায় কবিকে তাই কাতর হতে দেখা যায় :

তুমি ভালো না বাসলেই বুঝতে পারি ভালোবাসা আছে।
তুমি ভালো না বাসলেই ভালোবাসা জীবনের নাম।
ভালোবাসা ভালোবাসা বলে
দাঁড়ালে দু'হাত পেতে
ফিরিয়ে দিলেই
বুঝতে পারি ভালোবাসা আছে।

("যে পায় সে পায়", *প্রেমের কবিতা*)

আমাদের সমাজে বিয়ে-বহির্ভূত প্রেম পাপ বলে গণ্য হয় বলে চিরদিনই নিষিদ্ধ। কিন্তু কোনো কোনো পরিস্থিতিতে কবির নায়কের পরম ভালোবাসাকে পাপ বলে প্রত্যাখ্যান করার সাহস দেখিয়ে কাঙ্ক্ষিত নারীটি 'রাজার' বাড়িতে সব বিলিয়ে দেয়। সেই কারণে "হায় মালিনী" কবিতায় কবি অভিযুক্ত করেন 'মালিনী' নামক এক চরিত্রকে। অর্থাৎ যারা মালিনীকে ভালোবাসে, তারা তাকে পায় না, পায় অন্য লোক। তাই কবির কাছে 'নারীদের এও একধরনের সর্বনাশা চরিত্র, নিজেদের সমূহ বিপদ ও দুর্দশার কথা জেনেও পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে দুরন্ত আগুনে। মালিনীর জন্য যে পবিত্র ভালোবাসা নায়কের বুকে, তাকে সে অগ্রাহ্য করে, অবহেলা করে এবং পাপ বলে তাকে ভয় দেখায়।...ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়েও আহসান হাবীবের কবিতার প্রেমিক-নায়কেরা নায়িকার কাছে নয়, ভালোবাসার কাছে অসম্ভব নতজানু।'[৪৩] তাই কবি ক্ষোভ ব্যক্ত করেন এভাবে :

নিজের হাতে নিজের বুকে পাপ জড়িয়ে নিলি
পাপ ছিলো না ভুবনে, তুই পাপ ছড়িয়ে দিলি
হায় মালিনী হায়;
অথচ তোর পাপের ডালা স্বর্গসুখে নেচে
রাজার বাড়ি যায়!

("হায় মালিনী", *প্রেমের কবিতা*)

এই কাব্যের সবচেয়ে পাঠকপ্রিয় কবিতা "দোতলার ল্যান্ডিং মুখোমুখি ফ্ল্যাট/একজন সিঁড়িতে, একজন দরজায়"। নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা মানুষের স্বাভাবিক আবেগ-অনুভূতিকে অনেক সময় গলা টিপে হত্যা করে। এ-কাব্যের এই একটি কবিতা, যেখানে প্রেম এবং সমাজচিত্র পাশাপাশি উঠে এসেছে। কবিতাটি নির্মাণে কবি ইঙ্গিতময়তার চেয়ে দৃশ্যমান বাস্তবতার দিকেই বেশি মনোযোগী ছিলেন বলে মনে হয়। কবিতাটির নায়ক-নায়িকা দুজনই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। পাশাপাশি দুটি ফ্ল্যাটে বাস করেছেন দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে। এর মধ্যে তাদের কথাবার্তা হয়নি। কিন্তু আবেগ রুদ্ধ থাকেনি সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবি যে দুটি হৃদয়ে অব্যক্ত কথামালাই প্রকাশ করেছেন, তা নয়, এর মধ্য দিয়ে সেই সময়ের সামাজিক সংস্কারের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে উঠে এসেছে। ছেলেদের সঙ্গে বসে ব্যবহারিক (practical) ক্লাস করতে হবে, সেই কারণে যে এই কবিতার নায়িকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া বন্ধ করে দিতে হয়েছে, সেই চিত্রটি পাওয়া যায় এই কবিতাটির সুবাদে। সামাজিক ও শিক্ষার অগ্রগতির কারণে বর্তমান সময়ে এমনটি ঘটার আশঙ্কা কম থাকলেও মাত্র কয়েক

Dhaka University Institutional Repository

দশক আগেও আমাদের নারীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ কতটা অন্তরায় ছিল, তার একটি চিত্রও আমরা পেয়ে যাই কবিতাটিতে। তবে এই ফর্মটি আহসান হাবীবের কবিতায় আগে-পরে আর লক্ষ করা যায়নি। তাদের কথোপকথনেই শোনা যাক :

: ফিজিক্স-এ অনার্স।

: কি আশ্চর্য। আপনি কেন ছাড়লেন হঠাৎ?

: মা চান না। মানে ছেলেদের সঙ্গে বসে...

: সে যাক গে, পা সেরেছে?

: কি করে জানলেন?

: এই আর কি? সেরে গেছে?

: ও কিছু না, প্যাসেজটা পিছলে ছিলো মানে...

: সত্যি নয়। উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে...

... ...

: যাই। আপনি সন্ধে বেলা ওভাবে কখনো পড়বেন না, চোখ যাবে, যাই।

: হলুদ শার্টের মাঝখানে বোতাম নেই, লাগিয়ে নেবেন, যাই।

: যান, আপনার মা আসছেন। মা ডাকছেন, যাই।

("দোতলার ল্যান্ডিং মুখোমুখি ফ্ল্যাট/একজন সিঁড়িতে, একজন দরজায়", *প্রেমের কবিতা*)

এই কাব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবিতা "ডিসেম্বর ১৯৭৭"। অন্যান্য কবিতা বিভিন্ন নারীকে নিয়ে রচিত হলেও এই কবিতায় প্রেম নিবেদিত হয়েছে কবি-গৃহিণীর উদ্দেশে। কবিতাটিতে বিরহকাতর এক নায়কের ছবি এঁকেছেন তিনি। কবির প্রেমাকুতি ভরা কথামালা কখনো *মেঘদূত* কাব্যের বিরহী যক্ষের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। যক্ষ যেমন এক স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে মেঘকে উদ্দেশ করে সংলাপ বলে গেছে, তেমনি কবিও তাঁর বিরহ-কাতরতা ব্যক্ত করতে একক সংলাপের বয়ান করে গেছেন। হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ক্ষণিকের বিচ্ছেদকে কবি মেনে নিতে পারছেন না। এ সময় অসুস্থ স্ত্রীর জন্য ব্যাকুল ভালোবাসা ফুটে উঠেছে কবিতায়, তাতে বিরহের আবেগ মিলে যেন প্রেমের এক পরিপূর্ণ প্রতিমা নির্মিত হয়েছে। যেমন :

বিছানায় ঘুমন্ত অথবা দেয়ালের দিকে মুখ
অল্প খোলা উদাস বিষণ্ন দুটি চোখ, তবু
তুমি যদি থাকতে এখানে...
তুমি এখন হাসপাতালে

এ রকম বিচ্ছিন্নতা
দূরে থেকেও নৈকট্য গড়ে সহায়ক নয়।
উদ্বেগ আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তা, আর
তার চারপাশে উদভ্রান্ত সন্তানদের মুখ।

আমি সন্তানদের মুখ দেখতে ভয় পাই
এ রকম পৃথক হয়ে আমরা আর কখনো থাকিনি।

("ডিসেম্বর ১৯৭৭", *প্রেমের কবিতা*)

এই কাব্যের একটি কবিতায় দুটি সময়ের তুলনাকে বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ত্রিশ-চল্লিশের দশকের বাঙালির নারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সত্তর-আশির দশকের নারীর। কবিতার নাম "সেই পাখি সেই প্লাবন"। এ কবিতায় পরিণত বয়স্ক এক কবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেলবটম পরা, বব্‌ছাঁট চুলের এক মেয়ে তাঁর হারিয়ে যাওয়া সময়ের মানসকন্যার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মেলানো

Dhaka University Institutional Repository
যাচ্ছে না কিছুতেই। এই মেয়েটিও কবির প্রেয়সী হয়ে উঠেছে তবে, পোশাক-আশাক আর চালচলনে সৃষ্টি হয়েছে বিস্তর ফারাক। মানসিকভাবে কবি হয়ে যান চল্লিশ বছরের আগেকার কেউ :

তখন ছিলো লম্বা ঝুলের ফ্রক, কখনো শাড়ি
এখন বেলবটম আর নীল রঙের খাটো কামিজ
তখন ছিলো চকচকে কালো চুলের বেণী
এখন ঘাড়ের নীচে ধূসর বব্।
তখন কবজিতে সোনার রুলি ছিলো।
এখন এক হাত খালি অন্য হাতে চওড়া কালো ফিতেয় বাঁধা ঘড়ি

("সেই পাখি সেই প্লাবন", *প্রেমের কবিতা*)

কাব্যের দ্বিতীয় অংশের উপশিরোনাম 'তারো আগে/প্রথম প্রহর'। এখানকার প্রথম কবিতার নাম "প্রেমের কবিতা"। এই প্রথম কাব্যনামের একটি কবিতা পাই আমরা। এর আগে আহসান হাবীবের কাব্য-নাম অনুসারে কোনো কবিতা অথবা কবিতার নাম-অনুসারে কোনো কাব্যের নাম আমরা পাইনি। তাই এটি একটি বিশেষ সংযোজনও বটে। আহসান হাবীবের আগে ত্রিশের কবিরা এবং পরে পঞ্চাশের কবিরা তাঁদের প্রায় সব কাব্যেই একটি করে 'নাম কবিতা' রেখেছেন। তবে *প্রেমের কবিতার* "প্রেমের কবিতা"য় আমরা কবিপ্রেয়সীকে একটি বিশেষ নামে সম্বোধন করতে দেখি। নামটি ভালোবেসে কবিরই দেওয়া, তাতে সন্দেহ নেই। 'সুকন্যা' নামের নারী আর কবির কাঙ্ক্ষিত নারী যে একই অস্তিত্বের, তাও স্পষ্ট করেন কবি নিজেই। তাই তো তিনি বলতে পারেন :

সুকন্যা তোমার নাম।
শুনেছো এ নাম কোনোদিন ?
কোথায় হৃদয় থেকে হৃদয়ের দিগন্তে বিলীন এই নাম।
এ কথা কি শুনেছো বিস্মিত হয়ে কভু—
এ নাম তোমার নয় তুমি এ নামের মেয়ে তবু!
... ...
হোক মিথ্যা এই নাম তবু তো মনের মতো নাম
এ নামে তোমায় ডেকে পাওয়া যায় অশেষ বিশ্রাম।
এ নামে তোমার চিত্ত সাড়া দেয় বাসনার মতো।
এ নামে তোমাকে দেখি বসন্তের কবিতার মতো।

("প্রেমের কবিতা", *প্রেমের কবিতা*)

পরের কবিতা "নীল খাম"। এটি এ-কাব্যের সবচেয়ে দীর্ঘ কবিতা। তবে এর বিষয়টি যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি কবিতার পঙ্‌ক্তিবিন্যাস থেকে শুরু করে এর কাঠামোতেও রয়েছে নতুনত্ব। এর একটি স্তবক উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

সত্যিই—
তোমার কণ্ঠে এলো কথার ঝড়
বললে, 'এ মালা কথার ঝড়।'
আমি বললাম,—
আমি যে তোমায় ভালোবাসতাম সে কথা কি তুমি জানতে,
শপথ করেও বলেছি তবু তো মানতে না।

Dhaka University Institutional Repository

তবু কবে কোন আরণ্য-রাত তোমার মনের প্রান্তে
ঝড় এনে দিলো ক্ষণিক হাওয়ার সহসা।

("নীল খাম", *প্রেমের কবিতা*)

এভাবে আরো কিছু কবিতায় কবির প্রেমভাবনা বিকশিত হয়েছে। "ঘুম" কবিতার মধ্যে আমরা পাই 'রিজিয়া' নামের এক নারীর খোঁজ। পরস্পর বিপরীত স্রোতে ভেসে যাওয়া দুটি হৃদয়ে পথচলার টুকরো কাহিনী ধরা পড়েছে এই কবিতায়। "জোনাকী" নামের কবিতায় দেখা যায় 'রোজানা' নামের এক নারীকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্বপ্ন দেখেছিলেন কবি। প্রেয়সীকে জীবন-চলার কণ্টকাকীর্ণ পথে পাশে কল্পনা করে নিয়ে কবি সাহসী হতে চেয়েছেন তিনি "আয়ুষ্মতী" কবিতায়। এই গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা "আরো এক মেয়ে"র মধ্য দিয়ে কবি দেখাতে চেয়েছেন, শয্যাসঙ্গিনী ছাড়াও কবি এক রমণীকে কামনা করেন, সে-ই মূলত কবির 'মানসসুন্দরী'। এই নারী মহিমময়ী, তাই কবির বাস্তবের নারী হেরে যান তাঁর কাছে। কল্পিত এই নারীই তাঁর কাছে বেশি কাম্য। তবে তার সঙ্গে বাস্তবের নারীর কোনো বিরোধ নেই। কবি তাকে নির্মাণ করেছেন একে অপরের পরিপূরক হিসেবেই। এভাবেই শেষ হয় কবির নর-নারীর প্রেম-বিষয়ক ঘোষিত একমাত্র কাব্য *প্রেমের কবিতা*, যা বাংলা কবিতায় আহসান হাবীবকে আলাদাভাবে মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

আট

আহসান হাবীবের সর্বশেষ কাব্য *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* (১৯৮৫)। এর কবিতাগুলো তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত আগে লেখা। সংগতকারণে এতে তাঁর গোটা শিল্পীজীবনের অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত প্রতিফলনই ঘটার কথা, ঘটেছেও তা-ই। কবি হিসেবে তাঁর যে অভিজ্ঞতা ও শিল্প সচেতনতার স্মারক আমরা *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যে লক্ষ করেছি, তারই পরিসমাপ্তি উপলব্ধি করা যায় এই কাব্যে। যে চেতনায় তাড়িত হয়ে কবির ভেতরে সমাজবোধ, মানবতাবাদ ও শেকড়-সন্ধানের স্বরূপ উন্মোচিত হয়, সেসব নিয়েই আহসান হাবীবের কাব্যচূড়া *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* আর এরই চূড়ান্ত ব্যাখ্যান হলো *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*।[৪৪] মূলত এখানে ব্যক্ত হয়েছে কবির অনেক না বলা কথার সারাৎসার। তবে নতুন একটি বিষয়কেও আমরা খুঁজে পাই, সেটা হলো মৃত্যুচেতনা। কবির জীবন যে মৃত্যুর দিকে ক্রমাগত ধাবিত হচ্ছিল এবং মৃত্যু যে আসলে তাঁর প্রত্যাশিত ছিল না. তারও একটি স্বরূপ আমরা এই কাব্যে দেখতে পাই। এমনকি এই কাব্যের সর্বশেষ কবিতায় তিনি ইঙ্গিত করেন, এই ধরাধাম ছেড়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নেই তাঁর। এ ছাড়া কবিতা নিয়ে, কবিজীবন নিয়ে, শিল্প হিসেবে বাংলাদেশের কবিতার সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে কাব্যের শুরুতেই একটা কৈফিয়তও তিনি পাঠককে দিয়েছেন। কৈফিয়ত না বলে, কবিতা নিয়ে তাঁর সারা জীবনের ভাবনা এবং কবি হিসেবে তাঁর সার্বিক অবস্থানের ব্যাখ্যানও বলা যায় এটিকে। কাব্যের শুরুতেই 'পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ' অংশটি কবির অলিখিত আত্মজীবনীর সারাৎসার বললেও অত্যুক্তি হবে না। কবিতার প্রতি তাঁর আকর্ষণের সূত্রপাত, কবি হয়ে ওঠার পেছনে অনুপ্রেরণা-ঠাট্টা, কবি হওয়ার অদম্য বাসনায় পড়াশোনার পাট চুকিয়ে কলকাতায় গমন, সেখানকার জীবনসংগ্রাম, উদরপূর্তির তাগিদ আর কবিতার নেশা—দুইয়ের দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন পত্রিকায় চাকরি, কবি হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁর সম্পর্কে পাঠক-শুভানুধ্যায়ীদের অনুভূতি, 'মৃদুভাষী' কবি হিসেবে আখ্যা দেওয়ায় তাঁর ব্যাখ্যা, নতুন প্রজন্মের কবিদের প্রতি কবির পরামর্শ—এসবই তিনি তুলে ধরেছেন। জীবনের বিশাল উপাদানকে খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে (সাড়ে ছয় পৃষ্ঠা) মাত্র ১৮১টি বাক্যে প্রকাশিত এই 'পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ' শুধু কবি হিসেবে নয়, তাঁর কবিতার গতিবিধি নিরূপণেও বেশ সহায়ক। সর্বোপরি বাংলাদেশের কবিতার

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রযাত্রায় এটি একটি ঐতিহাসিক এবং অনুকরণীয় দলিল হিসেবেও গণ্য হতে পারে। আর কাব্যের নামের তাৎপর্য সন্নিবিদ্ধ হয়েছে এর প্রথম কবিতাতেই, সে কথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়। অবয়ব যত সুশ্রীই হোক, অমসৃণ কিংবা চূর্ণ-বিচূর্ণ আরশির সামনে দাঁড়ালে প্রতিবিম্ব মসৃণ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ঠিক তেমন না হলেও জীবনজুড়ে প্রশ্নবোধক হয়ে ঝুলে থাকা অমীমাংসিত আত্মজিজ্ঞাসা কবির আত্মমুকুরকে দ্বিধান্বিত করে তুলেছে। যেন তা হাজারো প্রশ্নের মুখে কবির আত্মমুকুর শুধু নয়, তাঁর অস্তিত্বই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এ ছাড়া জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এসব প্রশ্ন যে জীবনান্তকে সংকেতিত করেছে, কবিতার প্রকাশভঙ্গিতে তার স্বাক্ষর বর্তমান। অর্থাৎ মৃত্যুচেতনার প্রকাশ এতে স্পষ্ট। বিশেষ করে "বসবাস নিবাস" কবিতাটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রশ্ন-জর্জরিত কবির অসহায় আত্মরূপ :

পাখির উড়াল দেখতে দেখতে প্রশ্ন করেছি
কোথায় নিবাস?
পথের বাতাস উড়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করেছি
কি নিঃসঙ্গ নদী বয়ে যায় একা একা নদী
কোথায় যে যায়
... ...
শেলফে সাজানো মননের সঙ্গে স্বজন
সুখে বসবাস
হঠাৎ কখনো দর্পণে মুখ হঠাৎ প্রশ্ন
কোথায় নিবাস?

("বসবাস নিবাস", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

এই কাব্যের বিষয়কে কবি বিশেষায়িত ও বৈচিত্র্যময় করেছেন রূপক ব্যবহারের প্রাচুর্যে। কোনো কোনো সময় বিষয় আর বিষয়ী কৌশলগত কারণেই একে অপরের পরিপূরক হয়ে যায়। কিংবা বিষয়কে ছাপিয়ে বিষয়ীই বড় হয়ে দেখা দেয়। তাই এ কথা মেনে নিতে হয় যে 'শিল্পসৃষ্টি বিশেষ একটি ব্যক্তিগত প্রণালি হলেও এর উপকরণ ও অভিযোজন মূলতই সামাজিক। তাই যে-কোনো কবির রচনাকর্মের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে একটি বৃহৎ প্রেক্ষাপট অবলম্বন করতে হয়। এই প্রেক্ষাপটে বিধৃত থাকে কবিতার বিষয়ভাব, টেকনিকের উন্মেষ ও বিকাশের সূত্রসমূহ।'[৪৫] আমরা এই কাব্যের কবিতাবলিতে 'টেকনিকের' বেশি প্রয়োগ লক্ষ করছি। "রূপকথা" কিংবা "বালক এবং পাখি" কবিতায় তেমন ব্যাপারই লক্ষণীয়। যেমন অনন্ত রেলপথের নিশানা দেখিয়ে কবি অফুরন্ত সময়ের কথা বলেছেন "রূপকথা" কবিতায়। এই অনন্ত সময়কে জীবনের অশেষ পথ আর ছোট রেলগাড়িকে ব্যক্তিগত জীবন এবং সেই রেলগাড়িতে যে স্বপ্নের বোঝার কথা বলা হয়েছে, তা দিয়ে মূলত জীবনজুড়ে লালন করা অবাস্তবায়িত স্বপ্নের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন কবি। জীবনজুড়ে স্বপ্নযাত্রায় কবি সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। অথচ—

সমস্ত অরণ্যে যেন বাঁশি বেজেছিলো
অনুপম আলোকসজ্জার মতো
ছিলো যেন নক্ষত্রনিচয়। দিনে দিনে
তাকে আলো দেখালো দিনের সূর্য রাতের চন্দ্রিমা।
একটি ছোট নীল রেলগাড়ি
সামান্য স্বপ্নের বোঝা ছিলো তার
যেন কোনো অলৌকিক যাদুর কবলে
বোঝা তার দিনে দিনে স্ফীত হয়ে যায়।

("রূপকথা", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে, 'অনন্ত রেলপথের' মতো কবি 'চোখের তারায়' 'অনন্ত সবুজ' দেখিয়েছেন এক বালককে দিয়ে। এই বালকটি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বধ্যভূমি, ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতু দেখার পরও অনন্ত সবুজের তেজকে বুকে ধারণ করে নূহের জাহাজের[৩৬] মতো মুক্তির প্রতীককে খুঁজছে। এই স্বাপ্নিক বালক যে কবিরই মানসপুত্র তা স্পষ্ট হয়, যখন এখানেও "আমি কোনো আগন্তুক নই" কবিতার মতো এই বালকের চোখের তারায় সবুজের মুগ্ধতা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। মানবসৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ নয়, প্রাকৃতিক প্রলয়েও কবির স্বপ্ন লয়প্রাপ্ত হওয়ার নয়। তেমন কথা কবি আমাদের শুনিয়েছেন "বালক এবং পাখি" কবিতায় :

হরিৎ পল্লব ছিঁড়ে একলা বালকের চোখ
দেখো মধ্যভুবনে অটল, তার
চোখের তারায় গাঁথা অনন্ত সবুজ।
... ...
দেখো মধ্যভুবনে অটল
একলা বালকের চোখ
চোখের তারায়
অনন্ত সবুজ গাঁথা
তাকে তুমি হননের গান
যতই শোনাবে
সে কেবল সামনের অতল জলরেখায় দু'চোখ রেখে
এই ক্ষিপ্ত জলরাশি পার হবে
ভাসমান লতার আশায়
("বালক এবং পাখি", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

আবার কবি যে নস্টালজিক, তিনি যে ফিরে যেতে চান আগের সুখ-সমৃদ্ধিময় সামাজিক পরিবেশে—তা বিভিন্ন কবিতায় আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি। কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে কবি আর একলা নন। কবি তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজনকে নিয়ে যাত্রা শুরু করতে চেয়েছেন "আমরা কয়েকজন" কবিতায়। এমনকি যেহেতু কবিতাটি কবির প্রায় জীবন সায়াহ্নে রচিত তাই এও বলতে ভোলেন না যে, তাঁরা সামনের দিকে 'হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে' গেছেন। যদি ধরা হয়, এই স্বপ্ন জীবনের শুরু থেকেই তাঁদের মধ্যে উপ্ত হয়ে ছিল, তাহলে এই অধরা স্বপ্নের জন্য চার দশকের পথপরিক্রমায় হেঁটে স্বাভাবিকভাবে ক্লান্ত হওয়ারই কথা। কবির লালিত সেই স্বপ্ন যে অর্থবহ ছিল, তা তিনি প্রমাণ করেন 'পাহারাদার' নামের দুটি চরিত্রচিত্রণ করে। এই দুজন পাহারাদারকে কবি এই কবিতায় দিক-নির্দেশকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন। এর মধ্যে একজন বলে যে, সামনে নয়, যেতে হবে পেছনে। কবিতার বক্তব্যেও তা বোধগম্য হয়ে উঠেছে :

আমরা হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম
এবং ক্লান্ত পায়ে আরো কিছুক্ষণ হেঁটে
আমরা আরেক পাহারাদারের দেখা পেলাম
তার পায়ে কালো বুট
পরনে লাল শেলোয়ার
আলোমাখায় সেই পাহারাদার জানতে চাইলে,
সামনে না পেছনে?

আমরা বললাম, সামনে
তা হলে পেছন দিকে চলে যান—
পাহারাদার বললে।
("আমরা কয়েকজন", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

Dhaka University Institutional Repository

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই কাব্যে *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যের অনেক বিষয় আরো বিস্তৃত আকারে এসেছে। যেমন খালেক নিকিরির মতো একটি চরিত্র খুঁজে পাই আমরা "কোলাজ" কবিতায়। এখানকার চরিত্রটির নাম 'সুন্দরালী'। এই সুন্দরালীও কবির 'স্বজন একজন'। সে এখানে খালেক নিকিরিদেরই প্রতিনিধি। একটি সংকটময় সামাজিক অবস্থা উঠে এসেছে "প্রিয়তমাসু" কবিতায়। ইঙ্গিতধর্মী এই কবিতায় কবিসৃষ্ট নায়িকার কাছে অন্ন ছাড়া সবকিছু তুচ্ছ। প্রেম-ভালোবাসা, স্বপ্ন-সাধ, উপহারসামগ্রী—এমনকি ঘরনি হওয়ার 'আশ্বাসই' যথেষ্ট তার জন্য। কবি যতই তার মন-ভোলানোর চেষ্টা করুন না কেন, সেসবের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। কারণ এই মেয়েটি উদরপূর্তির জন্য জীবিকা হিসেবে শরীরকেও ব্যবহার করছে। *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮) কাব্যের "আকাশলীনা" কবিতাটি যেমন জীবনানন্দ দাশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রচনা করেছিলেন, আহসান হাবীব তেমনই কোনো সামাজিক অবস্থাকে নির্দেশ করেছেন এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে। একধরনের হতাশাই প্রকাশ পেয়েছে এই নারীচরিত্রটির মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে তাকে উপলক্ষ করে যখন বলেছেন :

তোমার দু'হাতে ফুল তুলে দেবো এই ছিলো সাধ
হাতে নিয়ে হাত আংটি পরাবো এই ছিলো সাধ
তুমি শুধু বলো, ফুল নয়, চাই ভাত দাও ভাত।
আংটিও নয়, ভাতে ভরে দাও আমার দু'হাত।
... ...
তোমাকে আমার রাণী করে নেবো এই সাধ ছিলো
তোমাকে আমার ঘরণী বানাবো এই সাধ ছিলো
মনে সাধ ছিলো সঙ্গিনী হবে সখের মেলায়
তুমি মেতে গেলে কালো অঞ্চলে
ভাত কুড়োবার মরণখেলায়!

("প্রিয়তমাসু", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

অভিজ্ঞতার ঝুলি যখন ভরপুর হয়ে যায়, তখন সেখানে ইতি-নেতি দুই ধরনের অভিজ্ঞতাই থাকে। কবি শেষ বয়সে পৌঁছে দেখেছেন, 'অশুদ্ধ' মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে। প্রতীকী অর্থে একটি নদীর কথা বলেছেন কবি। নাম নিরঞ্জনা। এই নদীর প্রতীকে কবি বলেছেন, কোনো বিশেষ নদীর জলে স্নান সেরে যদি শুদ্ধ হওয়া যায়, তবে তেমন নদী তো এখনো আছে। কিন্তু শুদ্ধ জলের বড় অভাব। তাই প্রয়োজনমতো অন্য কোনো নিরঞ্জনা নদীর খোঁজে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এভাবে :

অশুদ্ধ মানুষ খুব বেড়ে গেছে
সারিবদ্ধ স্নানার্থী মানুষ
মরা নদী মরা স্রোত ছাড়িয়ে এখন—
বলে দাও
যেতে হবে অন্য কোনো নিরঞ্জনা নদীর সন্ধানে।

("এইখানে নিরঞ্জনা", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

কবির জীবনের শেষ বেলায়—আশির দশকের মাঝামাঝি সময় বাংলাদেশ ছিল স্বৈরশাসক দ্বারা শাসিত। মানুষের অনেক মৌলিক অধিকারই ছিল খর্বিত। এ ছাড়াও সারাটা জীবন ধরে কবি সাধারণ মানুষের জন্য যে চেতনাকে লালন করেছিলেন, রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে শুরু করে সামাজিক কাঠামোতেও তার তেমন

Dhaka University Institutional Repository
কোনো প্রতিফলন তিনি দেখতে পারেননি। শেষ বেলাতেও যে তেমন ইতিবাচক কিছু দেখবেন, তেমন নিশ্চয়তাও নেই। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে কবি মানবকল্যাণী যেসব উপাদান সমাজ থেকে উধাও হয়ে গেছে কিংবা রাষ্টযন্ত্র অথবা সভ্যতার কারিগরেরা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কবি তাদের কাছে সেসব ফেরত চেয়েছেন। সমাজে একসময় শান্তি ছিল, এখন শান্তি নেই; সমাজে একসময় হানাহানি ছিল না, এখন হিংসা-বিদ্বেষ বেড়ে গেছে; সাম্য, সৌহার্দ্য, অহিংসা সমাজ থেকে বিলীনপ্রায়। তবুও বলতে হয়, আত্মসচেতন এই কবি আর যা-ই হোক পলায়নবাদী নন। চতুর্দিকের হাজারো ভাঙন সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রতি, মানুষের ভালোবাসার শক্তির প্রতিই আস্থা রাখতে চেয়েছেন। তাই যা বিনাশ করে না, সৃষ্টি করে; মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ায় না, একত্রিত করে; তেমন কিছুই কামনা করেছেন তিনি সভ্যদের কাছে। আর সেই অমোঘ অস্ত্রটির নাম ভালোবাসা, যা কখনো ধ্বংস হয় না। তাই কবি বলেছেন :

আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী
যে বিদ্বেষ অহংকার
এবং জাত্যাভিমানকে (sic) করে বার বার পরাজিত
যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে করে নিশ্চিহ্ন
যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না
করে সমাবিষ্ট
সেই অমোঘ অস্ত্র—ভালোবাসা
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।

("সেই অস্ত্র", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

একজন সচেতন মানুষ যখন বুঝতে পারেন তার সার্বিক প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যাবে, থেকে যাবে সামাজিক বৈষম্য, শোষণ প্রভৃতি, স্বভাবতই তখন তিনি রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েন, ফিরে তাকান নিজের দিকে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলি এবং সেসবের প্রভাব আমাদের পারিবারিক জীবনকে যেমন, তেমনি ব্যক্তি জীবনকেও নানা দিক দিয়ে বিপর্যস্ত করে তোলে। আহসান হাবীবের ক্ষেত্রেও সেটি হয়েছে। পরিপার্শ্বের ঘটনাবলির প্রভাবে তার সত্তা এক গভীর সংকট ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। ওই সংকটের বিষবৃক্ষ থেকে মাঝেমধ্যে জন্ম নিয়েছে বিচ্ছিন্নতা বোধ, আত্মকেন্দ্রিকতা। নিজের অস্তিত্বের সংকট অনুভব করে যেন তিনি বিমূঢ়ও হয়েছেন—

কোথাও পড়ে না চোখে বধ্যভূমি, অথচ প্রত্যহ
নিহতের সংখ্যা বাড়ে। কোথাও একটিও
লাশ কিংবা কবর পড়ে না চোখে, অথচ প্রত্যহ
শবাধার ব্যস্ত হয়ে হেঁকে যায় এবাড়ি ওবাড়ি।
কেউ সাড়া দিলে—
অগ্রিম কেরায়া চায়, এবং মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করে
হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। হায় এ কেমন বধ্যভূমি
এ কেমন গ্রহে বসবাস!

("চিত্রমালা", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

সামাজিক জীবনে বাস করে একাকী কোনো সফলতা পাওয়া বা শোষণের বলয় থেকে একাকী মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। তাই তিনি মানুষের একাত্মতার প্রতি সব সময় নিজের বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। বিশেষ করে মানুষের ভালোবাসার প্রতি কবির আস্থা অত্যন্ত গভীর। তবে এ কবির উপলব্ধি অধিগত যে, মৃত্যুর

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের কিংবা সত্তার বিলুপ্তি ঘটে। অন্য অনেক কিছু নিয়ে কবিতা লেখার পর তাই এ-কাব্যের সর্বশেষ কবিতায় কবি সেই নিশ্চিত যাত্রাপথের ইঙ্গিতই দিয়ে গেছেন কিন্তু মৃত্যুচিন্তা কিংবা মৃত্যুচেতনা যা-ই বলি না কেন, এটি ব্যক্তিভেদে ইতি কিংবা নেতির সৃষ্টি করে। আবার কারো কারো কাছে শুধু মৃত্যুই নয়, জন্ম-মৃত্যু দুই-ই অর্থহীন। তবে আহসান হাবীব তাঁর এই কাব্যের সর্বশেষ কবিতায় মৃত্যু-ভাবনাকে একটি শৈল্পিক অবয়ব দিয়েছেন। তিনি মৃত্যুর ভয়ে বিপর্যস্ত নন, আবার একে অর্থহীন বলে উড়িয়েও দেননি। মনে হয় যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত। এমনকি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যে জীবনের পূর্ণতা—'প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ' থাকলেও, তারও ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তিনি। স্মৃতিমধুর একটি কবিতায় কবির মৃত্যু-ভাবনা এভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

শৈশবে এই পাথরখণ্ডে বসে
আমি সূর্যাস্ত দেখতাম
রাখাল এই পথে ঘরে ফিরতো
আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসতো
এই বিকেল আমার সঙ্গে যাবে না।
... ...
হাটে হাটে মানুষের মেলা
ঘরে ঘরে আপ্যায়ন—
এই দৃশ্যাবলী আমার সঙ্গী হবে না।

তবে কেন যাবো—
কেন যাবো স্বদেশ ছেড়ে বিদেশ বিভূঁইয়ে
অন্ধকারে?
প্রস্তুতি বড় কষ্টের
আমার কোনো প্রস্তুতি নেই।

("যাবো না", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

চিন্তা ও মননে কিছুটা দ্বিধার প্রকাশ ঘটলেও *বিদীর্ণ দর্পণে মুখকে* আহসান হাবীবের চূড়ান্ত সাফল্যের (*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*) 'ব্যাখ্যান' বলতে আমাদের কোনো সংশয় হয় না। শুরু থেকেই ক্রমেই সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রয়াস আমরা লক্ষ করি, তা শেষ কাব্য পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বিষয়ের নতুনত্বের চেয়ে বিষয়কে সময়ের উপযোগী করে কবিতা নির্মাণের তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন তাঁকে চল্লিশের দশকের কবি হিসেবে শুধু নয়, গোটা বাংলা কবিতার মহাসড়কে একটি প্রবাদপ্রতিম স্থানে উত্তীর্ণ করেছে। তাঁর প্রযুক্ত শব্দাবলি এত কোমল, গভীর ও উন্নত যে পাঠককে আবিষ্ট করে ফেলে। আর বলা যায় যে নতুন একটি বিষয় তাঁর শেষ কাব্যের শেষ কবিতায় অত্যন্ত সরব হয়ে প্রকাশিত, তা হলো মৃত্যুচেতনা। আহসান হাবীবের জীবনাবসানের ইঙ্গিতের পাশাপাশি চেতনার এই প্রকাশ সামাজিক-বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও ছিল প্রাসঙ্গিক। কেননা, 'আমরা দেখেছি, কীভাবে দৈহিক ও মানসিক বিকলতা গোইয়া ও জাঁ ককতোকে নিয়ে গেছে শিল্পে নবপথ সংরচনার পরিস্রুত পরিশুদ্ধতায়। মৃত্যুপূর্ববর্তী অসুস্থতা তেমনি তাদের অমোঘ ছাপ রেখেছে আহসান হাবীবের এই কবিতাগুলোয়। বিরুদ্ধ বিশ্বের অসুস্থ তাণ্ডবতা হয়ে উঠেছে তাঁরই রুগ্ণ আত্মার প্রতিফলন; যেনবা তাঁর আত্মার অন্তর্ক্ষতই বিশ্বের গোপন ব্যাধি। ফলে একই কবিতা ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে বিভিন্ন মাত্রায়, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিপ্রতীপ ব্যাখ্যানেরও, সংযোজনায়।'[৪৬] উপর্যুক্ত আলোচিত কবিতাবলি ছাড়াও এ কাব্যের অন্যান্য কবিতাও একইভাবে আহসান হাবীবের চেতনাবাহী বিষয় নিয়েই নির্মিত হয়েছে, যা তাঁর স্বকীয় শিল্পচেতনা এবং সময়কে ধারণ করার ক্ষেত্রে মহাকালের যাত্রায় সুনির্দিষ্টভাবে তাঁকে মৌলিক কবি হিসেবেই প্রতিনিধিত্ব করে যাবে। তাঁর প্রতিটি কাব্যে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে বিষয়গুলো প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যে ঋদ্ধ। তাঁর নির্বাচিত বিষয়সমূহ খুব চেনাপরিচিত বলে শেকড়ের কথা বলে। আর তাই প্রকরণের বৈচিত্র্যময় বিন্যাসে তা হয়ে ওঠে শাশ্বত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১ হোসেনউদ্দীন হোসেন, *ঐতিহ্য আধুনিকতা ও আহসান হাবীব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭

২ হোসেনউদ্দীন হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৩ আহসান হাবীব, *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড) *রাত্রিশেষ* কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

৪ আহসান হাবীব, *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত।

৫ আহমদ রফিক, *শিল্প সংস্কৃতি জীবন*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৭

৬ আহমদ রফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

৭ 'প্রান্তিক' অংশের শুরুতেই পঙ্‌ক্তিগুলো রয়েছে।

৮ 'প্রতিভাস'-এর শুরুতেই পঙ্‌ক্তিগুলোকে পুরো কাব্যাংশের সারমর্ম হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

৯ আহমদ রফিক, *শিল্প সংস্কৃতি জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১০ হোসেনউদ্দীন হোসেন, *ঐতিহ্য আধুনিকতা ও আহসান হাবীব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

১১ তুষার দাশ, *নিঃশব্দ বজ্র : আহসান হাবীবের কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৩

১২ হোসেনউদ্দীন হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৭

১৩ তুষার দাশ, পৃ. ১৯

১৪ হোসেনউদ্দীন হোসেন, পূর্বোক্ত, ২৩

১৫ পূর্বোক্ত, ২১

১৬ তুষার দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯-২০

১৭ হোসেনউদ্দীন হোসেন, পূর্বোক্ত, ১৫

১৮ তুষার দাশ, পৃ. ২৪

১৯ পূর্বোক্ত, ২৪

২০ গ্রিক দেশের এক রাজার নাম মিডাস। তাঁর সঙ্গে আনন্দ ও সুরদেবতা ডায়োনিসাসের সখ্যতা ছিল। মিডাস একবার ডায়োনিসাসের এক সহচর সাইলেনাসকে চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। সাইলেনাস মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কৃষকের সঙ্গে ঝগড়া করায় কৃষকরা তাকে বেঁধে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছিল। প্রিয় অনুচর সাইলেনাসকে উদ্ধার করার প্রতিদান হিসেবে ডায়োনিসাস মিডাসকে বর দিতে চাইলেন। মিডাস অদ্ভুত এক বর চেয়ে বসলেন ডায়োনিসাসের কাছে। তিনি বললেন, 'আমি যা স্পর্শ করবো তা যেন সঙ্গে সঙ্গে সোনা হয়ে যায়।' ডায়োনিসাস নির্বোধ মিডাসকে সেই বরই দিলেন। মনের আনন্দে মিডাস সবকিছু সোনা বানিয়ে চললেও স্বর্ণ-অভিশাপ টের পেলেন খাবার খেতে গিয়ে। কারণ যাতে তিনি হাত দেন তাই সোনা হয়ে যায়। ক্ষুধার্ত, অবসন্ন এবং ভীত মিডাস ছুটে গেলেন ডায়োনিসাসের কাছে। তাঁকে মিনতি জানিয়ে বর ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বললেন। ডায়োনিসাস ফিরিয়ে নিলেন তাঁর বর। তারপর পবিত্র নদীতে স্নান করে মিডাস ফিরে গেলেন তাঁর রাজপ্রসাদে। (ফরহাদ খান, *প্রতীচ্য পুরাণ*, প্রতীক, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ, ১১৮)

২১ বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, "আহসান হাবীবের *সারা দুপুর*: সময়ের শিল্পকথা", *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৩, জুন ২০১১, পৃ. ৩৫

২২ কবি হওয়ার সাধে কলকাতায় গিয়ে প্রথম প্রথম কবিকেও অর্ধাহার-অনাহারে থেকে অপরিচত বাড়ির বারান্দায়, বাগানে, ফুটপাতে ঘুমাতে হয়েছিল। তাই আবু হোসেনদের জীবন-বাস্তবতা কবিরও জীবনঘেঁষা। খুব কাছ থেকে দেখা সে বাস্তবতাই বোধ করি এ-কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

২৩ আহসান হাবীব, *আশায় বসতি*, 'মুখবন্ধ', আদিল ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং, ঢাকা, ১৯৬৪, দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

২৪ সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ. ২১৫

২৫ তুষার দাশ, *নিঃশব্দ বজ্র : আহসান হাবীবের কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

২৬ তুষার দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

২৭ আবুল হাসনাত (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, অবসর, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৭

২৮ আহসান হাবীব, *আশায় বসতি*, 'মুখবন্ধ', ঢাকা, ১৯৬৪

২৯ আলমগীর টুলু, "মেঘ বলে চৈত্রে যাবো: আলোর প্রত্যাশ", 'উলুখাগড়া' (সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন), ফেব্রুয়ারি ২০১২, ঢাকা, পৃ. ২০৪

৩০ ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় (২১ জুলাই ২০১১ তারিখ) কবিপুত্র মঈনুল আহসান সাবেরও একই ধরনের কথা বলেছেন। ঠিক কবিতায় যেভাবে ব্যক্ত করেছেন কবি। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাহান্তর-পরবর্তী দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে কবি খুব হতাশ ছিলেন, এটা ঠিক। তবে পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড ঘটার পর কিন্তু কিছু মানুষ উল্লসিত হয়েছিলেন। সে সময় আহসান হাবীবের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, এটা মেনে নেওয়া যায় না। তিনি এই ঘটনাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। এবং এও বলেছেন, এটা কোনো সমাধানও নয়। বরং এতে সংকট আরো আড়বে।

৩১ সুরার দেবতা ডায়োনিসাসের বন্ধু সাইলেনাসকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন রাজা মিডাস। বিনিময়ে ডায়োনিসাস বর দিতে চাইলে মিডাস এক অদ্ভুত বর চান। বরটি ছিল এ রকম, কোনো কিছু স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন তা সোনা হয়ে যায়। ডায়োনিসাস সেই বরই দিয়েছিলেন মিডাসকে। লোভী মিডাসের সে-ই বরই একসময় কাল হয়ে দাঁড়ায় তার নিজের জন্য। কেননা, ক্ষুধার্ত হয়ে কোনো খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করলে তা-ও সোনার টুকরো হয়ে যেত। (সূত্র: *প্রতীচ্য পুরাণ*, ফরহাদ খান ও *গ্রীক মিথ*, জামসেদ ফয়জী)

৩২ তুষার দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

৩৩ আহমদ রফিক, "আহসান হাবীব: কবি ও কবিতা", *আহসান হাবীব রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. চৌদ্দ।

৩৪ তুষার দাশ, *সেইসব মুখশ্রীর আলো ও আমার জীবনানন্দ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪৪

৩৫ আহমদ রফিক, "আহসান হাবীব: কবি ও কবিতা", পূর্বোক্ত, পৃ. চৌদ্দ

৩৬ তুষার দাশ, *নিঃশব্দ বজ্র : আহসান হাবীবের কবিতা*, পৃ. ৮৯

৩৭ শহীদ ইকবাল, *কালান্তরের উক্তি ও উপলব্ধি*, চিহ্ন, রাজশাহী, ২০০৩, পৃ. ৮০

৩৮ তুষার দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

৩৯ ফরহাদ খান, *প্রতীচ্য পুরাণ*, প্রতীক, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪

৪০ 'আহসান হাবীবের শিল্পীচৈতন্যের স্বরূপ' শীর্ষক পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে

৪১ আহসান হাবীব, *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণের উৎসর্গ প্রসঙ্গ, *প্রেমের কবিতা*।

৪২ পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গ প্রসঙ্গ।

৪৩ তুষার দাশ, *সেইসব মুখশ্রীর আলো ও আমার জীবনানন্দ*, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৯

৪৪ সাজ্জাদ শরিফ, "বিদীর্ণ দর্পণে মুখ", 'অধুনা' (সম্পা. শামসুর রাহমান)

৪৪ বেগম আকতার কামাল, *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, ইত্যাদি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১২৯

৪৫ ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ নবীর নাম হজরত নূহ (আ.)। তাঁর সময়ে বেশির ভাগ মানুষ নানা সামাজিকভাবে নানা অনাচার আর অপকর্মে লিপ্ত ছিল। নানাচারের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্লাবনে আক্রান্ত হয় মানুষ। নূহ বিষয়টি আগে থেকেই জানতেন। আর প্লাবনের পূর্বাভাষটা ছিল এমন যে, পৃথিবীর সমস্ত উঁচু জায়গা–পাহাড়-পর্বতও প্লাবিত হবে। সেই কারণে তিনি ওই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শুধু ভালো মানুষদের রক্ষা করার জন্য একটি জাহাজ

Dhaka University Institutional Repository

বানিয়েছিলেন। সেখানেও স্থানের সঙ্কুলান ছিল সীমিত। শুধু যাঁরা সজ্জন, তাঁদেরই ঠাঁই হয়েছিল সেই জাহাজে। বাকি সবারই জীবনবসান ঘটেছিল। (সূত্র : আল-কোরআন, সুরা : হুদ, আয়াত-সংখ্যা : ৩৬-৪৪)

৪৬ হোসেনউদ্দীন হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ.

৪৭ সাজ্জাদ শরিফ, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আহসান হাবীবের কবিতা: কাব্যপ্রকরণ

কবি বা সৃষ্টিশীল লেখকমাত্রই সময় ও সমাজের সবচেয়ে সচেতন সন্তান। তাঁদের সৃষ্টির পথ কখনো সময়ের সঙ্গে সমান্তরাল পথে এগিয়ে যায়, কখনো তাঁরা অতীত-ঐতিহ্যকে ভর করে বর্তমানকে সমৃদ্ধ করেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, কখনো সামাজিক জীবনের দায়বদ্ধতায় সৃষ্টি করেন, কখনো বা সমাজ ও জীবনের নেতিবাচক দিককে ব্যবহার করেন আশাহত হয়ে। আবার কখনো কখনো কবি-সাহিত্যিকেরা রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর থেকে বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে চান। পরিবেশ-প্রতিবেশ এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই দেখা যায়, সহযাত্রী কবিরাও ভিন্ন ভিন্ন সত্তায় আবির্ভূত হন। কেননা, প্রকৃতিগতভাবেই প্রত্যেক মানুষ তার চিন্তা ও মননে পৃথক সত্তা নিয়ে বেড়ে ওঠেন। তাই ব্যক্তিভেদে সৃষ্টিশীল প্রতিভা পৃথক ও স্বাধীন চেতনা দ্বারা বিকাশ লাভ করে। প্রতিটি সমাজের বাস্তবতায় একেকজন কবি তাঁদের নিজ নিজ ভাবনার জগৎ নির্মাণ করেন এবং তা তাঁদের ব্যক্তিত্বশীল সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় প্রকাশ করেন। এর প্রধান কারণ চিন্তার গভীরতা আর প্রকরণ-কৌশল কিংবা প্রকাশের টেকনিক। এই কৌশল বা টেকনিকই একজন কবি থেকে অন্য কবিকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দেয়। তবে বিষয় ও প্রকরণ একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি করে চললেও একটি আরেকটির ওপর নির্ভরশীল। বিষয় যত গভীরই হোক, প্রকাশের চমৎকারিত্ব ছাড়া যেমন সেটি পাঠকপ্রিয় এমনকি শিল্পসার্থক হয় না, তেমনি নান্দনিক জ্ঞান যত স্বচ্ছই থাকুক না কেন, বিষয় যদি আকর্ষণীয় না হয়, মানুষকে না ভাবিয়ে তোলে, তা হলেও তা মহাকালের যাত্রায় স্থায়ীত্ব পায় না। তাই বলা যায়, বিষয় ও কৌশল বা টেকনিক হাতধরাধরি করে চলে।

আত্ম-উন্মোচনের সরণি : *রাত্রিশেষ* ও *ছায়াহরিণ*

মূলত কবিতা সৃষ্টি হয় কবিস্বভাবের তাড়নায় কিন্তু তা শিল্পিত হয়ে ওঠে নান্দনিক প্রকরণের স্পর্শে। তাই বলে সব যুগের সব কবিই যে সমাজসচেতন, সবাই যে তাঁর সৃষ্টিতে মানুষকে প্রাধান্য দেন বা দেবেন এমনটি নয়। আবার সবাই যে শুরু থেকেই প্রকরণ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠবেন, তেমনও না। অর্থাৎ বিষয় নির্বাচন, বিষয়-বিন্যাস ও প্রকাশকৌশল যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত হতে সক্ষম, ততক্ষণ পর্যন্ত কবিতা শিল্পিত হয়ে ওঠে না, ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায় না। কেননা, অনেক কবি যুগযন্ত্রণার দায়ভার ধারণ করেও স্বকীয় প্রকাশকৌশলের দীনতায় টিকে থাকতে পারেন না। আবার অনেকে অত্যন্ত সাধারণ ও সর্বজনবিদিত বিষয়কে সমকালের প্রাসঙ্গিকতায় তুলে এনে স্বকীয় কৌশলে প্রকাশ করে টিকে থাকেন দীর্ঘ-দীর্ঘ কাল। কালের অভিযাত্রায় কখনো কখনো এমন প্রতিভারও আগমন ঘটে, যাকে সমকালের অন্য কোনো প্রতিভাই উতরাতে পারে না। ক্রমাগত নতুন সৃষ্টিতে পরাক্রমশালী তেমন প্রতিভাকে অনেক সময় স্বীকার করে সে পথ থেকে সরে দাঁড়ান অনেকেই। প্রতিভার দীনতা কিংবা প্রাখর্য আর প্রকরণকৌশলই এসব তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য গড়ার মৌল কারণ। এটি যেমন কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে, তেমনি যে কোনো সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রমাণিত সত্য। তবে সার্থক বা শিল্পিত কবিতায় অবশ্যই প্রকরণের স্বাতন্ত্র্য অতি সাধারণ এবং অপরিহার্য একটি শর্ত। সচেতন কবিগণ তাই বিষয়কে কবিতায় রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে প্রকরণ ব্যবহারে নিবিষ্ট হন, মনন ও নান্দনিকতার যোগসূত্র স্থাপনায় ব্রতী হন। অবশ্য এর সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করে কবিপ্রতিভার সামর্থ্যের ওপর। এ ছাড়া কবিতার স্বরূপ নির্ণয়ে বিষয় ও প্রকরণের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাসও কবিপ্রতিভার বিশেষত্বকে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ঘাটনের সুযোগ করে দেয়। কারণ, সাহিত্যের বিচার যেহেতু বিষয় ও আঙ্গিকের বিবেচনা, সেহেতু উভয়ের অদ্বৈত-বন্ধনটি যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার মধ্যে নির্মিত ও বিবর্ধিত হয়েছে কিংবা সাহিত্যের বিষয় ও রূপকর্মের উত্থান, বিকাশ ও অবক্ষয় ঘটেছে যেসব সূত্রাবলি দ্বারা, তার বিশ্লেষণ উক্ত বিবেচনার পরিপূরক, তবে সমান্তরাল নয়। শিল্পসৃষ্টি বিশেষ একটি ব্যক্তিগত প্রণালি হলেও এর উপকরণ অভিযোজন মূলতই সামাজিক। তাই যে-কোনো কবির রচনাকর্মের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে একটি বৃহৎ প্রেক্ষাপট অবলম্বন করতে হয়। এই প্রেক্ষাপটে বিধৃত থাকে কবিতার বিষয়ভাব, টেকনিকের উন্মেষ ও বিকাশের সূত্রসমূহ।'[১] বাংলা কবিতার চল্লিশের দশকের প্রধানতম কবি, বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার প্রথম কবিপুরুষ আহসান হাবীবের কবিতার প্রেক্ষাপট অবশ্যম্ভাবীরূপে বৃহত্তর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্যানভাসের অন্তর্গত। সেই বিশালত্ব যেমন বিষয়ের ক্ষেত্রে, তেমনি প্রাকরণিক পরিসরেও। এটা সত্যি যে বিষয় ও প্রকরণের সঠিক বিন্যাস কবিতায় 'অদ্বৈত-বন্ধনেরই' সৃষ্টি করে। আবার এটাও ঠিক যে প্রকরণপ্রধান কবিতায় তা যেমন একক সত্তার মতো অবিচ্ছেদ্য হয়ে উদ্ভাসিত হয়, বিষয়প্রধান কবিতায় তেমনটি লক্ষ করা যায় না। বরং বিষয়প্রধান কবিতায় বিষয়কে শিল্পিত করার প্রয়াসেই প্রকরণের সচেতন প্রয়োগ হয়। আহসান হাবীবের কবিতায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিষয় ও বক্তব্যকে শিল্পমণ্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে প্রকরণের সফল প্রয়োগ সম্পন্ন হয়। আর সে কারণেই কবিতা হয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্মারক। প্রকরণ যদি কবি ও কবিতার গতিপথকে চিহ্নিত করার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়, তবে তার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আহসান হাবীবের কবিতা স্বকীয়তায় ভাস্বর। কেননা, 'কবিতা কবির ব্যক্তিচিত্তে বিধৃত জীবনচেতনার সামাজিক স্বীকৃতি-নির্ভর ভাষাশিল্পসঙ্গত সচেতন অভিব্যক্তি। তাঁর জীবনচেতনা অবশ্যই সমকালের দ্বন্দ্বমুখর ও বিবর্তন চঞ্চল জীবনপ্রবাহ থেকে অর্জিত, এবং কবিতায় তা সমকালের পাঠক-সমাজের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।'[২] তাই শিল্প ও সমাজ-সচেতন কবিরা সৃজনশীলতা দিয়ে সমসাময়িককালের সামাজিক মানুষের জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটান এবং তা তাঁদের শিল্পচর্চার অন্যতম শর্ত বলে মনে করেন। সে কারণেই আহসান হাবীবের কবিতায় প্রযুক্ত প্রাকরণিক উপকরণগুলো তাঁর অস্তিত্ব-নিষিক্ত সমাজ-প্রতিবেশের ভেতর থেকেই উদ্গত। তাই তাঁর শব্দপ্রয়োগে মিশে থাকে চেনা মানুষ ও মাটির গন্ধ, তাঁর চিত্রকল্পে উঠে আসে শাশ্বত দেশমাতার প্রকৃতি, তাঁর মিথ ব্যবহারে আমরা খুঁজে পাই শেকড়সন্ধানী প্রবণতা আর কবিতায় উঠে আসা চরিত্রগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় হাজার বছরের সমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতির নিদর্শন। তবে ছন্দের ব্যবহার তিনি ছেড়ে দেন প্রকাশকৌশলের সাবলীলতার ওপর। তাই বিগত শতাব্দীর তিরিশ ও চল্লিশের দশকের কোনো নির্দিষ্ট ধারায় নয়, বরং তাঁর কবিতা বিষয় ও প্রকরণে বাংলাদেশেরই কবিতার পথ নির্মাণ করে গেছে। তবে কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে এভাবেও বলেন যে 'প্রকাশভঙ্গি অথবা নির্মাণ-কৌশলের প্রশ্নে আহসান হাবীবকে তিরিশের কবিকুল থেকে পৃথক ক'রে দেখা যায় না। যেহেতু পশ্চাদ্‌গামিতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, সেহেতু রবীন্দ্রসৃষ্টির বিস্তৃত বলয়ে প্রত্যাবর্তন সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে। তাই সমাজ ও সময়বিবিক্ত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে আহসান হাবীব অনুসরণ করেছেন তিরিশের কাব্যনির্মাণ কৌশলকে। কবিতার ভাব ও ভাষা প্রয়োগ, শব্দ-নির্বাচন এবং কখনো কখনো চরণবিন্যাসেও আহসান হাবীব তিরিশের কাব্যঐতিহ্য-অনুসারী। কিন্তু বিষয়বস্তু তথা জীবনদর্শন নির্মাণে আহসান হাবীব তিরিশের কবিদের পাশাপাশি চল্লিশের নব-উদ্ভূত জীবনমুখী কাব্যধারাকে অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং তিরিশের কাব্যান্দোলনের পৃথক দু'টি ধারাকে সাঙ্গীকৃত করেই আহসান হাবীবের সৃষ্টিজগৎ সম্প্রাসারিত। বক্তব্য এবং প্রকাশরীতি এই পৃথক দু'টি প্রসঙ্গ দু'টি ধারার অনুবর্তী। তথাপি আহসান হাবীবের সৃষ্টিসম্ভারে ছিলো স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য, যা তাঁরই নিজস্বতায় উজ্জ্বল।'[৩] এই ঔজ্জ্বল্য রক্ষায় তিনি কাব্যচর্চার প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

থেকে শেষাবধি ছিলেন সমান সক্রিয়। কারণ কবিতা তিনি সৃষ্টি করেছেন এক অবৈষয়িক তাড়না থেকে। সংগতকারণে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এক উত্তুঙ্গ বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি 'আনুষ্ঠানিক' কাব্যযাত্রা শুরু করলেও তাঁর কবিতা সরাসরি কোনো রাজনৈতিক বা ব্যক্তিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। যদিও সেসবের সরাসরি প্রভাবে টলায়মান ছিল গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি। তবে কবিতা-নির্মাণে তিনি মুহূর্তের জন্য বিচলিত হননি। বরং বৃহত্তর ক্যানভাস হিসেবে তিনি মানবকণ্ঠকেই অবলম্বন করেছেন। চল্লিশের কবি-সন্তান হয়েও রাজনীতির উন্মত্ততায় স্লোগানমুখরতা থেকে স্বসৃষ্ট শিল্পকর্মকে এভাবে আত্ম-উন্মোচনের স্মারক হিসেবে প্রকাশ করাও যে কবির দীর্ঘ দিনের সাধনাকেই প্রস্ফুটিত করে তোলে, তাতেও সন্দেহ নেই। হাজারো সংকট পরিস্থিতিতে নিজেকে নৈর্ব্যক্তিক রাখার নির্লোভ এই প্রয়াস আমরা তাঁর কবিজীবনের শেষপাদেও লক্ষ করি। এমনকি প্রকরণের ব্যবহারেও এ বিষয়টি তাঁর চেতনায় অবিচ্ছেদ্য বলেই মনে হয়। তবে কবিতা রচনায় তাঁর হাতে রাজনীতির মশাল না থাকলেও তাঁর কবিতা রাজনৈতিক সচেতনতায় পরিপূর্ণ। আর '...মশালের আলোক-সম্ভারের মতোই তাঁর কবিতা অত্যুজ্জ্বল এবং শ্লোগানে শ্লোগানে ধ্বনিত হয় জীবনের যে-স্বপ্ন ও চাহিদার কথা, তারও দ্যুতিময় প্রকাশ আহসান হাবীবের কবিতায় দুর্লক্ষ্য নয়।'[৪] দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের মাত্র দুই বছরের মাথায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যের (১৯৪৭) অন্তর্ভুক্ত কবিতার শরীরে তাই পরিদৃষ্ট হয় কবির অভিজ্ঞতার চিত্র। তাঁর মনে ঠাঁই পাওয়া বৈশ্বিক পরিস্থিতির এক নির্মোহ চিত্র নির্মাণপ্রয়াস আমরা লক্ষ করি তাঁর ভাষা-প্রয়োগেই। যেমন:

দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ পাখির মতো
বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান।
আকাশে আজিও কামনার শিখা উজ্জ্বল কমনীয়
জ্বলে দিগন্তে দীপ্ত দিবার দীপগুলি রমণীয়।
আমার নয়নে নেমেছে রাত্রি পঙ্গুতার
অন্ধকারের গুহাতে ব্যর্থ বাহুবিথার।

("দিনগুলি মোর", *রাত্রিশেষ*)

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিমালায় শব্দের নিখুঁত ব্যবহার এবং সাঙ্গীতিক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সময় সম্পর্কে কবিমনের একটা নেতিবাচক দিকের পরিচয় আমরা পাই। এই কবিতায় ব্যবহৃত 'বিকলপক্ষ পাখি', 'দীপ্ত দিবার দীপ', 'শর-খাওয়া এক হরিণ-শিশুর আর্তনাদ' প্রভৃতি শব্দমালার মধ্য দিয়ে বিশেষ চিত্রকল্পেরও নির্মাণ সম্পন্ন করেন কবি। সুনির্বাচিত শব্দের ব্যবহার এবং সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তার প্রয়োগ শুরুতেই কবির জন্য তেমন সার্থক ইমেজ সৃষ্টির জন্য সহায়ক হয়ে উঠেছিল। এখানকার উপমা প্রয়োগও শব্দ-পরম্পরায় ঘনিষ্ঠতাভাবে আবদ্ধ। যেমন: 'নেমেছে রাত্রি পঙ্গুতার', 'বীজাণু কুটিল মৃত্যুদূত', 'অন্ধকারের গুহাতে ব্যর্থ বাহুবিথার', 'যুগের চিতায় জ্বলে', 'নীল অরণ্যে এল অপঘাত', 'অন্ধ নয়নে', 'জরতী রাতের দুঃস্বপন', 'চির দহনের তিক্ত শপথ' প্রভৃতি উপমাশ্রিত শব্দের প্রয়োগের পর কবিতাটি শেষ করা হয়েছে 'শর-খাওয়া এক হরিণ-শিশুর আর্তনাদ'-এর মধ্য দিয়ে। এই আর্তনাদ যেন ওই সময়ে অধিকারবঞ্চিত প্রত্যেক মানুষেরই আর্তচিৎকারের প্রতিধ্বনি। এখানে বিষয় দ্বারা কবি প্রভাবিত হন না, বরং বিষয়ই প্রাকরণিক কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। এর কারণ কবিতার প্রয়োজনে তিনি বিষয়কে ব্যবহার করেন, বিষয়ের প্রয়োজনে তিনি প্রকরণকে খুঁজে নেন। কবি আহসান হাবীবের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় জীবন ঘষে ঘষে, সমাজের সেই সব মানুষকে অবলম্বন করে, যারা শুধু আক্রান্ত হতে জানে, অধিকারের ভাষা যাদের অজ্ঞাত। কবির সাধনার বিষয় যেন তারাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও

Dhaka University Institutional Repository

যাদের অধিকাংশই ক্ষুধা, জরা আর জীবনের ধূসরতাকে শেষ বলে জানে। কিন্তু কবি জানেন, 'মানব-চৈতন্যের কোনো ধারাই নিরবলম্ব নয়; একা একা তা চলতেও জানে না। প্রতিক্ষেত্রেই তা জাগতিক ঘটনার প্রতিঘাত-সাপেক্ষ। বস্তু এবং বস্তু সম্পর্কে আমাদের ধারণা—এই দুয়ের দ্বান্দ্বিক সংঘাতে আমাদের বোধের পলিমাটি জমে উঠছে। এই বোধকেই চৈতন্য বলি। এবং এক্ষেত্রে এ-কথাও বলার সুযোগ অবশ্যই নেওয়া যায় যে, কবিতা চৈতন্যেরই একপ্রকার সৌন্দর্যমণ্ডিত অভিলাষী সুরেলা বহিঃপ্রকাশ। বাস্তবতার অস্থি নিয়ে তার কারবার নয়; বাস্তবতার নির্যাস, প্রাণ নিয়ে তার অপরূপ অস্থির ব্যঞ্জনাময় চঞ্চলতা।'[৫] এই 'বাস্তবতার নির্যাস' বলেই 'ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে' তিনি নীড় বাঁধতে চেয়েছিলেন, যেখানে 'সবুজ পাতার স্বপ্নেরা' ভিড় করে। তবে শুধু বাস্তবতার নির্যাসই নয়, অভিজ্ঞতার নির্যাসও কবিতার শরীর গঠনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। অভিজ্ঞতার সেই নির্যাসই "এই মন—এ মৃত্তিকা" কবিতায় শব্দের কারুকার্যে ছন্দময় হয়ে উঠেছে :

ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তবু বাঁধলাম নীড়,
তবু বারবার সবুজ পাতার স্বপ্নেরা করে ভীড়।
তবু প্রত্যহ পীত অরণ্যে শেষ সূর্যের কণা,
মনের গহনে আনে রঙের প্রবঞ্চনা।
... ...
নিবিড় রঙের আবরণ-ঘন যে আভরণের তলে
এই পৃথিবীর কুৎসিত প্রাণ হীন কামনায় জ্বলে,
প্রেমহীন সেই বন্ধুর দেশে নীড় বাঁধলাম তবু,
এই মন আর এ-মৃত্তিকায় বিচ্ছেদ নাই কভু।

("এই মন—এ মৃত্তিকা", *রাত্রিশেষ*)

এখানে হতাশায় বিপর্যস্ত যে কবিপ্রাণকে পাওয়া যায়, মধ্য লয়ের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সেই বিপর্যস্ত কবি-আত্মা সুচিহ্নিত। প্রেমের ভাবনাবহুল এক স্বাপ্নিক 'ফরিদের ছোট ছেলে' 'আমজাদ'-এর কথা বলতে গিয়ে কবি "কাশ্মিরী মেয়েটি" কবিতায় প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার যেমন করেছেন, তেমনি "দীপান্তর" নামক কবিতায় হতাশায় মুষড়ে না পড়ে একপর্যায়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সমিল অক্ষরবৃত্তের মাধ্যমে। সব সময়ই যে বলার ঢঙ তিনি একই রকম রেখেছেন, তা কিন্তু নয়। বরং বিষয়ের তারতম্যে এই কাব্যে ছন্দেরও পার্থক্য ঘটিয়েছেন তিনি। যেমন "আজকের কবিতা"য় তিনি ব্যর্থতার কথা ভুলে স্বপ্ন আর প্রেরণার কথা বলতে গিয়ে স্বরবৃত্তের মতো দ্রুতলয়ের ছন্দের ব্যবহার করেছেন। আবার "কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি", "একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ", "বাইশে শ্রাবণ", "রেড্ রোডে রাত্রিশেষ" প্রভৃতি কবিতায় তিনি গদ্যছন্দের ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মাঝেমধ্যে মনে হয়, ছন্দ নিয়ে একধরনের নিরীক্ষা করতে গিয়ে এ-কাব্যে শুধু নয়, কাব্য জীবনের শেষ পর্যন্ত বিষয়কে সজীব ও শিল্পিত তুলতে তিনি প্রায় সব ছন্দই ব্যবহার করেছেন। তবে শেষ অবধি তিনি গদ্যছন্দ ব্যবহারেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন বলে মনে হয়। আর অলংকার-ভাবনায় তিনি অত্যন্ত সারল্যের পরিচয় দিয়েছেন। অন্তত *রাত্রিশেষ*-এর বেলায় দেখা যায় সমকালকে ভাবীকালের সঙ্গে, নেতিবাচকতাকে ইতিবাচকতার সঙ্গে ক্রমাগত তিনি তুলনা করেছেন। সময়টা ছিল অস্থিরতার, বিশ্বরাজনীতির জিঘাংসার কবলে পড়া সাধারণ মানুষের স্বপ্ন দেখার সুযোগ ছিল তখন কম। কিন্তু কবি ছিলেন স্বাপ্নিক পুরুষ। হতাশায় জর্জরিত হলেও তিনি মুষড়ে না পড়ে রাত্রিশেষের ভোরের আলো নিয়ে সামনে এগোতে চেয়েছেন। তাই কবিকে ঐতিহ্যের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে, ফেলে যাওয়া নিজস্ব ভূগোলের সঙ্গে তুলনা

Dhaka University Institutional Repository

দিতে হয়েছে। এতে সমাজের কাছে, মানুষের কাছে দায়বদ্ধতার বিষয়টি প্রকাশের পাশাপাশি তিনি খুব সহজ শব্দের মাধ্যমে উপমার ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে ব্রিটিশ-শাসনের প্রতি আস্থা হারিয়ে তাদের নেতিবাচকতা তুলে ধরতে গিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন আবার সংশয়েও ভুগেছেন কবি। এই সংশয়-চেতনাই তাঁকে উৎপ্রেক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। উপমা সৃজনেও তিনি প্রদর্শন করেছেন স্বকীয়তা ও মৌলিক কবিপ্রতিভার অত্যাশ্চর্য অনুভবময়তা। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

উপমা

১. দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ পাখির মতো
বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান

("দিনগুলি মোর", *রাত্রিশেষ*)

২. অশেষ আশার দিন পলাতক, আজো মিলায়নি ছায়া,
আজো দিগন্তে স্বপ্নের মতো তারি অপরূপ কায়া

("এই মন—এ মৃত্তিকা", *রাত্রিশেষ*)

৩. কাশ্মিরী মেয়েটির চোখ দুটি সাপের মতন
কাশ্মিরী মেয়েটির দাঁতগুলো ভীষণ ধারালো:

("কাশ্মিরী মেয়েটি", *রাত্রিশেষ*)

৪. বিনয়ী মেষের মত সন্ধ্যাবেলা একে একে
সার বেঁধে রাস্তায় দাঁড়াই।

("সৈনিক", *রাত্রিশেষ*)

৫. যে পলাশ ঝ'রে গেছে তার প্রতিটি পল্লব
শাণিত খড়্গের মত হানে যদি বাসনার শব

("ঝরা পলাশ", *রাত্রিশেষ*)

৬. রাতের পাহাড় থেকে
খ'সে যাওয়া পাথরের মত
অন্ধকার ধসে ধসে পড়ছে

("রেড্ রোডে রাত্রিশেষ", *রাত্রিশেষ*)

উৎপ্রেক্ষা

১. আকাশে সেদিন ছিল মেঘহীন, পৃথিবীর পথ ছেয়ে
প্রথম প্রেমের পরিচয় ছিলো—যেন সে কুমারী মেয়ে

("এই মন—এ মৃত্তিকা", *রাত্রিশেষ*)

২. এই সেই গ্রাম।
তবু যেন সেই গ্রাম নয়।
পঁচিশ বছর ধ'রে চেনা সেই গ্রাম
ঢেকে গেছে স্টরিয়াই নগরীর মত।

("একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ", *রাত্রিশেষ*)

৩. এ মানুষে চলে যেন মৃতের মিছিল
সাড়া নেই কোনো।

Dhaka University Institutional Repository

সবার সমুখে
অলক্ষ্য উদ্ধত মুঠি জেগে আছে যেন।

("একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ", *রাত্রিশেষ*)

বিষয় ও কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত বক্তব্যের সার্থক প্রয়োগে আমরা দেখতে পাই, কবি যেখানে *রাত্রিশেষ*-এর সমাপ্তি টেনেছিলেন, *ছায়াহরিণ* যেন সেখান থেকেই শুরু করেছেন। এর মধ্যে অনেক সংকট ও হতাশার প্রতি ইঙ্গিত করলেও জীবনকে, মানুষকে, সমাজকে তিনি ইতিবাচক দিকে ধাবিত করতে চেয়েছেন—এ কাব্যের শরীরে প্রতিফলিত এই চেতনা পরবর্তী সময়ে কবি আহসান হাবীবের মৌলিক কাব্যচেতনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে বিষয়ের দিক থেকে *ছায়াহরিণ*কে পূর্ববর্তী কাব্যের সম্প্রসারিত রূপ মনে হলেও প্রকরণের দিক থেকে এখানে বৈচিত্র্য বিদ্যমান। সেটি শব্দ ব্যবহারে যেমন, তেমনি ছন্দ ব্যবহারেও। তা ছাড়া প্রথম কাব্যের প্রায় পনেরো বছর পর প্রকাশিত এ-কাব্যে পরিস্থিতির কারণে দেশাত্মবোধ খুব আবেগের সঙ্গে নতুনত্ব নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ছায়া হরিণ-এর দুটি কবিতায় আমরা লক্ষ করি প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের 'অব্যর্থ' ব্যবহার। তাঁর কাব্যজীবনে এ কবিতা দুটি সফল নিরীক্ষার পরিচায়ক হিসেবে অমলিন হয়ে আছে। কেননা, তাঁর কাছ থেকে এর আগে-পরে কখনো এত বেশি আরবি-ফারসি শব্দনির্ভর কবিতা পাওয়া যায়নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-সম্পৃক্তির প্রমাণ আরো নিবিড়ভাবে উপস্থাপন করা। তবে একটি কবিতায় তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, আর অন্যটিতে তুলে এনেছেন 'হুজ্জত সর্দার' নামের এক ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থা-প্রসূত শোকোচ্ছ্বাস। এখানে শব্দ নির্বাচনে কবি আঠারো শতকের শেষার্ধের কবিয়াল-শায়রদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন। কবিতা দুটিতে ব্যবহৃত কিছু আরবি-ফারসি শব্দ নিচে তুলে ধরা হলো:

"হক নাম ভরসা" : আদাব, সালাম, হুজুর, ফজর, তামাম, মুরুব্বী, বরকত, সহি-সালামত, মালেক, আজব, খোয়াব, রোশনাই, সাফ, মারফত, মেহ্‌মানদারী, বেদেরেগ, গোস্বা, গর্দান, জিন্দিগী, কুশল প্রভৃতি।

"ছহি জঙ্গনামা" : পাক-পরওয়ার, খোদাওন্দ করিম, ফজল, এলাহী, লানত, নেজার, মওত, ছিনা, বে-এনসাফি, ফিকির, শান, ছবক, গর্দান, বেকসুর, ইজ্জত, আজদাহা, গজব প্রভৃতি।

কবি আহসান হাবীবের এ-নতুন প্রয়াস ছিল নিতান্তই নিরীক্ষামূলক। কারণ এ নিয়ে কবি আর বেশি দূর এগোননি। দুটি কবিতাতেই তিনি সমিল ছন্দের ব্যবহার করেছেন। তবে একটিতে মুক্তক ও সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্তের পাশাপাশি গদ্যের ঢংটাও স্পষ্ট। আর অন্যটিতে আট-ছয় মাত্রার সমিল অক্ষরবৃত্ত বা পয়ার ছন্দের বিশুদ্ধ ব্যবহার লক্ষণীয় :

১.

আহা এই সে পুরনো ভিটি জনম যেখানে
জীবনে সাতান্নটি বছর এখানে
কেটেছে, এবং আমি এখানে মানুষ।
হুজুরের রাজপুরী নেহাত ফানুস
মনে হয় এর কাছে। লিখিলাম সাফ
পত্রের যতকিছু বেয়াদবী মাফ

Dhaka University Institutional Repository

করিবেন, জ্ঞাত আছি। তাই
আরো কিছু বিস্তারিত লিখিয়া জানাই।

("'হক নাম ভরসা'", *ছায়া হরিণ*)

২.

একদিন দেখা গেল নুন নেই ঘরে
দেখা গেল পরদিন বৌয়ের ছতরে
ইজ্জত বাঁচার মত তেনাটুকু নাই
আচম্বিতে শরমেতে নজর নামাই।
ফুরায়াছে কেরোসিন, নিভে গেল আলো
ভাবি এ রাতের মত মন্দের ভালো।
তারপর ক্রমে ক্রমে অনেক দেখেছি
অনেক দুঃখের কথা স্মরণে রেখেছি।

("ছহি জঙ্গনামা", *ছায়া হরিণ*)

আহসান হাবীবের কবিচেতনা ও স্বজনস্পৃহা প্রথম থেকে শেষাবধি ঐতিহ্যানুসারী। স্বদেশ ও স্বকাল সম্পর্কে সচেতনতা এবং চল্লিশের দামাল রাজনৈতিক পরিবেশের কিছুটা ক্ষুব্ধ স্পর্শ নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। এই রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমে আরো বেশি জনবৈরী হয়েছে। ক্রমেই তা কবির স্বজনদের জন্য প্রতিকূলতার পরিপূরক হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই তত্ত্বগত বিশ্বাস, অন্তর্দৃষ্টি ও শৈল্পিক সংবেদ্যতা হয়ে উঠেছে চৈতন্যের প্রধান সঞ্চয়।[৬] এই অনুভব ও বিশ্বাস থেকে কবি যে যাত্রা শুরু করেন, তা তাঁর সর্বশেষ কাব্য পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তা যেমন শব্দ নির্বাচনে, বাক্যবন্ধে তেমনি প্রকাশভঙ্গিতে। এসবের সচেতন প্রয়োগই মা-মাতৃভূমি-ঐতিহ্যের প্রতি কবির চেতনাকে আরো বেশি নিবিষ্ট করে তুলেছে। পঙ্‌ক্তিবিন্যাস ও অলংকার প্রয়োগে সেই স্বাক্ষর লক্ষ করা যায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সংরক্ত সময়ের পটভূমিকায় প্রকৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে তিনি লীন হতে চেয়েছেন আশাবাদের প্রতি অবিচল আস্থায়। কতিপয় শব্দবিন্যাসই সেই স্বাক্ষর বহন করে :

মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই
দেশকে আমি ভালোবাসি সে কথা সে সোনার দেশের
আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে।
... ...
ইতিহাস ঐতিহ্যের আলো
জ্বালিয়ে রেখেছি ঘরে, যার প্রতি শিখায় তুমিই
অনন্ত জীবন দিয়ে রেখেছো অমর করে, আর
আমাকে দিয়েছো এক মহত্তম শিল্পীর মহিমা।

("তোমাতে অমর আমি", *ছায়া হরিণ*)

এই বাংলার সবুজ-সতেজ প্রকৃতি তথা অরণ্য-আকাশ, বৃক্ষ, সুর-সংগীত, পাখি, চাঁদ প্রভৃতিকে ভালোবেসে ধন্য হয়েছেন, সৃষ্টিকে স্বকীয় প্রতিভায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন এই দেশেরই অসংখ্য কবি। কিন্তু যখন কবিতার শব্দবন্ধ দেশের 'আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে' কোনো কবির নাম লেখা আছে বলে আত্মবিশ্বাস ছড়ায়, তখন তাঁর ভাবনার গভীরতা এবং উপলব্ধির অতলতাও প্রমাণিত সত্য হয়ে ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয় কবির আশাবাদের সঞ্জীবনী ধারা। আর এর মধ্য দিয়েই *রাত্রিশেষ*-এর দোলাচলতা মুছে ফেলে কবি জীবন ও জগৎকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা শুরু করেন। ওই কাব্যে কবির অন্তরে যে প্রশ্ন উদ্ঘাটিত হয়েছে, সেখান থেকেই তাঁর অঙ্গীকারেরও ঘটেছে উত্তরণ। এই

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরণে তাঁর আশাবাদের বড় একটি জায়গা ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং এর ওপর ভর করেই দেশপ্রেমের বয়ানে কবিতাকে করেছেন সমৃদ্ধ। এ-কাব্যে এমন ধারার কবিতার মধ্যে রয়েছে "তোমাতে অমর আমি", "সমুদ্র অনেক বড়", "জীবন", "ইতিহাস বিন্যাসের পথে", "পুনর্বাসন", "মুহূর্ত", "শুক্লপক্ষের গান", "ফুটবে ফুল" প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে সাতটি ইতিহাস-বোধাশ্রয়ী কবিতা। এ কাব্যের বাকি কবিতাগুলো প্রথাগত সাধারণ বোধ দ্বারাই সমৃদ্ধ। এর মধ্যে পূর্বোক্ত দুটি ছাড়া এ-কাব্যে ছন্দবৈচিত্র্য তেমন লক্ষণীয় নয়। এছাড়া বেশির ভাগ কবিতায় তিনি সফলভাবে গদ্যছন্দ ব্যবহার করেছেন। কতিপয় কবিতায় তিনি মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দের রীতি অনুসরণ করেছেন। এক কথায় বলা যায়, কবিচৈতন্যের বিবর্তনের ধারায় *ছায়া হরিণ* কাব্যে কবি আহসান হাবীব যত বেশি বিষয়, সমাজ ও বক্তব্য সচেতন, ছন্দ-অলংকারের কারুকার্যের বৈচিত্র্যময় সমাবেশ ঘটানোর ক্ষেত্রে ততটা যত্নশীল নন। তবে বক্তব্য-বিষয় স্পষ্ট ও ঋজু। পুরো গ্রন্থ অনুসন্ধান করে কয়েকটি মাত্র উপমার দেখা পাওয়া যায়। এর মধ্যে শুধু দুটি কবিতায় একাধিক উপমার সাক্ষাৎ মেলে। উপমাগুলোর দৃষ্টান্ত :

১. এই দেশ দেশের মানুষ
মানুষের সুখদুঃখ ভালোবাসা
তুমিই করেছো মূর্ত এবং তুমিই
আমার আত্মার এক অনবদ্য প্রতিমার মত।
("তোমাতে অমর আমি", *ছায়া হরিণ*)

২. সেই হাতে হাত রেখে
প্রথম কান্নার মত ঝরে পড়া কুয়াশার জাল
সেই স্বপ্ন-সম্ভারের অপরূপ শীতের সকাল।
("শীতের সকাল", *ছায়া হরিণ*)

৩. মৃত্যুর মতন তার সারা দেহ শীতল
("চরিতাখ্যান : নববর্ষ", *ছায়া হরিণ*)

৪. পাখির জীবন কভু সংসারে পাবো না
পাখির মতন সুখ-স্বাধীনতা মানুষের ভাগ্যে লেখা নেই
("ঈর্ষার আলোকে আমি", *ছায়া হরিণ*)

৫. পাখিদের মনে হয় আশ্রিত অথবা
কখনো বা নিয়ন্ত্রিত অতিথির মত।
("ঈর্ষার আলোকে আমি", *ছায়া হরিণ*)

৬. তুমিও অমন
সর্বদা সমস্ত মুখ ভার ক'রে মারখাওয়া
পশুর মতন
("দ্বৈত", *ছায়া হরিণ*)

৭. যে কালে হৃদয় ছিল
নদীর স্রোতের মত
ইচ্ছামতী। পাখির ডানার মত
ছিল তার অসীম নীলিমা;
("অন্যদিন", *ছায়া হরিণ*)

শুধু উপমাই নয়, অন্যান্য অলংকারের উপস্থিতিতিও এ-কাব্যে নগণ্য। তবে কয়েকটি কবিতায় শব্দের প্রতীকায়িত রূপ লক্ষণীয়। সেগুলোর মধ্যে "ক্রান্তিকাল" ও "শীতের সকাল" উল্লেখযোগ্য। প্রতীক বা রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করার সময় কবি সাধারণত পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে অন্ত্যমিলের ওপর ভরসা করেন। এর আগে আরবি-ফারিস শব্দবহুল দুটি কবিতায় আমরা সে প্রয়াস লক্ষ করেছি। তেমনি এ ক্ষেত্রেও তার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যতিক্রম ঘটেনি। ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ ও দেশমাতার প্রতি দায়বদ্ধতা তুলে ধরতে কবি কীভাবে শিল্পিত শব্দাবলি ব্যবহারে ব্রতী হয়েছেন, তা দেখা যেতে পারে নিচের উদাহরণ থেকে :

১. মধ্যরাতে রাজপথের দেখি এক নারীর শরীর—
যে নারী নায়িকা ছিলো কোনোকালে এই পৃথিবীর।
সর্বাঙ্গ পুড়েছে তার বণিকের তৃষ্ণার উত্তাপ,
হৃদয়ের রক্ত নিয়ে রেখে গেছে নখরের ছাপ;
দেখে মনে হয়
বহুভোগ্যা এই নারী,
এ হৃদয় সে হৃদয় নয়।
... ...
কোথাও লাবণ্য নেই জেগে আছে ভয় ও বিস্ময়,
অভীপ্সার আলো থেকে বিচ্ছুরিত সে নারী এ নয়।
সভ্যতা-নারীর হাটে দেখি শত আকুঞ্চিত ভাল
ভয়ে ভীত শত শত সভ্যতার চতুর দালাল।
("ক্রান্তিকাল", *ছায়া হরিণ*)

২. রাত্রিশেষ!
কুয়াশায় ক্লান্তমুখ শীতের সকাল।
পাতার ঝরোকা খুলে ডানা ঝাড়ে ক্লান্ত হরিয়াল।
... ...
আজ মনে হয়,
রৌদ্রপীত মাটিতেও সে আকাশ নিরুদ্দেশ নয়,
সেই হাতে হাত রেখে
প্রথম কান্নার মত ঝরে পড়া কুয়াশার জাল
সেই স্বপ্ন-সম্ভারের অপরূপ শীতের সকাল।
("শীতের সকাল", *ছায়া হরিণ*)

"ক্রান্তিকাল" কবিতার 'নারী' দেশমাতা—বঙ্গজননীরই প্রতিমূর্তি। 'নারীর' প্রতীকে দেশকে তুলে আনতে কবি ইতিহাসের কাছে গিয়েছেন। শাব্দিক ইঙ্গিত অবলম্বনে তিনি দূর-অতীত থেকে শুরু করে নিকট অতীত হয়ে তাঁর সময় পর্যন্ত ভিনদেশী বহু শাসক-কর্তৃক শোষণে জন্মভূমির বিপর্যস্ত অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। কবির দৃষ্টিতে বহুভোগ্যা নারীর মতোই বঙ্গমাতা যেন ক্ষতবিক্ষত। আর দ্বিতীয় কবিতাংশে কবি নিজেকেই যেন 'ক্লান্ত হরিয়াল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'রাত্রিশেষ'-এর সংবাদ দিয়ে শুরুতে চমক সৃষ্টির পর তিনি বলেছেন, 'কুয়াশায় ক্লান্তমুখ শীতের সকাল'। অর্থাৎ রাত্রি শেষ হওয়ার পর শীতের সকালে যে-কুয়াশা, যে অস্পষ্টতায় পারিপার্শ্বিক আবহ হয়ে উঠেছে গুমোট ও রুদ্ধশ্বাসময়, সেখানে হরিয়ালের ক্লান্তি বোধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেননা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ওই সময়পর্বটি অস্থির, যা সাধারণ মানুষকে বিচলিত করে তুলেছিল।

এ-কাব্যের আরেকটি বিশিষ্ট কবিতা "জল পড়ে পাতা নড়ে"। তেমন কোনো অলংকারের সমাবেশ না ঘটালেও কবি এখানে তাঁর শৈশব-কৈশোরের নানা স্মৃতিকে একটি সুনির্দিষ্ট বিন্যাসরীতিতে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে তিনি নিজেই প্রতি স্তবকে তাঁর গ্রামীণ জীবনের স্মৃতিচিত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন আর উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন। যেমন :

Dhaka University Institutional Repository

এখনো কি হাওয়া বয় বঙ্গোপসাগর থেকে
বিকেলে? সোনালি রোদ
এখনো কি মুখ দেখে জোয়ারের জলে?
... ...
এখনো কি শেষ বেলা
মুগের ক্ষেতের পাশে ভেঙে
ঘরে ফিরে যেতে যেতে
কালো চোখ তুলে কোন জেলে-বৌ
প্রশ্ন করে:
এলো না কি?

("জল পড়ে পাতা নড়ে", *ছায়া হরিণ*)

অক্ষবৃত্ত ছন্দের প্রবহমান ধারায় শুধু স্মৃতিচিহ্নের বিন্যাস-শৈলীতেই কবিতাটি বিশিষ্ট নয়, সংলাপধর্মিতা এবং নাটকীয় গুণেও এটি স্বতঃভাস্বর। কবিতাটি পাঠকালে সংলাপ প্রক্ষেপণের মতো আবহ সৃষ্টি করে প্রতিটি স্তবকেই কবির চমৎকার পরিবেশনা খুব সহজেই উপলব্ধ হয়।

অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে : *সারা দুপুর-আশায় বসতি-মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*

সমাজ-মানুষ আর ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি দায়বোধ থেকে পরপর দুটি কবিতাগ্রন্থ শেষে কবি *সারা দুপুর* যেন স্বেচ্ছায় শিল্পের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কবিতাকে আলাদা মাত্রায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন। ষাটের দশকের উত্তাল সময়ে প্রকাশিত এই কাব্যের শিল্পাঙ্গিক ও শিল্পশৈলী দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী একজন কবিপুরুষ। তিনি যে পুরোপুরি নাগরিক কবি হয়ে উঠেছেন, তা-ও এ সময়ের কাব্যসাধনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সময় এবং পরিস্থিতিকে লালন করা সত্ত্বেও মানসিকভাবে নির্বিকার থেকে শিল্পের প্রতি নিবিষ্ট হওয়া এক অর্থে তাঁর শিল্পদৃষ্টির পালাবদলের স্মারক। এ-সময়ের কবিতার শরীরে নতুনত্ব দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। তাই '*সারা দুপুর* (১৯৬৪) কবির অপরাহ্নিক জীবন-অতিক্রান্তের সাক্ষ্য বহন করলেও স্বগতোক্তির মতোই কবির শিল্পময় আরাধনার জগতে অনুপ্রবেশের প্রথম সোপান। *রাত্রিশেষ* কিংবা *ছায়া হরিণ*-এর কবির মধ্যে যে গণ-সম্পৃক্তি, মৃত্তিকামূল ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিরাবরণ সাবলীল প্রকাশ, *সারা দুপুর*-এ এসে সেই বোধ ও প্রতীতি অনেকটাই উপমা, রূপক-প্রতীকাচ্ছিদিত। মনে হয় গণ-উত্তরণের পথ ধরে এই পর্বের কবি চলে যাচ্ছেন আত্মগত ধ্যানের জগতে; কবিতার অতলান্তিক রহস্যময়তার জগতে।'[৭] যে কারণে তাঁর অনুধ্যানে স্থান পাওয়া চিরচেনা-চিরপরিচিত মানুষ, গ্রামের কিষান-কিষানি প্রতীকায়িত হয় পুতুলের রূপাবয়বে। নাগরিক পরিবেশের জড়ত্ব ক্রমান্বয়ে মানুষকে ভাবলেশহীন নিরাবেগ করে তোলে—পুতুলের প্রাণহীন অবয়বে আমরা তেমন ইঙ্গিতই পাই। সদা কর্মমুখর মানুষ যেন পুতুলের মতোই সময়ের তীব্র প্রয়োজনে শুধু নাচনের সামগ্রী হয়ে নিত্যব্যবহৃত হয়। তাই পুতুলের রূপবয়বেই কবি তাঁর মননকে ধ্যানস্থ রাখেন :

পুতুল।
অথচ তার দু'চোখে অবাক তারা জ্বলে!
তারার মালায় গাঁথা আছে তার তনুর তনিমা
এবং দক্ষিণ হাওয়া বহে তার সুরের লাবণি
আসকাল রাত্রির আকাশ।
... ...

Dhaka University Institutional Repository

পুতুল।
এখন তার সম্রাজ্ঞীর মতন মহিমা!
শৈশব কৈশোর আর যৌবনের সারা পথ হেঁটে
অবশেষে
সে এখন একযুগ সভ্যতার উজ্জ্বল আকাশ!

("পুতুল", *সারা দুপুর*)

কবি তাঁর শেকড়ের সমস্ত উপাদানকেই পুতুলের প্রতীকায়নে ফুটিয়ে তুলেছেন এ-কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতায়। তাঁর এমন প্রয়াস শিল্পকে মহিমান্বিত করেছে। এর পরও তাঁর কবিতা কখনো 'শিল্পের জন্য শিল্প'-নীতিতে পর্যবসিত হয়নি। বরং যে প্রতীকের আড়ালে ভাস্বর থাকুক না কেন ঘুরে-ফিরে জীবন এবং জগতের প্রেক্ষাপটই তাঁর কাব্যসাধনার মৌল অভিপ্রায় হয়ে উঠেছে, যা সহজেই বোধগম্য। তবে এ কথাও ঠিক যে শিল্পের গহন রহস্যময়তায় নিজেকে সংযুক্ত করার নতুন প্রয়াস চালিয়েছেন কবি এ-কাব্যের মধ্য দিয়ে। তাই তাঁর স্বভাবধর্মের বাইরে গিয়ে এখানকার কবিতা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি অন্তর্মনস্ক। এই কাব্যে তিনি ইতিহাস, সভ্যতা, জনজীবন, মৃত্তিকা ও শেকড়ের সন্ধানে পরিভ্রমণ করেছেন ঠিকই কিন্তু তার প্রায় সবই প্রতীকের অবলম্বনে। সংগত কারণে এখানে কবির অনুভূতির পরিপূরক হয়ে উঠেছে নতুন প্রতীক উপমা ও রূপকান্বেষণ। পুতুল, নদী, প্রবহমান নদী, নদীর ঘাট, জোয়ার সাম্পান, তরী, পালক, ভোর প্রভৃতি তিরি ব্যবহার করেছেন কাব্যশরীরে নতুনত্ব সংযোজনের প্রয়াসে।[৮] নদী আহসান হাবীবের *সারা দুপুর* কাব্যে অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে স্থান পেয়েছে। নদী কখনো জীবনের প্রবহমানতার প্রতীক, কখনো জীবন ও জনপদের ক্রমপরিবর্তনশীলতা, কখনো সভ্যতার বিস্তৃতি, নগরায়ণ এমনকি মূল্যবোধের পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নদী, নদীর স্রোত, প্রবহমান জলরাশি প্রভৃতি প্রতীকে কবি তাঁর এ-কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

১. দেখি চলো, নতুন নদীর তীর ঘেঁষে কারা হাঁটে
সামনে কার অমরতা একটি নবযুবার ভঙ্গিতে
হেঁটে যায়।
... ...
তার সে মুখের রেখা স্পষ্ট নয়;
মরা নদী পার হতে হতে দেখো দেখো
ফিরে ফিরে এখনও তাকায় সব মুখ;

("এসো সঙ্গী হই", *সারা দুপুর*)

২. ভোর থেকে ভোরে
জোয়ারে জোয়ারে নিত্য আরো বহু অভিজ্ঞ বিষয়ী
প্রজ্ঞাবান গৃহস্থের আরো বহু ফসল কুড়িয়ে
ফিরেছে যে যার ঘরে।
... ...
একদা অক্ষম কোনো নায়কের ভুল অভিনয়
নতুন জলের ঢেউয়ে মরা নদী জাগাবে;
এবং
আঁধার নির্জন ঘাটে আলো দেবে।

Dhaka University Institutional Repository

("উত্তীর্ণ প্রহরের গান", *সারা দুপুর*)

৩. জানি না কখন কবে 'মিডাস'-এর আর্ত অনুনয়ে
পৃথিবী চঞ্চল হবে, সব ক্ষুধা নগ্ন হবে—ঊর্ণার আড়াল
ছিন্ন হবে। আর্তির শিখায় দগ্ধ নির্লজ্জ পিপাসা;
... ...
সোনার কুৎসিত কর্কশ কাঠিন্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত—
আকণ্ঠ পিপাসা আজ এক বিন্দু নির্মল জলের
সে-নদীর যে-নদীর অশান্ত কল্লোল
অতিক্রম করে গেছে দীর্ঘ বহু বৎসরের পথ,

("প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা", *সারা দুপুর*)

৪. হিমে ও বর্ষায়
সূর্যের প্রহরা পাই,
প্রশান্তি চাঁদের;
নদীর কল্লোল আর সমুদ্রের ঢেউয়ের স্বপ্নের
পরিচর্যা পাই নিত্য
জীবনের এই ক্ষুদ্র ক্লান্ত নদীতীরে।

("শেষ সন্ধ্যা—প্রথম উষা", *সারা দুপুর*)

আহসান হাবীবের কবিতায় নিসর্গঘনিষ্ঠ শব্দের ব্যবহার নতুন নয়। কিন্তু *সারা দুপুর* কাব্যে নৈসর্গিক শব্দের ব্যবহার ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা নয়, মানুষের সার্বিক জীবনভাষ্য রচনা করেছেন কবি নদীর প্রবহমানতা, জোয়ারের প্রাবল্য, ঢেউয়ের তীব্রতা কিংবা আকাশ, ঝড়, আলো-ছায়া, অন্ধকার, ঘাট, ভোরের অনুষঙ্গ প্রভৃতি শব্দাচিত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এমনকি উপমা ব্যবহার; স্মৃতিময়তা, সজীবতা ও রূপকের অনুষঙ্গ ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি নৈসর্গিক শব্দচিত্রের শৈল্পিক গাঁথুনির মধ্য দিয়ে। সর্বোপরি পূর্ববর্তী কাব্যের চেয়ে এ-কাব্যে কবি প্রকরণের অনুশীলনে বেশি সচেতন ছিলেন, নিঃসন্দেহে বলা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ-কাব্যের কিছু উপমা তুলে ধরা হলো :

১. পুকুরের মাছ, গোলভরা ধান নেই, দুধমাখা ভাতে
এখন বসে না কাক; তবু রাত্রিদিন
প্রহরীর মত দেখো জেগে আছে দিগন্ত আমার

("এই ঝড়ে অন্ধকারে", *সারা দুপুর*)

২. অন্ধকার হই আর প্রায়অন্ধ দুটি চোখ তুলে
নির্বোধ পশুর মত চেয়ে থাকি;

("স্বরূপে মহিমা তার", *সারা দুপুর*)

৩. তাকে দেখি নিজের মনের আর্শিতে
সকালসন্ধ্যা অনিকেত প্রেয়সীর মত

("তারা দু'জন", *সারা দুপুর*)

৪. আবরণহীন উলঙ্গ সেই মানবশিশু
আর তার নরম তুলোর মত দেহ
যদি না-ও জেনে থাকে
অবিনশ্বর কবিতার মর্মকথা—

("নতুন কবিতা", *সারা দুপুর*)

৫. স্বজন একজন আছে

Dhaka University Institutional Repository

তার নাম প্রেম—
হৃদয়ে জাগ্রত আছে
অবিকল কৈশোরের মত।
("স্বজন", *সারা দুপুর*)

৬. নরম মসৃণ আর কটি কলাপাতা রঙের এই মুখটি
আহা, কত যেন চেনা আমার।
("অভ্যাগত", *সারা দুপুর*)

শুধু উপমার ব্যবহারেই নয়, লক্ষ্যভেদী শব্দের ব্যবহারে কবি নির্দিষ্ট একটি গন্তব্যে পৌঁছার সাধনা শুরু করেছেন এ-কাব্যের মধ্য দিয়ে। তুলনা করলে দেখা যায়, আগের দুটি কাব্যেও কমবেশি উপমার ব্যবহার কবি করেছেন। সেখানে তাঁর সংক্ষুব্ধ কবিমনের হতাশা-সংশয়, ক্ষোভ প্রভৃতি উপমান্বিত হয়েছিল। কিন্তু এখানে কবি যেন অফুরন্ত প্রাণের সন্ধান লাভ করেছেন। সেই তুলনা কবিতায় পঙ্‌ক্তি বিন্যাস কিংবা শব্দ প্রয়োগেই শুধু নয় উপমার ব্যবহারেও দৃশ্যমান। কবি ক্রমেই তাঁর শিল্পচেতনার অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসরমাণ, সেই বিষয়টি নানাভাবে ফুটে উঠেছে এই কাব্যে। নতুন সময়ের মোকাবিলা করা নাগরিক কবিকে নতুন করে ভাবিয়েছে। কেননা, তাই তিনি নাগরিক কবি হলেও নগর-সাধক নন। তবে এটা তো ঠিক যে কবির অভিজ্ঞতা বর্তমানের বহির্জাগতিক দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে ঋদ্ধ হয় এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ব্যক্তির সৃষ্টিশীল মানস-সংগঠন। এক্ষেত্রে কল্পনা-প্রবৃত্তিও ব্যক্তির মানস বিকাশে সাহায্য করে। সুতরাং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একজন কবির মনোলৌকিক চিন্তা ও কল্পনার যে-পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তনসূত্রেই তাঁর কল্পলোক-সৃজিত উপমার গঠন ও বৈশিষ্ট্যে আসে বিপুল বৈচিত্র্য। তাঁর প্রথম দুটি কাব্যে উপমা হিসেবে ব্যবহৃত শব্দের অধিকাংশই ছিল বৈকল্য, জ্বরা, বিষণ্নতা, শোকগ্রস্ততা, মৃত্যুর বিভীষিকা প্রভৃতির সঙ্গে তুল্য কোনোকিছু। কিন্তু এ-কাব্যে ব্যবহৃত উপমায় এসেছে প্রাণের স্ফুরণ। উপমার পাশাপাশি এই কাব্যে পর্যাপ্তসংখ্যক সমাসোক্তি অলংকারের ব্যবহারও লক্ষণীয়। সমাসোক্তি ব্যবহারের এই প্রবণতা পূর্বতন জ্বরা-পীড়িত কবির জীবন্ময় হয়ে ওঠারই শিল্পস্মারক। যেমন :

১. এত যে আঁধার
রৌদ্রের রূপালী পাখা ঢেকে দিয়ে
কেবল তুফান আঁধারের সারা বিশ্বে ছড়ায়
("কান্না নেই", *সারা দুপুর*)

২ ঝড়ের থাবারা যদি হানা দেয় মাথার ওপরে
ঘরের পুরনো ছাতে
হয়ত দেখা দেবে কোন বিহঙ্গ-মন;
বৃষ্টির সাহানা সুর তখন
আমাদের নিস্তরঙ্গ মনে
("নতুন কবিতা", *সারা দুপুর*)

৩ এখন বসে না কাক; তবু রাত্রিদিন
প্রহরীর মত দেখো জেগে আছে দিগন্ত আমার;
("এই ঝড়ে অন্ধকারে", *সারা দুপুর*)

৪ দূরে বহু দূরে

Dhaka University Institutional Repository

রৌদ্রের ফসল ঝরে শুকায়,

রাত্রির

শিশির নতুন স্বপ্ন জড়িয়ে ঘুমায়।

("মন বলে", *সারা দুপুর*)

প্রকরণ-সচেতনতা সত্ত্বেও প্রকৃতিজাত শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবি সমাজ-লগ্ন থাকার চেষ্টা করেছেন। সেই সংলগ্নতা প্রমাণ করেছেন তিনি প্রতীক, উপমা, সমাসোক্তির পাশাপাশি রূপকের আবডালেও। অন্ধকারাচ্ছন্ন, বাক্‌রুদ্ধ সময়ের ও সমাজমানসের বর্ণনায় কবি ব্যবহার করেছেন প্রকৃতি-অনুষঙ্গী রূপকাশ্রয়ী শব্দ। সমাজমানসের বর্ণনার অংশ হিসেবেই কবি তাঁর বক্তব্যকে রূপকায়িত করেছেন। তাতে কবিতার শরীর-কাঠামো হয়েছে বৈচিত্র্যমণ্ডিত। যেমন : মানুষের মনের কুটিল দিক তুলে ধরতে তিনি 'অমাবস্যা-হৃদয়', বাঁধন-হারা ভাবনার স্বরূপ বোঝাতে 'বিহঙ্গ-মন', ফসলি মাঠের সৌন্দর্যকে মোহনীয় করে তুলতে তিনি 'পলাশপ্রসন্ন' মাঠ আর ফুলের সৌন্দর্যের বিবর্ণ রূপ ফুটিয়ে তুলতে 'পলাশ-ছলনা' প্রভৃতি রূপকাশ্রিত শব্দ প্রয়োগ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলে ধরা হলো :

১. যে আছে আদিম সঙ্গী—তার
অমবস্যা-হৃদয়ে নির্জনে
ফুল তোলে
নিজ হাতে খোঁপায়
রাণী সাজে।

("পুতুল", *সারা দুপুর*)

২. ঝড়ের থাবারা যদি হানা দেয় মাথার ওপরে
ঘরের পুরনো ছাতে
হয়তো দেখা দেবে কোন বিহঙ্গ-মন;

("নতুন কবিতা", *সারা দুপুর*)

৩. অথবা কখনো
পলাশপ্রসন্ন এই মাঠে মাঠে
বৈকালিক ভ্রমণের ছদ্মনামে
সঙ্গে ক'রে আনিনি কি
আমাদের আজন্ম অবুঝ সঙ্গীদের—

("স্বরূপে মহিমা তার", *সারা দুপুর*)

৪. এবং বিবর্ণ বকুল যুঁই পলাশ-ছলনা
পার হয়ে নিষ্প্রদীপ কুটীরের সব বেড়া
ছুঁয়ে যাক অকৃত্রিম আত্মীয়তা এবং আত্মার
মলিনতা ধুয়ে নিয়ে এসো পরস্পর সঙ্গী হই।

("এসো সঙ্গী হই", *সারা দুপুর*)

Dhaka University Institutional Repository

দুই

উনিশ শো বায়ান্ন সালকে যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপনের সময় হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে ওই শতকের ষাটের দশক ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার গোড়াপত্তনের সময়কাল। উত্তুঙ্গ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাঙালির মৌলিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে জন-আন্দোলন, সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রভৃতি সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে রচিত হয়েছে আহসান হাবীবের কাব্যগ্রন্থ *আশায় বসতি* (১৯৭৪)। এর কবিতাগুলো মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে লেখা। এ সময়ে উত্থাপিত ছফা দাবি, আইয়ুব-বিরোধী গণ-আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিকে অবতীর্ণ হওয়ার শপথ নিতে সহায়ক হয়েছিল। কবি নিজেই কবিতাগুলো রচনাকালের সীমারেখা টেনে দিয়েছেন—এ গ্রন্থের মুখবন্ধে[৯]। মাঝেমধ্যে অসম্ভব নির্লিপ্ততা আর মাঝেমধ্যে জেগে ওঠার দোলচলতার মধ্য দিয়ে কবি মধ্যবিত্তের চিরন্তনতা ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতাগুলোতে। মধ্যবিত্তের এই মানসিকতাই এ-কাব্যে কবির প্রধান অবলম্বন। যে কারণে যুৎসই শব্দ দিয়ে অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্তের ছন্দ-কাঠামোয় আহসান হাবীব সাজাতে পারেন নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালা :

পরার্থে বিলাবো প্রাণ এমন মহৎ
উদ্দেশ্যে কখনো নই নিবেদিত।
... ...
আমি কিছু মনোরম কথার কাঙাল।
জীবনের আটপৌরে রঙ্গমঞ্চে কিছু সুর
সঙ্গীতের দুটি একটি মোহন কলির
অতলে বিশ্রাম চাই কিছুক্ষণ,
অথচ প্রত্যহ
অবিশ্রাম নিরাশ্রয় চীৎকারে খণ্ডিত আর সচকিত
এই লোকালয়ে
কোথাও কথার মালা পড়ে না আমরা চোখে, আমি সারাদিন
নৈঃশব্দ্যের (sic) ভয়াবহ ভারী এক শব কাঁধে নিয়ে
ঘুরিফিরি।

("নৈঃশব্দে (sic) নিহিত আমি", *আশায় বসতি*)

তবে এটা ঠিক, কবির এই অকপট স্বীকারোক্তির পুরোটাই মধ্যবিত্তের সুবিবেচনাপ্রসূত নয়। বরং মধ্যবিত্ত যেন এখানে নেতিবাচক ভূমিকায় উপস্থিত। মূলত মধ্যশ্রেণির অবদান কিংবা তাদের কর্মকাণ্ডের ইতি-নেতি দিয়েই সমাজে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। প্রয়োজনের সময় এই মধ্যশ্রেণির মানুষগুলোই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে, সেই ইতিহাস আমরা পাই ১৯৪৭ সাল থেকে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে আজ অবধি মধ্যবিত্তের সক্রিয়তা বিদ্যমান। তবে আপাতভাবে আহসান হাবীবের এই মানসিকতাকে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে কিঞ্চিত বিতর্কিত মনে হলেও সংকটকালে মধ্যবিত্তের এমন অবস্থান দুর্লক্ষ নয়। আবার এই কাব্যেরই বেশ কিছু কবিতায় আহসান হাবীবের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানও লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ মধ্যবিত্তই যে আন্দোলন-সংগ্রামে সামনের সেনানী হয়ে অগ্রসর হয়, সে-বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এ-কাব্যে। আর্থ-সামাজিক অসংগতির কারণে হতাশাদীর্ণ মধ্যবিত্তের পলায়নপর মনোবৃত্তি কখনো কখনো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তবে তা অবশ্যই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে নয়। বিশেষ করে, আগের কাব্যগুলোতে যে আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে, সেই তুলনায় *আশায় বসতি*র শুরুতেই পাঠককে হকচকিত হতে হয়। কবির ভাষ্য অনুযায়ী এ-কাব্যের

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাবলি যদি ষাটের দশকেই লেখা হয়ে থাকে, তবে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, ওই সময়ের আন্দোলন-সংগ্রামে এই মধ্যবিত্তেরই ছিল সবচেয়ে বড় অবদান। কেননা, কাব্যের মুখবন্ধ পাঠ ক'রে কবিতাসমূহ রচনার কালগত যে-পরিচয় পাঠক লাভ করে এবং কবিতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পাঠকমন আগাম যে-প্রস্তুতি গ্রহণ করে, কাব্যান্তর্গত প্রথম কবিতার শিরোনামাতেই পাঠকের সেই প্রত্যাশা আহত হয়। তবু মধ্যবিত্ত চরিত্রে সংগ্রামশীলতা ও পলায়নপর মনোবৃত্তির সমান্তরাল অবস্থানের অনিবার্যতা পাঠকের প্রত্যাশা ও আশাভঙ্গকে এক শিল্পতাত্ত্বিক মীমাংসায় পৌঁছে দেয়।[১০] যেমন :

নৈঃশব্দের (sic) ভয়াবহ ভারী এক শব কাঁধে নিয়ে
ঘুরিফিরি। কথার কাঙাল
আমি। তবু এই নৈঃশব্দের নির্মম তাড়ায়
সমস্ত শহর আর জনপদ প্রদক্ষিণ আমার নিয়তি যেন। যেন
নিশিলগ্ন নিঃসঙ্গ পথিক।

("নৈঃশব্দে (sic) নিহিত আমি", *আশায় বসতি*)

এখানে 'নৈঃশব্দ' (sic) শব্দটি কবিতায় প্রবল শক্তির প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর কবিতাটির এই অংশটি চিত্রকল্পের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। এমনকি পুরো কবিতায় সাংগীতিক আবহও ফুটে উঠেছে। সৃষ্টির প্রেরণায় কবি কখনো অতীতচারী, কখনো সমকালের সমাজ-ভাবনাকে সাঙ্গীকৃত করেছেন এ-কাব্যের কবিতায়। আবার কখনো কবিতায় উপস্থাপিত দেশজ পরিমণ্ডলকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে উত্তীর্ণ করেছেন স্বীয় প্রতিভাবলে। তবে ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময়তাকে অবলম্বন করেছেন তিনি। যেমন অমিল প্রবহমান ও সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্তের প্রতি বেশ আকর্ষণ লক্ষ করা যায় এ-কাব্যের বেশ কিছু কবিতায়। যখন কবি বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতার তিক্ততাকে ছন্দ বদ্ধ করতে চেয়েছেন, তখন তিনি আশ্রয় নিয়েছেন অমিল প্রবহমান ছন্দের। যেমন : "নৈঃশব্দে (sic) নিহিত আমি"। আর সমিল প্রবহমান ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবিতার বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে আশাবাদ। ইতিবাচক স্বপ্নের কথা কিংবা বিষয়কে ইতিবাচক করে তুলেছেন যেসব কবিতায়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে "স্বগত", "কাহিনী নিরন্তর", "সামনে ধু ধু নদী", "মায়ের ডাকের ছড়া" প্রভৃতি। এর মধ্যে "মায়ের ডাকের ছড়া" কবিতায় সন্তানের প্রতি বাঙালি মায়ের চিরন্তন হৃদ্যতার প্রতিফলন ঘটেছে। ছন্দের দোলাতেও বিষয়টি স্পষ্ট। স্তবক-বিন্যাসরীতিতে বৈচিত্র্য আনা আর চরণ ভাঙাতে যেন কবি বেশ আনন্দ উপভোগ করেছেন। এই কাব্যে ছন্দের এই কারুকার্য বেশ কিছু কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন :

জানালা খুলে দাও
দরজা খুলে দাও
চোখের সামনে কে দোলায় কালো কালো
মলিন পর্দাটা
পর্দা তুলে দাও।
প্রাণের সব আলো
পুড়েই নিঃশেষ
আঁধার গুহাতে,
কেটেছে সারা রাত
আঁধার *ঠেলে ঠেলে*
ব্যর্থ দু'হাতে।

("স্বগত", *আশায় বসতি*)

Dhaka University Institutional Repository

এখানে সমিল প্রবহমান রীতিতে পঙ্‌ক্তিতে প্রতি পর্ব সাত মাত্রায় বিন্যস্ত হয়েছে। এরপরের কবিতাটি অবশ্য স্বরবৃত্ত ছন্দের। তবে পঙ্‌ক্তিতে মাত্রাসংখ্যা বারোটি হওয়ায় ছন্দপ্রয়োগে এখানে বৈচিত্র্য এসেছে। এই চটুল ছন্দেও তিনি বক্তব্য প্রকাশে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। একেকটি স্তবক তিন-চরণে বিন্যস্ত। আর প্রতিটি চরণই অন্ত্যমিল-সম্পন্ন হওয়ায় কবির এই প্রয়াস বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। যেমন :

আলের পথে আসবে না সে আসবে আর
পথের 'পরে বিছায় কাঁটা কোন্ দুরাচার
আসবে না সে আলের পথে আসবে না আর।

... ...

বিজন নদী নদীর ঘাটে অন্ধকার!
আলের পথে বিছায় কাঁটা কোন্ দুরাচার!
তবু আশার আলোর শিখা নেবে না কার।

("কাহিনী নিরন্তর", *আশায় বসতি*)

এ ছাড়া "সামনে ধু ধু নদী" শীর্ষক কবিতাটিতেও অন্ত্যমিল লক্ষ করা যায়। আর "মায়ের ডাকের ছড়া"য় একটি নতুনত্ব পরিদৃশ্যমান। যা পঙ্‌ক্তি, স্তবক ও পর্ববিন্যাসে সুস্পষ্ট। কবিতাটিতে একই সঙ্গে দুই ধরনের পর্ববিন্যাস লক্ষণীয়। এমনকি চরণ-বিন্যাস ও স্তবক-নির্মাণেও রয়েছে ব্যতিক্রমী কৌশল। উপর্যুক্ত কবিতাগুলোতে একদিকে কবির মানসিক যন্ত্রণার তীব্রতা, অন্যদিকে আশাবাদের সুর প্রতিধ্বনিত। নিরন্ধ্র অন্ধকার গুহার দুঃসহ পরিবেশ থেকে মুক্তির আশায় কবি আলোর জগৎকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন ব্যাকুলভাবে। আলোকের সেই প্রত্যাশা চমৎকারভাবে আশাবাদে পরিণত হয়েছে।[১১] তাই মা আর সন্তানের কথা-বিনিময়ে "মায়ের ডাকের ছড়া"র ছন্দবৈচিত্র্যে প্রতিফলিত হয়েছে ভিন্নমাত্রিক আশাবাদ। সেই সঙ্গে ছড়ার ছন্দ হিসেবে স্বরবৃত্ত যেমন বিষয়টির উপযুক্ত, তেমনি রূপকথা ও লোকছড়ার ঐতিহ্যও এখানে সরবে উপস্থিত :

মাথায় হরিণ শিং লাগিয়ে সং সেজেছে চমৎকার।
খোকন ভাবে, বেশ সেজেছি, এমন সাজে সাধ্য কার?

... ...

মা কেঁদে কন, হায়রে অবোধ
বুড়ো খোকন বুঝলিনে...
সং সেজে নেই সুখের সীমা
নিজের আদল খুঁজলিনে।
দুধ-সাগরে নাইয়ে দেবো আয়রে খোকন ঘরে আয়
শীতলপাটি বিছানা দেবো খোকন ফিরে আয় রে আয়!!

("মায়ের ডাকের ছড়া", *আশায় বসতি*)

এই কাব্যের প্রথম কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবি হতাশা ব্যক্ত করলেও পরের কবিতাগুলোতে তিনি ক্রমান্বয়ে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। মাঝে মাঝে স্তিমিত হলেও আশাবাদের এই সুর আর নীড়ের কাছাকাছি থাকার প্রয়াস আহসান হাবীবের কাব্যে শুরু থেকেই দৃশ্যমান। সেই সঙ্গে প্রতীক-রূপকের ব্যবহার কাব্যশরীরকে যেমন সুসংহত করেছে, কবির চেতনা ও অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও তা পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মূলত কবিতাকে কালোত্তীর্ণ ও চিরকালীন আবেদনে পরিপুষ্ট করার জন্য প্রতীক-রূপক ব্যবহারে সচেতনতা উচ্চাঙ্গ শিল্পনির্মাণের প্রয়াসেরই দৃষ্টান্তবাহী। *আশায় বসতি* কাব্যে বিভিন্ন কবিতার নামের মধ্য দিয়ে সচেতন প্রতীক নির্মাণের প্রয়াসকে তিনি বাস্তবায়িত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন: "সেই নদী", "সামনে ধু ধু নদী", "বাস নেই", "নদীকে সামনে রেখে" প্রভৃতি শিরোনামার কবিতা। এসব শব্দ ব্যবহারে কবিতার নামকরণের ক্ষেত্রে কখনো অতীতচারিতার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে, আবার কখনো ভবিষ্যৎকে দেখার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। এই চারটি কবিতার মধ্যে তিনটিতেই 'নদী' প্রতীকের মধ্য দিয়ে কবি অতীতচারী হওয়ার চেষ্টা করেছেন। শুধু তা-ই নয়, কবি রূপকথার রাজ্যের পরীর দেশের সঙ্গে নিজের দেশ আর নদীর স্মৃতিকে লীন করে তুলেছেন। তাই কবির ভাষ্যটি এ-রকম :

তোমার কি মনে পড়ে সেই নদী যে নদীর ঘাটে
আমরা দুপুরে নিত্য প্রচণ্ড দুপুরে
হাতে হাতে বেঁধে সাঁতরে পারাপার হয়েছি এবং
জোয়ারের জল কিছু তুলে এনে ছড়িয়েছি প্রত্যহ বাগানে?
তোমার কি মনে পড়ে
আমরা ক'জন আমরা সবাই বিকেলে
উঠানের পুব পাশে আমলকীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে
সেই নদী দেখতাম ভাবতাম কোনো অপরূপ নর্তকীর মত
সে যেন প্রত্যহ কোনো পরীর দেশের সুর
বেঁধে নিয়ে পায়ের ঘুঙুরে আসে যায়;
("সেই নদী", *আশায় বসতি*)

'নদী'র প্রতীককে অবলম্বন করে কবি ফিরে গেছেন রূপকথার অতীতে। জীবন ও জগতের চিরচলমানতার বিষয়টি কবিতায় নতুন করে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত কবির চিন্তায় অতীত স্মৃতির যে-নদী ধরা পড়েছে, তার ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যে তাঁর কবি হয়ে ওঠার সময়ের কথা আর শৈশবকালে বিরাজমান ঐতিহ্যের কথাও উঠে এসেছে। কিন্তু কবি এর মধ্য দিয়ে যখনই দৃষ্টি ফেরান সামনে, তখনই তিনি বিরান ভূমি, বন্ধ্যা আর জ্বরাগ্রস্ত পৃথিবীকে দেখতে পান—আরও দেখতে পান, 'বিদেশী বিচিত্র পালে রুদ্ধশ্বাস/তীরে তার হাটে নতুন পশরা'। তাই অন্য একটি কবিতায় 'ধু ধু' শব্দটি প্রয়োগ করেন প্রতীকার্থে, যা নেতিবাচক তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। সমকালীন অস্থির ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কবি যেন দিগ্বিদিক শূন্য এক অন্ধকার ভবিষ্যৎকে দেখতে পেয়েছিলেন "সামনে ধু ধু নদী" কবিতায়—

হাওয়াতে করতাল। মত্ত রোলে তার
সুরের উতরোল করছে পারাপার
সামনে ধু ধু নদী ওড়ায় শত পাল
রঙিন শত পাল।
হাওয়াতে করতাল বাজিয়ে আর কত
নিজেকে নিজে তুমি রাখবে বিব্রত
দগ্ধ করোটিতে মেঘের মহাভার
নামাবে কত আর?
("সামনে ধু ধু নদী", *আশায় বসতি*)

"বাস নেই" কবিতায় বলা হয়েছে চিরচলমানতার কথা। তবে চলার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের পথ যে সহজ নয়, 'নেই' শব্দের নেতিবাচক তাৎপর্য সেখানেই। ব্যর্থতার বাস্তবতাকে মাথায় নিয়েই এ-কবিতায় সামনে চলার এক সুগভীর আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। তবে ব্যর্থতার এই বোধই কবির মানস-বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এই বোধ থেকে কবির চিন্তা ও বিশ্বাস যে মানুষের অস্তিত্ব-সংলগ্ন হয়েছে, তারই সদর্থক পরিচয় কবিতাটি। তবে এর শেষদিকের শব্দবিন্যাসে জীবনানন্দীয় ঢঙ প্রভাব ফেলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

একটি দুর্বোধ্য ও জটিল সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও মহৎ জীবনের চলমানতার প্রসঙ্গে আহসান হাবীব বলে ওঠেন :

বাস্‌হীন পৃথিবীতে আমি তাই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি। আর
ভাবতে পারি এখন পরার্থপর ভাবনা কিছু—আহা
যদি কোনোদিন এই পৃথিবীতে
এইসব স্বপ্নের পাখিরা আর না-ই আসতো
অথবা পাখায় তার
সকলেরই জায়গা হতো যদি অনায়াসে
আমার আপনার আর ওদের সবার
থাকতো যদি বাস্‌-কড়ি সবার হাতেই!

("বাস নেই", *আশায় বসতি*)

কবির কাছে সমাজ ও জীবন প্রসঙ্গে চিন্তা ও মননে এই সদর্থক উত্তরণ ছিল পাঠকের কাঙ্ক্ষিত। 'বাস' প্রতীকের মাধ্যমে গতিময় জীবনের কথা বলতে গিয়ে কবির চিন্তা ব্যক্তি থেকে সমষ্টিচেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এটি তাঁর কবিসত্তার মূল বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। মূলত সমাজমনস্ক কবি কিংবা শিল্পীমাত্রই ব্যক্তির সমাজ-সম্পৃক্তিকে তাঁদের সৃষ্টিকর্মে একটি মহৎ উদ্দেশ্য বা লক্ষণ বলেই বিবেচনা করেন, যার পরিণতি এ ক্ষেত্রে সামূহিক জীবন-জিজ্ঞাসায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কেননা, সমাজ-সচেতন কবি হিসেবে আহসান হাবীব তাঁর লালিত স্বপ্ন ও আবেগ সুন্দর ও মঙ্গলের বৃহত্তর সূত্রে উপস্থাপন করতে চান। তাই ষাটের দশকে বাঙালি জাতির জীবনে বিরাজমান অনিবার্য পরিস্থিতিতেও তাঁর শিল্পপ্রকাশে ছিল সৌন্দর্য আর দায়ভারের চমৎকার মেলবন্ধন। কাল-পরিক্রমায় পূর্ববাংলার মাটি ও বায়ু, আকাশ ও জলের সঙ্গে বাঙালি জাতির যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তারই দুর্নিবার মন্ত্রে সমস্ত জাতি উজ্জীবিত হয়েছিল পাহাড়সম দৃঢ়তায়। ভেদাভেদ ভুলে শিল্পসত্তার অধিকারী হিসেবে শুধু কবি নন, শিল্পিত কবিতাও স্বাধিকার আন্দোলনের ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। প্রতিবাদ আর প্রেরণা, ক্ষোভ আর স্বপ্ন একাকার হয়ে গিয়েছিল কবির সংবেদশীল শব্দচেতনায়। বিশেষ করে, আলো ও উজ্জ্বলতাবহ শবদযোজনায় যখন তিনি বলেন :

মিছিলে অনেক মুখ
দেখো দেখো প্রতি মুখে তার
সমস্ত দেশের বুক থরোথরো
উত্তেজিত
শপথে উজ্জ্বল!
সূর্যের দীপ্তিতে আঁকা মিছিলের মুখগুলি দেখো
দেখো দৃপ্ত বুক তার
দেখো তার পায়ের রেখায়
দেশের প্রাণের বন্যা উচ্ছল উত্তাল।
... ...
দেখো লক্ষ জনতার প্রাণ
অমর দীপ্তিতে জ্বলে মিছিলের সারা মুখে দেখো।

("মিছিলে অনেক মুখ", *আশায় বসতি*)

কিছু বাস্তবানুগ শব্দ প্রয়োগ করে কবি যে দৃশ্যায়নের অবতারণা করেছেন, তা মূলত বাঙালির সামষ্টিক বীরত্বের ঐতিহাসিক ও অমর শৈল্পিক বিন্যাস। এসব পঙ্‌ক্তি দ্বারা তিনি গোটা জাতির জীবনবোধ ও করণীয় সম্পর্কে তাগিদানুভূতি ব্যক্ত করেছেন। জাতির মুক্তিপ্রয়াসকে সমর্থন করে কবি 'উত্তাল', 'উচ্ছল', 'জনতার মিছিল', 'আত্মার আভা' প্রভৃতি শব্দ দিয়ে ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন। জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে

Dhaka University Institutional Repository

কবি এই কৌশলের স্বাক্ষর রেখেছেন। কেননা, তৎকালে বাঙালির সমাজজীবনে বিরাজিত হতাশা, বঞ্চনা ও নির্যাতনের কশাঘাত থেকে মুক্তির জন্যই এমন ইঙ্গিতের আশ্রয় নিয়েছেন কবি। তবে হতাশা, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর ব্যর্থতাবোধকে মাথায় রেখেও কবি আশাবাদের জয়গান গেয়েছেন *আশায় বসতি*র মধ্যে। কোনোকিছুই কবির সংবেদনশীল চোখ এড়াতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আশাবাদই হচ্ছে এ-কাব্যের মৌল সুর। কারণ এখানে যেমন আছে 'সমুদ্রের জোয়ারে প্রাণ সমর্পিত' হওয়ার কথা, 'মিছিলে শামিল' হওয়ার কথা, 'ঘুমের ক্লান্তি' শেষ হওয়ার কথা, তেমনি আছে শিল্প-মানবিক হওয়ার প্রসঙ্গও। এর বেশি যা আছে, তা হলো, প্রগতির পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ। "ডাক" কবিতায় মুক্তির আন্দোলনে যে সর্বশ্রেণীর মানুষ একাত্ম হয়েছিল, সে বিষয়টিই উচ্চকিত করে তুলে ধরেছেন। কারণ আহসান হাবীব কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে সাধারণের কাতারে নেমে এসেছেন দেশপ্রেমের চেতনায়। এই চেতনাটি ফুটে উঠেছে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের চোখেমুখে, যা আয়নার প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির মতোই স্বচ্ছভাবে দৃশ্যমান :

সব মুখে দেশে আত্মার
আরশি যেন। সব মুখ দেশের আরশিতে আঁকা যেন।
সারা দেশ সবাই মিছিলে।
আমি যাকে ডাক দেবো সঙ্গে নেবো
সে আমার অনেক আগেই
মিছিলে শামিল, আমি
তারই সঙ্গী, সে আমাকে লজ্জার মুকুট পরিয়েছে।

("ডাক", *আশায় বসতি*)

যেহেতু আহসান হাবীব তাঁর শিকড় ও সমাজকে স্বীকার করে বলতে পারেন, 'শিল্প মানুষের জন্য, মানুষ শিল্পের জন্য নয়', তাই তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি থেকে জেগে ওঠে উর্বর পলিমাটি। আর দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় কবিতার বেলাভূমি নিরাশা ও তমসা দিয়ে ঘেরা থাকলেও মানুষ ও মানবিক সত্তাই কবির শিল্পসুষমার প্রধান অনুষঙ্গ।

তিন

'১৯৭১-মার্চ-এর আগে পর্যন্ত লেখা প্রায় সব কবিতাই এই-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে'—আহসান হাবীবের এমন ঘোষণার কারণেই নিশ্চিত হওয়া যায় যে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হলেও *আশায় বসতি* কাব্যের অধিকাংশ কবিতা মুক্তিযুদ্ধকালে রচিত নয়। ষাটের দশকের রাজনীতির উত্তপ্ত ময়দান আর স্বাধিকার আন্দোলনের সম্ভাব্য পরিণতির প্রকাশ-প্রয়াস অত্যন্ত উচ্চকিত—অন্তত এ-কাব্যের কবিতাবলিতে শব্দ ব্যবহারের প্রখরতা দেখে তা-ই বোঝা যায়। তবে, ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত *মৈঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যে যুদ্ধকাল এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালের কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—'সেসব কবিতা আর একটি পৃথক সংকলনে প্রকাশের আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে' বলে পাঠকের কাছে আগে থেকেই কবি প্রতিশ্রুত ছিলেন। সার্বভৌম ভূখণ্ড আর অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়াও বাঙালির জাতীয় চৈতন্যের মূলানুগত দূরসঞ্চারী উৎকর্ষই তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জন-আকাঙ্ক্ষার অন্যতম কারণ। সেই আকাঙ্ক্ষা আর ভেতরে লালিত দায়িত্ববোধের কারণেই একাত্তরে বাঙালির স্বাধীনতা-পিয়াসী চেতনা একবারের জন্য ম্রিয়মাণ হয়নি। বিশ্ব-মানচিত্রে বাংলাদেশে জায়গা করে নেওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছে *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*। তাই বলে শুধু মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ এ-কাব্যের কবিতায় উপস্থাপিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যভাবে বলা চলে শুধু মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি এসব কবিতায় মুখ্য হয়ে ওঠেনি। অবশ্য সমাজচরিত্রে তার বাস্তব কারণ বিরাজমান ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির উত্তরকালে জাতির জীবন কাঙ্ক্ষিত সদর্থকতার পরিবর্তে কলুষিত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই সময়টাতে কবি যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা ছিল 'নৈরাজ্যিক অবস্থা, খুন-গুম-রাজনৈতিক হত্যা-লুণ্ঠন-ব্যাঙ্কডাকাতি-রাহাজানি-অবক্ষয়িত মূল্যবোধ-জাতীয় নেতৃত্বে বিশ্বাসঘাতকতা—সব মিলিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের বুকের উপর ভিন্নতর তাণ্ডব।'[১২] ওই সময় জাতীয়ভাবে এমন বিপর্যয়ের কারণে বাঙালির স্বপ্নভঙ্গের প্রথম সূত্রপাত ঘটে। সামাজিক-রাজনৈতিক-অসঙ্গতির এমন তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গই কবির অকৃত্রিম প্রয়াসে রূপক-সংকেত আর প্রতীকের অবয়বে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এ-কাব্যে। যেমন জাতীয় জীবনের পট-পরিবর্তনের পর কবির মনোভূমি যেন জরাগ্রস্ত-বিপর্যস্ত—অর্জিত স্বাধীনতার চেতনা যেন তখন ভূলুণ্ঠিত তাই বলে ওঠেন, "আমারত কোথাও না কোথাও যেতে হবে"। ইঙ্গিতময় এমন যাওয়ার অর্থ স্বপ্নকে হারিয়ে খোঁজার শামিল :

হাঁটতে হাঁটতে যখনই যন্ত্রণা আর
উদ্বেগে রক্তাক্ত দু পা
চারদিকে ছুঁড়তে থাকি, বলি
হে পৃথিবী, পৃথিবীর হে শ্রদ্ধেয় গুরুজন, আমি
কোথাও না কোথাও অবশ্যই যেতে চাই
বসতে চাই
এবং বিশ্রাম চাই
আপন আবাসে।
... ...
পুরনো পিঞ্জর খুলে
সোনাদানা যতই ছড়াও
বলো আয় আয়!
আমি এই পথ থেকে ফিরবো না, কেননা
মানুষকে কোথাও না কোথাও যেতেই হয়

("আমারত কোথাও না কোথাও যেতে হবে", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

এর পরের কবিতায় দেখা যায়, রূপকের আশ্রয় নিয়ে কবি সমাজের চিত্রকে শব্দে ধরার চেষ্টা করেছেন। "এক দুই তিন" নামের এই কবিতাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি পর্বই কবি উপস্থাপন করেছেন রূপকের মাধ্যমে। প্রথম পর্বে তিনি মনে হয় দেশকেই তুলে ধরেছেন ভাঙাচোরা আয়নার রূপকে। এই রূপকটি যেন কবির সর্বশেষ কাব্য *বিদীর্ণ দর্পণে* মুখকে সম্ভাবিত করে তুলেছে। কারণ সেখানে সময়ের বাস্তবতায় সবকিছু বিদীর্ণ হয়ে যায়—এমন প্রতীকাভাসই লক্ষণীয়। এ-কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো একই তাৎপর্যের কারণে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে :

শেষ বেলা বাড়ি ফিরে সেই আয়না প'ড়ে আছে
খান খান
ভাঙ্গাচোরা ভাঙ্গাচোরা টুকরোয় বিম্বিত
করুণ রক্তাক্ত মুখ
হাত-পা ভাঙা
একটি বয়স্ক অবয়ব।

("এক দুই তিন", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন সমাজ ও জাতীয় জীবনে নেমে আসা ভয়াবহতা যেন মানুষকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। তাই এ-কবিতার দ্বিতীয়াংশে মানবিক মূল্যবোধের স্খলনের স্বরূপ তুলে ধরতে পেরেছেন তিনি:

কী সওদা সম্বল ক'রে ঘরে ফিরবো
এই ভেবে
যখন পথিক-সুজনকে ডেকে ডেকে
বললাম আমাকে কিছু ভালোবাসা দাও
'কড়ি দাও' বলে লোকটা
হাত পেতে দিলো।

("এক দুই তিন", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

আর তৃতীয় স্তবকটিতে দেখা যায়, 'আত্ম-অনুসন্ধান ও জাতিসত্তার অনুসন্ধান'ই এ-পর্যায়ে কবির মূল উদ্দেশ্য। কারণ বাংলাদেশের তৎকালীন সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল যেন 'দিশেহারা কাঠবেড়ালী'র মতোই। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার বিপরীতে ছুটে ছলা আর নতুন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার অস্বাভাবিক বাস্তবতাকে কবি 'কাঠবেড়ালী'র 'নিবাস' খোঁজার সঙ্গে প্রতিকায়িত করে তুলেছেন। আত্ম-অনুসন্ধানের তেমন প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতে তিনি বলেছেন :

দিশেহারা কাঠবেড়ালী একবার মগডালে যায়
আর একবার গাছের তলায়
ছটফট ছোটাছুটি
ছুটে ছুটে প্রাণান্ত তবুও
আপন নিবাস
খুঁজে খুঁজে কোথাও মেলে না।

("এক দুই তিন", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

উপর্যুক্ত কবিতার সবগুলো পঙ্‌ক্তিতে রূপকের আবডালে কবি যা ব্যক্ত করেছেন, তা সমাজ-অভিজ্ঞতার নেতিবাচক স্বরূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কোনো একটি বিশেষ আখ্যান বা বক্তব্য ধরা না পড়লেও প্রতিফলিত অর্থের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের কারণে কবিতার তিনটি পর্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমন ধরনের রূপকের ব্যবহার পাওয়া যায় "কড়ি গুনতে গুনতে" কবিতাতেও। এখানে খেয়া নৌকার বারবার সরে যাওয়া আর অনিঃশেষ দিগন্তের দেখা না পাওয়ার মধ্য দিয়ে কবি তাঁর জীবনপটের ব্যর্থতার চিত্র আঁকার পাশাপাশি তৎকালীন মানুষের ক্রমাগত স্থানচ্যুত হওয়ার বিষয়টি সামনে এনেছেন 'নদী' আর 'নৌকা' রূপকের আবডালে। যেমন :

তুমি কেবলই দেখতে পাবে
নদীরা সরে সরে যায়
খেয়া নৌকা বার বার ছেড়ে ছেড়ে যায়
তোমাকে রেখেই
তুমি কেবল গুনতে গুনতে কড়ি।

("কড়ি গুনতে গুনতে", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

এ-কাব্যে আরো বেশ কয়েকটি কবিতায় রূপকের ব্যবহার পাওয়া যায়। এ ছাড়া রয়েছে প্রতীকের সার্থক ব্যবহারও। "বর্ষাবিষয়ক কবিতা: কায়সুল হককে" কবিতায় যেমন পাওয়া যায় 'বর্ষা' ও 'বর্ষাতী'র

Dhaka University Institutional Repository

অনুষঙ্গ। 'বর্ষা' ও 'বর্ষাতীর' প্রতীক নির্মিত হয়েছে দুটি কাব্যের দুটি কবিতায়। এই অনুষঙ্গটি অভাবনীয় সেতুবন্ধ রচনা করেছে, যার প্রতীকী অর্থ কালের বিচারে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ*-এর "রেণকোট" কবিতায় 'বর্ষাতী ছিলো স্বপ্নের প্রতীক আর বর্ষা ছিলো জীবনের দুর্যোগের—আর এখানে বর্ষা ও বর্ষাতী পেয়েছে নতুন মাত্রা—এই বর্ষাতী এখানে প্রতীক হ'য়ে উঠেছে জীবনের সুস্থতার, সুন্দরের, নিরাপত্তার, অধিকারের, সুখের ও স্বাচ্ছন্দ্যের।'[১৩] তিরিশ বছর আগের সেই কবিতায় কবি বলেছিলেন :

তবু বর্ষার দিনগুলি
একটি আক্ষেপ রেখে গেছে
জীবনের থমকে যাওয়া পদক্ষেপের প্রান্তে।
... ...
বর্ষণক্লান্ত বাইরের পানে তাকিয়ে
হঠাৎ এ কথা মনে হয়েছে:
একটা রেণকোট যদি থাকতো আমার!
("রেণকোট", *রাত্রিশেষ*)

"রেণকোট" কবিতায় প্রত্যাশিত বিষয়ে অপ্রাপ্তির আক্ষেপ ব্যক্ত হয়েছে। আর "বর্ষাবিষয়ক কবিতা: কায়সুল হককে" কবিতাটি পাঠান্তে যেন প্রথম কাব্যের ওই কবিতাটিরই ভিন্নমাত্রার সাক্ষাৎ মেলে। কেননা, আগের কবিতায় 'পঁচিশটি' 'বসন্তের' কথা বলা হয়েছে আর এখানে এসে কবি বোঝাতে চেয়েছেন, 'তিরিশ' বছর আগের সেই কথাটি কবি এখনো ভুলে যাননি—এমনকি কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকী শব্দটিকেও। প্রথম কাব্যের ত্রিশ বছর পর সেই অনুষঙ্গ কবিতায় উপস্থাপন করলেন প্রায় একই প্রতীকের মধ্য দিয়ে। এমন প্রতীক ব্যাবহারে আহসান হাবীব মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতীকের ব্যবহারটি খুব স্পষ্ট :

আমি একটি বর্ষাতীর প্রার্থনা জানিয়ে
তিরিশ বৎসর আগে যত্রতত্র আবেদনলিপি
পাঠিয়েছি। ডাকবিলি হয়েছে কি হয়নি জানি না
তবু উত্তরের আশায় এখনো বসে আছি
টলেনি বিশ্বাস।
("বর্ষাবিষয়ক কবিতা: কায়সুল হককে", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

এখানে বর্ষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'বর্ষাতী' শব্দটি এবং এই শব্দটি যেন আর শুধু স্বপ্নেই সীমায়িত নয়, জীবনের ইতিবাচক আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই কাব্যের কবিতাবলির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো বিদেশী শব্দের সাবলীল ব্যবহার। শুধু সাধারণ ব্যবহার নয়, কখনো কখনো সেসব শব্দ আবার প্রতীকী তাৎপর্যে বিশেষায়িত হয়ে ওঠে। আবার কখনো তা পাঠকের কাছে ধ্বনিময়তায় নতুন আবেদন সৃষ্টি করে। বিদেশী শব্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেসব কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে "মনীষা মনীষা বলে" একটি। 'নাইল', 'তৈমুর', 'বেঞ্চ', 'বাইজান্টাইন', 'নাপাম', 'পল্টন', 'হাইড পার্ক' প্রভৃতি শব্দ এখানে কবির প্রায়োগিক দক্ষতায় প্রতীকী তাৎপর্য অর্জন করেছে। এমন শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায় "আসামী বিষয়ক" কবিতাতেও লক্ষ করা যায়। ওই সময়ে সমাজে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক বিন্যাস গড়ে উঠেছিল, যাকে কবি সংজ্ঞায়িত করেছেন 'দুর্ভেদ্য দেয়াল' হিসেবে। খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে সমাজ-অভ্যন্তরের সামঞ্জস্যহীন চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন জাতির বিবেকের কাছে :

Dhaka University Institutional Repository

আপনি কি ভাবেন কিংবা এমন কি শুনেছেন কোনদিন
সুগন্ধী শিশির সজ্জা দশের সাবান আর
বাটের শেভিং ক্রিম শো-কেসে সাজিয়ে রেখে দেখে দেখে
চোখ জুড়ালেও দোকানীর পেট ভরে
ভেবেছেন কোনদিন এইসব মহানমহীম ক্রেতা কারা
কোথায় নিবাস এই বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত দরিদ্র দেশে
কারা সেই কালো দেয়ালের কারিগর কারা
নিত্য নব আয়োজনে নবনব কৌশলে ক্রমশঃ (sic)
এমন দুর্ভেদ্য করে গড়ে তোলে দেয়াল কেবল

("আসামী বিষয়ক", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

'কালো' শব্দটি আলোচ্য কবিতায় তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক হয়ে উঠেছে। এখানে 'কালো' ভালোর বিপরীত অর্থবহ শব্দ। সকল অশুভ, অকল্যাণকর, অন্ধকার জগৎ আর অমানবিকতার দিক উঠে এসেছে কালো শব্দ-প্রতীকের মধ্য দিয়ে। বস্তুত শ্রেণিবিভক্ত সমাজের নেতিবাচক দিককে 'কালো দেয়াল' বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন তিনি। ভাষা-বিন্যাসে গদ্যধর্মিতা আর সংলাপধর্মিতার গুণে কবিতাটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। সংলাপধর্মিতার জন্যেই মনে হয় সমাজ বিষয়ে অভিজ্ঞ একজনের মতো কবি ক্রমাগত বর্ণনা করেছেন 'ভূঁইফোড়' মানুষের হঠাৎ উচ্চবিত্ত হওয়ার পর বদলে যাওয়া চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য। কবিতার শরীর গঠনের প্রয়োজনের এ-কবিতায় কিছু বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি। শব্দগুলো বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। অন্তত কবি যে-সময়ে কবিতা লিখেছেন, সে-সময়ে নিত্যব্যবহার্য এইসব সামগ্রীর সঙ্গে খুব বেশি মানুষের পরিচয় থাকা সম্ভব ছিল না। তাই বুঝতে কষ্ট হয় না যে এ-সবের উল্লেখে তিনি সময়ের বিশেষ দিককে ইঙ্গিত করেছেন। শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে গর্দান, পফ্‌লিনের শার্ট, শপিং, বিনিথ্ ডিগনিটী, ড্রাইভার, শো-কেস, শেভিং ক্রিম প্রভৃতি অন্যতম। এ রকম আরেকটি কবিতা "উনিশ কি বিশ"। আরবি-ফারসি-ইংরেজি শব্দের সার্থক ব্যবহারই এ-কবিতাকে বিশেষত্ব দান করেছে। ব্যবহৃত আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে কামিন, হয়রান, হেকিম, নিয়ামত, শুঁকরিয়া, হাজির, সওয়াল, নাজির, আল্লাহ, কুদ্‌রত, স্টেডিয়াম, ব্লেডের বাক্স, প্লাস্টিক, নাজেহাল প্রভৃতি। এসব শব্দের প্রয়োগনৈপুণ্যে 'নিয়ামত মল্লিকের ছোট' ছেলের উপাখ্যানটিতে কবি শ্লেষ আর বিদ্রূপের বাণ ছুড়েছেন। ফলে কবির বক্তব্য রূপকাশ্রিত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

মা হেসে হলেন খুন, বল্লেন আমাকে, তবে আয়,
আয় দেখি টেঁকিশালে—এ আবার কি সওয়াল, হায়!
বসে থাক পাশে এসে, চেয়ে দেখ ধান আর চাল,—
'কত ধানে কত চাল' এও প্রশ্ন, হায়রে কপাল!
টেঁকির খবর নিতে তোরা যাস বিলেতে; এদিকে
মা রয়েছে টেঁকিশালে আজীবন, কখনো সেদিকে
ফেরে তোদের মন।

("উনিশ কি বিশ", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

আহসান হাবীবের প্রকৃতি-প্রেমের অনবদ্য একটি কবিতা "দোহাই তোমার"। প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এ- কবিতাটিতে প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। কবি বলতে চেয়েছেন বৃক্ষ যেমন বিশ্বপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, তেমনি মানুষ প্রকৃতির আনকূল্য পেয়ে টিকে আছে পৃথিবীতে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচীন কাল থেকে প্রকৃতি ও জীবের ভারসাম্য রক্ষার মধ্য দিয়েই মানব-অস্তিত্বের নানা দিক ও সভ্যতা ক্রমবিকাশমান। তাই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে স্বাগত জানিয়েও প্রকৃতির প্রতি মানুষের ইতিবাচক আচরণই কবির কাম্য। কেননা, মানুষের সৃষ্টি ও আবিষ্কার যেমন সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ, তেমনি প্রকৃতিও মানুষের জন্য আশ্রয়স্বরূপ। মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের সহযাত্রী প্রকৃতি যখন 'নির্মম কুঠার' দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন কবি ব্যথিত হয়ে শরণার্থী হন গ্রিক-পুরাণের। বৃক্ষ-হন্তারকের উদ্দেশে কবি গ্রিক পুরাণের মিডাসের করুণ পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেন।

একাত্তর-পরবর্তী কাব্য হলেও *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*তে মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক। উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো "নির্ভুল সংলাপে", "সার্চ" ও "স্বাধীনতা"। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতা তিনটিতে দু-তিনটি উপমা ছাড়া অলংকারের আধিক্য নেই। একজন কিশোরের রূপকে স্বাধীনতার চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে "সার্চ" কবিতায়। স্বাধীনতাকামী বাঙালির বীরত্ব আর মহত্তম আত্মত্যাগের ইতিহাস এই কিশোর-চরিত্রে দৃঢ়তা দিয়ে কবি তুলে ধরেছেন। কিশোর যেমন 'বুকের গভীরে মহত্তম সেই অস্ত্র' নিয়ে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এগিয়ে যায়, তেমনি সব বাঙালিকেও মোকাবিলা করতে হয়েছিল বিরূপ পরিস্থিতি। কবি সেই কিশোরকে রূপায়িত করেন এভাবে :

সেই দেবশ্রী কিশোর
রাখেনি তেমন কোনো অস্ত্র সঙ্গে। তার
বুকের গভীরে
মহত্তম সেই অস্ত্র যার
দানবের স্পর্শযোগ্য অবয়ব নেই কোনো
ধ্বনি যার অহরহ প্রাণে তার বাজায় দুন্দুভি:
স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা!

("সার্চ", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

কবিতাটির নামকরণ যেমন হয়েছে ইংরেজি শব্দ দিয়ে, তেমনি আরো কিছু বিদেশি শব্দের সার্থক ব্যবহার এ-কবিতায় লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে 'হল্ট' শব্দটির ব্যবহার একই সঙ্গে প্রতীকী, চিত্রকল্পাশ্রিত ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছাড়া রয়েছে 'প্যান্টের পকেট', 'জরীপ', 'বোমা', 'সাচ্ সাচ্ বাতাও', 'শার্ট', 'নেহিত' প্রভৃতি উপদ্রুত দেশকালের গভীর থেকে উঠে আসা শব্দের সফল ব্যবহার। এসব শব্দ ব্যবহারের ফলে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার-নিপীড়ন-হয়রানির চিত্র সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আবার 'ঘুমের মত থির মত্ততায়' 'মনোহর শব্দমালা'য় তিনি নির্মাণ করেন "স্বাধীনতা" কবিতাটি। কবি শুধু নিজের অস্তিত্বে প্রকৃতি রঙে রঙিন করে পেতে চান স্বাধীনতার সৌরভকে। অসামান্য চিত্রকল্প সৃজন করে তাই তিনি বলতে পারেন, 'দেখি জানালায় ঝুলে আছে নীলাকাশ' ("স্বাধীনতা", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)।

বিষয়ের জটিল ও ইঙ্গিতবহ রূপবন্ধনে মনোজ্ঞ কারুকাজে শব্দই শিল্পীর প্রথম হাতিয়ার। কেননা শব্দ এবং শব্দের পর শব্দ বিশেষ অর্থে ও মুক্তি পায় কবির হাতে। কবি কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সেই অখণ্ড আবেগ টুকরো টুকরো অনুভূতি ও চেতনার বন্ধনে শিল্পরূপ দেন কবিতার। অনেক হতাশার পরও জীবনের প্রতি আহসান হাবীবের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শিল্পিত হয়েছে প্রাকরণিক নিষ্ঠায়।

Dhaka University Institutional Repository

স্মৃতিমুখর জীবনশিল্প : *প্রেমের কবিতা*

আহসান হাবীবের কাব্যগুলোর মধ্যে একেবারেই ভিন্ন স্বাদের কবিতাবলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে *প্রেমের কবিতা* গ্রন্থে। তাঁর কাব্যচর্চার ইতিহাস মূলত মাটি ও মানুষকে ঘিরেই। সমাজ-সভ্যতা আর ইতিহাস-ঐতিহ্যের অগ্রযাত্রা, পৌরাণিক প্রসঙ্গ—সবই তিনি আস্থার মুঠোতে বন্দি করে কবিতার আধারকে সমৃদ্ধ করেছেন। ভাবনাকে বিষয় আর বিষয়কে শব্দের সুমিত বিন্যাসে উপস্থাপন করা আহসান হাবীবের কবিস্বভাবের উল্লেখযোগ্য দিক। ফলে, প্রেম ও প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ, সময় ও সভ্যতার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী হিসেবে কবি তাঁর কবিতাকে সর্বজনীন করে তুলেছেন। সেই সর্বজনীনতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় *প্রেমের কবিতার* উৎসর্গপত্রে। গদ্যে সাজানো উৎসর্গপত্রের প্রতিটি বাক্যেই রয়েছে কবিতার স্বাদ। ব্যক্তিগত সম্পর্কের কেউই তাঁর কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সবাই তাঁর 'স্মৃতির পাতায় অমলিন'। পাঠকের কাছে কৈফিয়তের মতো করেই সেসব কথা বলেছেন তিনি। কবি হিসেবে এভাবেই তিনি সততার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ উৎসর্গপত্রের চরিত্রগুলো হয়ত অবাস্তব নয়।

প্রেমের কবিতার কবিতাবলির বিশেষত্ব হচ্ছে, এখানে বিষয়ের বৈচিত্র্যের চেয়ে প্রকরণগত বৈচিত্র্যই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বেশির ভাগ কবিতাই প্রায় সমগোত্রীয় বিষয় নিয়ে সৃজিত হলেও প্রকাশ-কৌশলে রয়েছে এর ভিন্নতা। 'দীপ্রদুপুর/রক্তিম বিকেল' আর 'তারো আগে/প্রথম প্রহর' নামে দুই ভাগে বিভক্ত কবিতাগ্রন্থটির কবিতায় প্রকাশ ও কৌশলে রয়েছে স্বকীয়তা। এই কাব্যে প্রতিফলিত এই স্বকীয়তার জন্য বিষয়ের চেয়ে প্রাকরণিক দিক দিয়ে প্রতিটি কবিতাই হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র গুণমান সম্পন্ন। কারণ কবিমনে স্থান পাওয়া সব নারীই সম্ভবত কোনো না কোনোভাবে তাঁর চেনাজানা। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে এ-কাব্যেই প্রথম কবি অধিক সংখ্যায় 'উত্তমপুরুষের' জবানি ব্যবহার করেছেন। প্রথম কবিতায় তিনি বলেন:

আমি তাকে আসতে বলিনি
আমার কোনো অপেক্ষা বা উদ্বেগ ছিলো না।
আমি তাকে আসতে বলিনি
সে এসে আমার কাঁধ ছুঁয়ে বসলো।
আমি তাকে বাধা দিইনি
তার অলৌকিক করতল আমার বুকের ওপর ন্যস্ত হলো।
("ভালোবাসা নাম", *প্রেমের কবিতা*)

উত্তমপুরুষের ব্যবহারে পৌনঃপুনিকতা থাকলেও কবি মাঝেমধ্যে একই কবিতায় কখনো ভাববাচ্যের স্বগতোক্তিতে, কখনো মধ্যমপুরুষে, কখনো-বা উত্তমপুরুষে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এমন একটি কবিতা "কে কেমন আছে"। দৃষ্টান্তটি এমন :

স্বগতোক্তি

কেউ জানে না পৃথিবীর কোথায় কখন
কি রকম দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কে কখন বালকস্বভাবে
জ্বলন্ত পেরেক একটি তুলে নিয়ে অর্বাচীন আবেগে
নিজের বুকে বিঁধিয়ে গোলাপ গোলাপ বলে নৃত্য করে
দু-একবার তারপর থেমে যায়, তারপর জ্বলতে থাকে!
("কে কেমন আছে", *প্রেমের কবিতা*)

মধ্যমপুরুষ

তোমাদের কারো কারো ঈর্ষা আছে কারো কারো আনন্দ।
তোমরা বলো বেশ আছে তোমরা বলো আহা কি সহজ
স্বচ্ছন্দ জীবন।
("কে কেমন আছে", *প্রেমের কবিতা*)

Dhaka University Institutional Repository

উত্তমপুরুষ

সারা বুকে অনবরতই অগ্নিকাণ্ড ঘটাচ্ছে অথবা
নিরূপায় আমিই কি বন্দী হয়ে আছি তার মোহন আগুনে!

("কে কেমন আছে", *প্রেমের কবিতা*)

এ-কাব্যে আহসান হাবীব নানা উপকরণ ব্যবহার করে নিজেকে নতুনভাবে চিনিয়েছেন এবং কিছু কিছু শৈলী একই সঙ্গে প্রথম ও শেষবারের মতো ব্যবহার করেছেন। যেমন : প্রথমত, প্রেমের কবিতার লেখক হিসেবে আহসান হাবীব নিজেকে নতুন করে উন্মোচন করেছেন। দ্বিতীয়ত, এ-কাব্যের সুবাদেই বাংলা কবিতার পাঠক নতুন ধরনের উৎসর্গপত্র দেখেছেন, যা আজ অবধি বিরল দৃষ্টান্ত। যদিও ওই ফর্মে বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার অনেক কবি কবিতা চর্চা করছেন। তবু বলতে হয়, ফর্ম হিসেবে ওই সময়ে তা ছিল নতুন ও সম্ভাবনাময়। এই প্রবণতাকে একধরনের নিরীক্ষা বললে অত্যুক্তি হয় না। এই নিরীক্ষাপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ "দোতলার ল্যান্ডিং মুখোমুখি ফ্ল্যাট/একজন সিঁড়িতে, একজন দরজায়" কবিতাটি। বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া যুবক-যুবতীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কবি একটি অস্ফুট প্রেমের চিত্র তুলে ধরেছেন কবিতাটিতে। চলচ্চিত্রের উপাদানে সমৃদ্ধ এই কবিতাটি শুধু পাঠকপ্রিয় নয়, আবৃত্তি-মাধ্যমেও বেশ শ্রোতাপ্রিয়তা পেয়েছে। আহসান হাবীবের হাত ধরেই এই ফর্মটি বাংলা কবিতায় প্রবেশ করে বললেও অত্যুক্তি হবে না। পরবর্তী সময়ে পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩৩-১৯৯২) এই ফর্মে কবিতা লিখে তুমুল পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেন। তবে তিনি আহসান হাবীবের ফর্ম থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কেননা, গত শতকের সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কবিতা অধুনাবিলুপ্ত 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশের পরপরই এটি তরুণ কবিতাপাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরও (১৯৩৪-২০১২) রয়েছে এ-রকম বেশ কয়েকটি কবিতা, যেগুলোর প্রতিটিই পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে আহসান হাবীব তাঁর আর কোনো কবিতায় এই শৈলীটি ব্যবহার করেননি। কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :

: ফিজিক্স-এ অনার্স।
: কি আশ্চর্য। আপনি কেন ছাড়লেন হঠাৎ?
: মা চান না। মানে ছেলেদের সঙ্গে বসে...
: সে যাক গে, পা সেরেছে?
: কি করে জানলেন?
: এই আর কি? সেরে গেছে?
: ও কিছু না, প্যাসেজটা পিছলে ছিলো মানে...
: সত্যি নয়। উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে...
... ...
: যাই। আপনি সন্ধে বেলা ওভাবে কখনো পড়বেন না, চোখ যাবে, যাই।
: হলুদ শার্টের মাঝখানে বোতাম নেই, লাগিয়ে নেবেন, যাই।
: যান, আপনার মা আসছেন। মা ডাকছেন, যাই।

("দোতলার ল্যান্ডিং মুখোমুখি ফ্ল্যাট/একজন সিঁড়িতে, একজন দরজায়", *প্রেমের কবিতা*)

আহসান হাবীবের অন্য অনেক কবিতার মতো "নীল খাম" কবিতাটিতে রয়েছে একটি গল্প। কবিতায় রূপকথার আদলে 'রাজকুমার' 'রাজপুরীর সিংহদ্বার ভেঙে' 'রাজকন্যে'কে 'জয়' করে নেওয়ার যে আখ্যানটি স্থান পেয়েছে, তা খানিকটা উপর্যুক্ত কবিতার সাদৃশ্যে রচিত হলেও প্রাকরণিক দিক থেকে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

জন্য নতুনত্বের স্মারক। এর বিশেষত্ব হচ্ছে, কবি এ-কবিতায় নিরেট গদ্য-ঢঙ আর মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বেশ কিছু পঙ্‌ক্তি নির্মাণ করেছেন একই সঙ্গে। এই দুই ছন্দে বিন্যস্ত এই কবিতাটিতে মাঝেমধ্যে রয়েছে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের নাটকীয় সংলাপপ্রয়াস। আর পুরো বক্তব্যটি উপস্থাপিত হয়েছে উত্তমপুরুষে। কবিতাটির নায়ক যেন স্বপ্নপুরীর নায়ক নয়, বাস্তবের ধূলি-ধূসরিত কালো পীচের রাস্তায় সে হেঁটে আসে, অশ্বারোহণে নয়। নায়কের শুভ আগমন ঘটবে জেনে নায়িকাও সেজেছে লাল রঙ শাড়ি পরে। তারপর স্বপ্নে বিস্তৃত সময় বয়ে গেলে নায়িকা তার মালা নায়ককে উপহার দেয়। এর পর প্রমুগ্ধ মিলন। বিদায়ের আগে নায়িকার দেওয়া মালাটি তার বুকে জড়িয়ে দিয়ে নায়ক তাকে একটি চিঠি লেখার মিনতি জানায়। এক অভূতপূর্ব স্বস্তিকর সোনালি দিনে চিঠি আসে নায়িকার। ওই চিঠির শেষ বাক্যটি সমস্ত স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দেয়—চিঠির সাদা কাগজের মতোই সবকিছু তখন অর্থহীন মনে হয়। এই দীর্ঘ কবিতায় সংলাপপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে মূলত প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কের বেশ কয়েকটি অবস্থার কথা বর্ণিল করে উপস্থাপন করেছেন কবি। দীর্ঘ এ-কবিতায় কবি যা কিছু প্রকাশ করেছেন, তা যে কোনো প্রেমিক-হৃদয়ের জন্য প্রাপ্তির এবং শঙ্কা উদ্রেককারী পরিস্থিতি। গদ্যময় জীবনের মতো বর্ণনার আধিক্য এবং অনুভবের তারতম্য অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিও রয়েছে এ-কবিতায়। এ ছাড়া চমৎকার কিছু উপমার ব্যবহারে কবিতাটি শিল্পস্বাদে পূর্ণতা পেয়েছে। যেমন:

উপমা :

বিবাগী চাঁপার গন্ধের মতো মনের সুরভী
আমার মনে রইলো লেগে,
জেগে রইলো তোমার মিনতি-ভরা চোখ
আমার মনের গোপন গহনে।
... ...
বলতে বলতে কণ্ঠ তোমার ভারী হয়ে এলো—
উপলাহত তরঙ্গের মতো
তোমার কথার তরঙ্গ হঠাৎ গেল থেমে।
একটি পরিপূর্ণ মিনতির মতো তুমি বসে রইলে।

("নীল খাম", *প্রেমের কবিতা*)

উত্তম ও মধ্যম পুরুষ :

তোমার কণ্ঠে এলো কথার ঝড়
বললে, 'এ মালা তোমার।'
আমি বললাম,—
আমি যে তোমায় ভালোবাসতাম সে কথা কি তুমি জানতে,
... ...
তুমি বললে, জানতাম।

("নীল খাম", *প্রেমের কবিতা*)

এই কাব্যে আহসান হাবীব প্রেমের স্বরূপ গাঁথতে স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পাশাপাশি গদ্যভঙ্গিরও সহায়তা নিয়েছেন। অন্ত্যমিল কিংবা প্রচলিত ছন্দের কাঠামোয় বন্দি করার চেয়ে গদ্যেই প্রেমের চূড়ান্ত উৎকর্ষ খুঁজেছেন তিনি। অধিকাংশ কবিতা কবি গদ্যের ঢঙে কাব্যময় করে গড়ে তুলেছেন। পাশাপাশি প্রেমের চিরন্তন রূপ—বিরহ, ভালোবাসা, ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের বেদনা-বিলাপও এ-কাব্যে অপরূপ শিল্পভাষ্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমানের 'গণ্যমান্য' আচ্ছাদনে থাকা শুভানুধ্যায়ীরা কৈশোরে কে কখন

Dhaka University Institutional Repository
কোথায়, কাকে অনুরাগের ভাষায় ভালোবাসা নিবেদন করে কষ্ট পেয়েছিল, সেই স্মৃতি আজও তাজা রয়ে গেছে কবিতার নায়কের অন্তরের গভীরে "কে কেমন আছে" কবিতায়। তখন কবির বেদনার সঙ্গে, নায়কের তথা 'প্রেমের আগুনে' পা-দেওয়া সবাইকে একাত্ম হয়ে যেতে হয়। তাঁর 'মোহন' শব্দমালায় বেদনার শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে এ-কাব্যের অধিকাংশ পঙ্‌ক্তিতে।

এই কবিতাগ্রন্থের শুরুর দিকের আরেকটি কবিতার নাম "পরিস্থিতি"। অবস্থা কতটা বেগতিক হলে একটি প্রেমিক হৃদয়ের 'পরিস্থিতি' এতটা খারাপ হতে পারে, তা বোঝার জন্য এই কবিতার পাঠই যথেষ্ট। প্রেমিক-পুরুষটি না-হয় খাবার ফেলে সব অখাদ্যকে মনে মনে খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু কবির বৈচিত্র্যময় শব্দবিন্যাসে তার তাৎপর্য বেড়ে গেছে অনেক গুণ। প্রেয়সীর 'বাঁকানো চিবুক', 'আধখোলা পিঠ', 'নত কাঁধ', 'গভীর চোখের তারা', তার ব্যবহার্য 'ক্ষিপ্রগতি মসৃণ ভ্যানিটি ব্যাগ', 'লাল টিপ', 'খড়ের বেগুনি চটি' প্রভৃতি মনের চোখ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য হিসেবে গ্রহণ করার পর কবির কল্পিত নায়কের বাহ্যিক অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বাছাইকৃত কিছু শব্দচিত্রের আলোকে। বিষয়টি স্পষ্ট হয় যখন কবি তাঁর সৃষ্ট প্রেমিকসত্তার বরাতে বলেন :

গভীর চোখের তারা
ক্ষিপ্রগতি
মসৃণ ভ্যানিট
শাড়ির সমস্ত নীল খেতে-খেতে
সমস্ত আঁধার!

("পরিস্থিতি", *প্রেমের কবিতা*)

সঠিক শব্দপ্রয়োগে কবিতা যেমন অনন্য হয়ে উঠতে পারে, তেমনি ভাব ও বিষয়ের অনুষঙ্গী শব্দের ব্যবহার না হলে কবিতা দূরান্বয়ী হয়ে উঠতে পারে। আহসান হাবীবের কবিতার পঙ্‌ক্তি মাঝেমধ্যে শুধু প্রাসঙ্গিক শব্দাবলি ব্যবহারের গুণেই শিল্পিত হয়ে ওঠে। উপর্যুক্ত কবিতার মতো আরেকটি কবিতা "ডিসেম্বর ১৯৭৭"। স্ত্রীর হাসপাতালে অবস্থানের কারণে তাঁর প্রতি কবির যে ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে, তাতে বিরহের ব্যাকুলতা মিলে উদ্বেগ-আশঙ্কাসহ যেন পূর্ণ শব্দপ্রতিমা নির্মিত হয়েছে। একেবারে গদ্যপ্রাণ শব্দও এখানে কাব্যময়তা লাভ করেছে। কবিতার সঙ্গে একাত্ম হওয়া সেসব শব্দের মধ্যে রয়েছে 'থার্মোমিটার', 'রক্তচাপের পরীক্ষা', 'অক্সিজেন', 'বদরাগী', 'স্যালাইন', 'মফস্বলের হোটেল কক্ষে', প্রভৃতি। কবির ভাষায় :

এখন বুঝি এ রাতে শেষবারের মত
তোমার রক্তচাপের পরীক্ষা হলো
জিভের নীচে থার্মোমিটার লাগিয়ে
তোমার কব্জি ধরে বদরাগী সেই নার্সটি হয়ত দাঁড়িয়ে আছে,
অক্সিজেন কি এখনো চলছে?
স্যালাইন?
আমরা এ রকম পৃথক এর আগে আর কখনো থাকিনি।

("ডিসেম্বর ১৯৭৭", *প্রেমের কবিতা*)

কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তিতে যা বলা হয়েছে, তাতে বিরহকাতর এক চিরন্তন প্রেমিক-হৃদয়ের হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে। শৈল্পিক শব্দ ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ততায় ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি সর্বজনীন করে গড়ার ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। এ-গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতা শুরু হয়েছে "প্রেমের কবিতা"

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে। একটি নামই যে কাব্যপ্রতিমার সর্ব গুণে গুণান্বিত হতে পারে, তার অনন্য দৃষ্টান্ত 'সুকন্যা' নামটি। নামটিকে শুধু শব্দ হিসেবে গণ্য করলে যে অর্থ দাঁড়ায়, এর তাৎপর্য বহু গুণে বেড়ে গেছে কবিতায় তার শৈল্পিক ব্যবহারে। কবিহৃদয়ের সমস্ত আবেগ-অনুভূতির উৎস এই 'সুকন্যা'। 'সুকন্যা' একটি নাম, আবার কোনো নামই নয়, কেউ নয় তবু এই শব্দপ্রতিমায় উঠে এসেছে পৃথিবীর সমস্ত প্রেমিক-হৃদয়ের কাঙ্ক্ষিত নারী। কবির কবিতা আর প্রেয়সী যেন একাকার হয়ে গেছে ওই 'সুকন্যা'র কাল্পনিক অস্তিত্বের মধ্যে। নামটিকে কবির মানস-কন্যা বললে ভুল হবে না। তবে নামটি শুধু একজনের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যে সীমায়িত নয়। জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন', 'শেফালিকা বোস', 'সুরঞ্জনা' প্রভৃতি নামের মতো পৃথক পৃথক অস্তিত্বের অধিকারী নয় 'সুকন্যা'। বরং বলা যায়, অনেক অস্তিত্বের সমাহারে একজন 'কমন' প্রেয়সীর নাম এটি। কাম-বাসনা কিংবা কবিতার প্রতিমূর্তি—সবই ওই 'সুকন্যা' নামের উচ্চারণের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। কবিতাটি আরেকটি কারণে বিশেষত্ব অর্জন করেছে, তা হলো পঙ্‌ক্তিতে মাঝেমধ্যে অন্ত্যমিলের ব্যবহার। কবিতার এমন পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসও প্রকাশনৈপুণ্যের কারণে সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো :

কোথাও সুকন্যা নামে কোনো মেয়ে আছে কিনা আছে
জানা নেই
তবু নিত্য হৃদয়ের একেবারে কাছে
সুকন্যা নামের মেয়ে দেখা দেয়।
আর দেখা যায়
সে মেয়ে তোমার মতো কথা কয় অপূর্ব ভাষায়।
... ...
এ নামে তোমার চিত্ত সাড়া দেয় বাসনার মতো
এ নামে তোমাকে দেখি বসন্তের কবিতার মতো।

("প্রেমের কবিতা", *প্রেমের কবিতা*)

অসাধারণ কাব্যপ্রতিমায় 'সুকন্যা' নামটিতে তিনি উৎপ্রেক্ষা ও সমাসোক্তির চমৎকার মিলন ঘটিয়েছেন 'যেন কোনো নামের বলাকা' বলে। আসলে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা না মেশালে বাস্তবের নারীটি অনন্য মহিমময়ী হয়ে উঠতে পারে না। মনে হয়, সে-কারণেই কবির এই প্রয়াস। অন্ত্যমিলের পাশাপাশি ধ্বনির পর ধ্বনির বিন্যাস ঘটিয়ে কবি শিল্পসৌন্দর্যের আবেশ সৃষ্টি করে গেছেন *প্রেমের কবিতায়*। তবে প্রকাশকৌশল ও ভাষার বিন্যাসে ঔজস্বীতায় আহসান হাবীব এখানেও স্বকীয় কণ্ঠের অধিকারী।

নাড়ীর টান ও শেষ বিকেলের গান : *দু'হাতে দুই আদিম পাথর-বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*

কবি আহসান হাবীব তাঁর মনোলোকে দেশজ ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে মিলিয়েছেন *দু'হাতে দুই আদিম পাথর কাব্য* রচনার মধ্য দিয়ে। এই কাব্যের কবিতার শরীর নির্মাণে চিত্রকল্প, উপমা, ছন্দ ব্যবহারে তাঁর নতুনত্ব লক্ষণীয়। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ থেকে *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* বক্তব্য ও আবেদনে অনেক বেশি তীব্র ও জোরালো। তাঁর পরিপার্শ্ব, যুগচেতনা এবং কবিকৃতির স্বরূপটি এই গ্রন্থে অনেক বেশি পুষ্ট এবং জীবনজিজ্ঞাসা উজ্জ্বলতর। এই কাব্যের মধ্যে যে আহসান হাবীবকে পাওয়া যায়, তিনি অভিন্ন নন, নবরূপায়িত। তিনি কতটা সফল তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের চেয়ে কিংবা কতটা অনুসরণীয় হয়ে থাকবেন উত্তরসূরিদের হৃদয়ে সে-ভার মহাকালের। 'তবে উত্তরাধিকারের সহজ ও স্পর্ধায় আমরা বলতে চাই 'ফোর্ কোয়ার্টেট্স'-এর এলিয়ট, 'ক্যান্টোস'-এর পাউন্ড, 'ডুয়িনো এলিজি'-এর রিল্‌কে আর 'বনলতা

Dhaka University Institutional Repository

সেন'-এর জীবনানন্দের মতোই যেন 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর'-এর আহসান হাবীব। শ্রমে-অনুধ্যানে-মেধায়-মননে প্রকাশভঙ্গিতে—বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে-সুসংহতিতে আর শিল্পপ্রতিমা-নির্মাণে, দর্শনের সূক্ষ্মতায়, শব্দ-কুশলতায়, সাংকেতিকতায়—বিস্তৃতি আর পরিপ্রেক্ষিত-রচনায়, সংকল্প-বিশ্বাসের ঋজুতা ও দৃঢ়তায়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রয়োগ-অসাধারণত্বে..., সমাজ-সময়-মানুষ প্রভৃতির সমাবেশের তাৎপর্যময়তায়, উপমা-প্রতীক-চিত্রকল্পের সুচারু বিন্যাসে, মহত্তম সত্যের বিশুদ্ধ উচ্চারণে, কবিত্বের আবেগী অহংকারে, আত্মপরিচয়-প্রদান আর আত্ম-আবিষ্কারের বিস্ময়কর কল্লোলে তিনি মুখর করে দিয়েছেন বাংলা কবিতার নিস্পন্দ প্রাঙ্গনকে।'[১৪] সভ্যতার উষালগ্ন থেকে মানুষের মধ্যে সুন্দর ও কল্যাণের সাধনা, উদ্ভাবনের নেশা, আত্মানুসন্ধানের যে প্রচেষ্টা বিরাজমান ছিল, তা আজো অব্যাহত রয়েছে। মানব-সভ্যতার অব্যাহত ক্রমবিকাশের মধ্যে সমাজ ও সভ্যতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে গিয়েই ঐতিহ্য ও মৃত্তিকা-সংলগ্ন কবি আহসান হাবীব তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছেন *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*। 'সভ্যতার সুচনালগ্নে পাথরে পাথর ঘষে মানুষ একদা আগুন আবিষ্কার করেছিলো যে-উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে, মানুষের সেই অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির কথা কবি মনে রেখেছিলেন কাব্যের নামকরণ প্রসঙ্গে। মানুষের দুটি 'হাত' এবং 'আদিম পাথর' এখানে প্রতীকী তাৎপর্যে সমুজ্জ্বল।'[১৫]

মানব-অস্তিত্বের উৎস সন্ধানে কবি যেমন মানুষকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন মাটির কাছাকাছি, তেমনি কবি নিজেও যেতে চেয়েছেন শেকড়ের সন্নিকটে। জীবন চলার পথে যত প্রতিকূলতাই থাকুক না কেন, মাটিতে আত্মসমর্পণ ছাড়া বিকল্প নেই। তাই এ-কাব্যের প্রথম কবিতাতেই তিনি মাটির সান্নিধ্যে থেকে ভালো লাগার অনুভূতি ব্যক্ত করেন :

কেউ বলে তুই দু'চোখ মেলে পদ্মপত্রে দেখলিনে জল,
এই যে এত বৃষ্টিপতন রক্তক্ষরণ তবু অটল
রইলি বসে, দেখলিনে এই ধুলোর মধ্যে বাসা রোগের,
জানলিনে এই সারাটা দিন ধুলোর সঙ্গ কি দুর্ভোগের।
কেউ বলে অরণ্যচারী পশুর চোখেই শুদ্ধ আলো
আমার কিন্তু ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে যাওয়াই লাগছে ভালো।

("সারা দিন আমি", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

মত-ভিন্নমত, পক্ষ-বিপক্ষ কিংবা অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা জীবনেরই অংশ। প্রতিকূলতা যেহেতু জীবন-বিধানের অন্যতম অংশ, সেহেতু তাকে অস্বীকার করা কিংবা তা থেকে পলায়নপর-ভাবনা মূলত জীবনকে অস্বীকার করারই নামান্তর। এ-কাব্যে আহসান হাবীব যেমন বিশ্বসভ্যতার জয়গানে মুখর, ঠিক তেমনি দার্শনিকের মতো বিচক্ষণ। জীবন-ভাবনার প্রসঙ্গে এ-কাব্যের কবিতাবলিতে কবি দার্শনিকতাকে সহজবোধ্য ও নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই তাঁর কবিতা বস্তুবাদী দর্শনে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। একদিকে স্বল্প-অবয়বের কবিতাবলি, অন্যদিকে সেসবের শরীরে প্রতিফলিত নানা ব্যঞ্জনায় *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। "আবহমান", "সময় অসময়", "সারস", "ট্রেন" প্রভৃতি কবিতায় মানুষের চিরন্তন আবেগ-অনুভূতি ও কবির অন্তর্দৃষ্টির প্রবহমান প্রকাশ ঘটেছে অত্যন্ত সাবলীলভাবে। যেমন : "আবহমান" কবিতায় আবহমান বাংলার অত্যন্ত পরিচিত চরিত্র খালিক নিকিরির স্বপ্ন ও জীবনচারিত্র্য আঁকতে গিয়ে কবি শরণাপন্ন হয়েছেন ত্রিশের প্রধান কবিদের একজন জীবনানন্দ দাশের। বিশেষ করে 'দাশকবির ঘুঘুর' অনুষঙ্গ প্রকাশ করতে গিয়ে কবি আহসান হাবীব শব্দ-নির্বাচন ও চরণবিন্যাসে জীবনানন্দের কাব্যরীতিও অনুসরণ করেছেন। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্ন আরো গভীর হ'য়ে যায় চাঁদ এবং নক্ষত্রের ভেজা গায়ে।
রাত বাড়তে থাকে।

বাড়িতে ছনের চালায় শিশির নামে কাঁঠালপাতায় গা বেয়ে
দাশকবির ঘুঘুর হঠাৎ দু' একবার ডানা ঝাড়ে
খালেক নিকিরির স্বপ্ন তবু পাশ ফিরে শোয় না একবারও
পোহাতী তারার দিকে চোখ রাখে দু'একবার

... ...

ঘুঘু কাঁঠালপাতা নিম কিংবা নিশিন্দা
এরকম কোনো স্বপ্ন
আপাতত খালেক নিকিরির নেই
না-ঘুমে না-জাগরণে।

("আবহমান", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

"সারস" কবিতায় কবির জীবনবৃত্ত-সংলগ্ন সময় প্রতিনিয়ত বহন করে গুরুত্বপূর্ণ কোনো মুহূর্ত। তাই অনাগতকালের দিকে বয়ে চলা মহাকালে কোনো মুহূর্তই জীবন থেকে পরিত্যাজ্য হতে পারে না। এ-কবিতায় জীবনের চলমানতার প্রসঙ্গ উপস্থাপনের পাশাপাশি ভিন্ন দৃষ্টিতে সময়ের ভয়াল প্রতিমাও নির্মিত হয়েছে। যেমন :

বহমানতার কোনো চিহ্ন তোর শরীরে তোলে না
কোনো কম্পন অথবা শব্দ, তুই
ভালোবাসা স্বপ্ন সুখ
সুখের সমস্ত ভাবনা
পেছনে রাখিস, সারা
শরীরে রাখিস ধরে সময়ের ভয়াল প্রতিমা।
প্রাচীন সন্তের মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে তুই
যেন অবিশ্রাম
রাখিস অদৃশ্য হাত সময়ের বিপুল ঘণ্টায়,...

("সারস", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

মানুষ অনন্তকাল ধরে যেসব স্বপ্ন, প্রেম, সুখচিন্তার কথা ভাবে, সেসবের চেয়ে সময়ের গতিই যেন কবিকে আকর্ষণ করে বেশি। "ট্রেন" কবিতাতেও ট্রেনের প্রতীকে জীবনের গতিময়তা আর বহমানতা প্রকাশ পেয়েছে। মূলত *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যে কবির সৃষ্টিচৈতন্য সমষ্টির ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে অনেকাংশে। তবে এ-কাব্যের বেশির ভাগ কবিতাই প্রতীকী তাৎপর্যে সমৃদ্ধ। কাব্যটি যে বিবেচনায় 'স্ফটিক-সংহত', তা পরিদৃষ্ট হয় তার অন্তর্গত বয়ন আর বৈশিষ্ট্যের অবয়বে, যার ব্যঞ্জনা সৃষ্টিপ্রক্রিয়াতেই নিহিত। কবির চৈতন্য-প্রকাশক মর্মবাণী প্রকাশের প্রক্রিয়া ঋদ্ধ হয়েছে মূলত প্রতীক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। সমাজ-অভ্যন্তরের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা, এখানকার ক্ষত-যন্ত্রণার রূপায়ণ দেখা যায় কবিতার নামকরণেও। যেমন,"হায় নীল পাখির প্রতিমা" কবিতায় 'নীল' শব্দটি প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

হায় নীল পাখির প্রতিমা, পাখি
অথবা পাখির স্বপ্ন
তোমার বুকের
আগুনে যে রাখে হাত

Dhaka University Institutional Repository

তুমি নিত্য তাকেই পোড়াও, তুমি
কি দুঃখে পোড়াও কাকে ভেবেও দেখো না,...
("হায় নীল পাখির প্রতিমা", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

আহসান হাবীবের মৃত্তিকা-সংলগ্নতার বড় উদাহরণ এবং আপন অস্তিত্বের অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে এ-কাব্যের "ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে" কবিতায়। নাগরিক জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার বিপরীতে গ্রামীণ জীবনের প্রাণ-প্রাচুর্যের সমর্থনের পক্ষপাতী কবি। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদী-বিধৌত এলাকায় প্রোথিত কবির অস্তিত্বের শেকড়। প্রকৃতির নিবিড় বন্ধন তাঁকে কবি হিসেবে গড়ে তুলেছিল শৈশবেই। তাই কবি গ্রামজীবনের প্রাণমুখরতাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে সমর্থন করেছেন। তবে এ-কবিতায় তিনি গ্রামবিমুখ অথচ নগরের প্রতি প্রলুব্ধ একজনের উদ্দেশে বলেছেন :

ডাকলে কেউ আসে না যাবার মত কেউ নেই, এই
একাকী নিঃসঙ্গ আমি একলা বাতাসের বুক উথালপাথাল
এই ভয়াবহ শূন্যতার বুকে আমি কেবল কান্নায় ভেঙে
ঝুলে থাকবো আরো কতকাল!

... ...
স্মৃতিহননের এক উন্মত্ত খেলায় তুমি তোমার বিবরে।
আমি এই খা-খা মাঠ শুকনো নদী ধূসর বনানী
মৃত নীল পাখি নিয়ে একলা পড়ে আছি। তুমি
জলস্রোত শস্যবীজ সবুজতা এইসব নিয়ে
ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে।
("ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

"আজন্ম অস্বিষ্ট" কবিতাটি প্রতীকী তাৎপর্যে উজ্জ্বল। কবির ব্যক্তিজীবনের শূন্যতা ও একাকিত্বের একটা করুণ সুর এ-কবিতায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। জীবনের প্রতিকূল সময় সত্ত্বেও 'খোলা পিঞ্জর'-এর উপমান আশ্রয়ে কবিচিত্তে আশাবাদের সুর ধ্বনিত হতে শোনা যায়। এ-কবিতায় সেই আশাবাদের অর্থ, শৃঙ্খল থেকে মুক্তির প্রয়াস :

'সমস্ত পিঞ্জর এখন খোলা থাকবে
এখন সব মানুষের পাখি হওয়ার সময়'
আমি কুয়াশার মধ্যে এক নিরবয়ব পাখির উড়াল শুনতে পাই
("আজন্ম অস্বিষ্ট", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

পাখি এখানে বিপ্লবের প্রতীক। পিঞ্জরমুক্ত পাখি যে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করে, সেই স্বাদের প্রসঙ্গে আসলে মুক্তির কথাই বলা হয়েছে 'পাখি'র প্রতীকাশ্রয়ে। আবার "আমি তখন" কবিতায় 'বাঘ' ও 'হরিণ'-এর প্রতীকে তুলে ধরা হয়েছে শোষক আর শোষিতের চিত্র। অনবদ্য এই প্রতীকটি সমকাল পেরিয়ে মহাকালের প্রেক্ষাপটেও তাৎপর্যপূর্ণ :

আমি নতুন কেনা আরশি তুলে ধরি
চোখের সামনে
তুমি তার স্বরে চীৎকার করে বলো 'তুমি নও তুমি নও।'

... ...
আমি চমকে উঠি
আমি নদী দেখি
শালবন দেখি
ব্যাঘ্রনিনাদ পিঠে তুলে একদল হরিণকে ছুটে যেতে দেখি।
("আমি তখন", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

Dhaka University Institutional Repository

এমন প্রতীকাশ্রয়ী আরো কিছু কবিতা রয়েছে এ-কাব্যের অভ্যন্তরে। যেমন "মরা ফুলের ফাঁস" কবিতাটি রূপক-প্রতীকে অনন্য রূপ লাভ করেছে। আবার আদিম উন্মত্ততায় পৃথিবীর সৌন্দর্য বিনাশে যারা উদ্যত হতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আকুতি ব্যক্ত হয়েছে "পাখিদের বলি" কবিতায়। এ-কবিতার 'কৃষ্ণ-ভল্লুক' শব্দটি বিনাশী শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিনাশী দানবশক্তির হাত থেকে মাটি আর মানুষকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞাও প্রকাশ পেয়েছে এ-কবিতায়। এখানে 'পাখি' সুন্দর আর কল্যাণকামী মানুষের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, দাঙ্গা, অপ্রীতির বিরুদ্ধে পাখিদের জেগে উঠতে আহ্বান করেছেন কবি। তিনি কামনা করেছেন 'সুনীল পাখায়' মাতৃস্নেহের মতো পরম আবেগ সোহাগে ঢাকবে মৃত্তিকার সকল ক্ষত। সেই কারণেই কবি বারবার বৃক্ষ, নদী, পাখি, আকাশ, নক্ষত্র প্রভৃতি অনুষঙ্গের দ্বারপ্রান্তে যান। এ-কাব্যে সামগ্রিকভাবে প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমেই কবি তাঁর সৃষ্টিচৈতন্যের স্বাক্ষর রাখতে অধিক আগ্রহী। তবে আত্মানুসন্ধান কিংবা আত্ম-আবিষ্কারই হলো একজন সচেতন মানুষের সারা জীবনের কর্মপ্রয়াস। এই চেতনাদীপ্ত নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে এ-কাব্যের সর্বশেষ কবিতায়। তাঁর 'মনোলৌকিক মানচিত্রে অনায়াসে জেগে উঠেছে বৃক্ষ, বাঁশবাগান; বৃহৎ অধিকার নিয়ে প্রবাহিত হয়েছে নদী; হাস্যোজ্জ্বল বিভায় প্রস্ফুটিত 'আসমানের তারা'; মাছরাঙাও কবিকে চেনে; কদম আলী-জমিলার মা রক্তের না হলেও তারা আত্মার আত্মীয়। এই আত্মীয়তার বন্ধন অদৃশ্য, কিন্তু তার স্থায়িত্ব সহস্র বছরের।'[১৬] যুগ-যুগান্তরের এই মানুষগুলো যেন শুধু কবির একার নয়, প্রকাশ-দক্ষতায় তারা এই দেশের প্রতিটি মানুষেরই আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে কবি যেমন নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত পারিপার্শ্বিক মানুষদের চিনিয়েছেন, তেমনি তিনি নিজের শেকড়কেও উন্মোচন করেছেন স্বদেশের সবার সামনে। তাঁর কণ্ঠে তাই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ :

আমি কোনো আগন্তুক নই। এই
খররৌদ্র জলজ বাতাস মেঘ ক্লান্ত বিকেলের
পাখিরা আমাকে চেনে
তারা জানে আমি কোনো অনাত্মীয় নই।
কার্তিকের ধানের মঞ্জরী সাক্ষী
সাক্ষী তার চিরোল পাতার
টলমল শিশির, সাক্ষী জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা
নিশিন্দার ছায়া
অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলী
তার ক্লান্ত চোখের আঁধার
আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন। আমি
জমিলার মা'র
শূন্য খা খা রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি
সে আমাকে চেনে।

("আমি কোনো আগন্তুক নই", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

এই কবিতাটি একদিকে যেমন কবির পরিচয় জ্ঞাপক, তেমনি নিজের অবস্থানের পরিচায়কও। একজন সংবেদনশীল কবির আত্মানুসন্ধানের ব্যাকুলতা তাঁর কাব্যপ্রেরণারও অন্যতম অনুষঙ্গ। এ-কবিতার শব্দানুষঙ্গ পাঠকের চেতনাকে সহজেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে। বস্তুত এ-দেশের মাটি-বায়ু-জলের সঙ্গে কবির অস্তিত্বের সম্পর্ক প্রমাণিত। এ ছাড়াও 'এ-কাব্যে সভ্যতা ও শিল্পের মৌলিক উৎসসমূহকে আধুনিক জীবন ও শিল্পবিন্যাসের সাথে পরস্পরিত করেছেন কবি। যে আদিম বস্তুখণ্ডের সম্মিলন বা সংঘাতে অন্ধকার অকর্ষিত পৃথিবী প্রথম আলোকোজ্জ্বল ও উৎপাদনশীল হলো, যার মধ্য দিয়ে সূচিত হলো সভ্যতার প্রথম সূর্যোদয়,—ষাটোর্ধ্ব কবি সেই উৎসলোক থেকে নবতর বিস্ময় আহরণ করেছেন। ইতিহাসের ধাবমানতার মধ্যে পৌরাণিক উৎসের অনুপুঙ্খ অন্তর্বয়নে কবিচৈতন্য এক সমগ্রতার

Dhaka University Institutional Repository
বেলাভূমিতে উপনীত। এ-কাব্যের ভাষায় যেমন আধুনিক তীক্ষ্ণতা উপস্থিত, তেমনি, লোকজ এবং নাগরিক জীবনাচরণ ও বিশ্বাসের প্রতিফলন এর বিষয় বা শিল্পেও লেগেছে নতুনত্বের ছন্দদোলা।'[১৭]

দু'হাতে দুই আদিম পাথর কাব্যে অধিকাংশ কবিতাই অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। আবার মাঝেমধ্যে পাওয়া যায় অন্ত্যমিলসর্বস্ব মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দেরও। এ-কাব্যটির শুরুটা অবশ্য স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতা দিয়ে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটি কবিতায় কবি অন্ত্যমিল বজায় রেখে চমৎকারভাবে পঙ্‌ক্তি ভেঙে দিয়েছেন। কবিতাটির কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :

ভালোবেসে দু'হাত বাড়ালে
সময় দেখে না তাকে সন্দেহের চোখে, তার
বুক জুড়ে মেলে দেয় ঋদ্ধ অবয়ব,
থাকে। আর ইচ্ছেমত সময়ের আয়ুষ্কাল বাড়ানো সম্ভব।

("সময়-অসময়", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

বরাবরই কবিতার শব্দ-নির্বাচনে আহসান হাবীব সচেতন থেকেছেন। এ-কাব্যের কবিতাবলিতে ওই স্বাক্ষর আরো বেশি করে উদ্ভাসিত।

দুই

আহসান হাবীবের কাব্যভাণ্ডারে *সর্বশেষ* সংযোজন *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*। মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্রকাশিত এ-কাব্যে স্বাভাবিকভাবেই কিছু কবিতায় মৃত্যুচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। মর্ত্যলোকে সময় যে ফুরিয়ে যাচ্ছিল, তার আভাস স্পষ্টই প্রকাশিত হয়েছে এ-কাব্যে। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব-নিকাশ মেলাতে গিয়ে অভিজ্ঞতার 'দর্পণে' কবি প্রত্যক্ষ করেছেন ঘাত-প্রতিঘাতে বিদীর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি। এর আগের কাব্যে যা কিছু কবির সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে অথবা যা কিছু ছিল তাঁর কাছে বিচিত্র-বর্ণিল, তার সবই যেন পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে এ-কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতায়। শব্দ-ব্যবহার ও বক্তব্য-প্রকাশেও তেমন অনুষঙ্গই প্রাধান্য পেয়েছে। কবি যেন বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভে আসছে। সময়ের প্রবহমানতায় জীবনবায়ু স্তব্ধ হওয়ার আশঙ্কায় কবিতার ভেতরে তাই বিনাশী সুর বাজতে শুরু করেছিল। সেজন্যই তাঁর হয়ে ওঠার ইতিহাস 'পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ' ব্যক্ত করার তাগিদ অনুভব করেছেন তিনি। এ ছাড়া জীবনকর্মের হিসাব-নিকাশের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করতেও যেন তাড়া অনুভব করেছেন এ-কাবে। খুব সংক্ষিপ্তভাবে গদ্য ঢঙে রচিত কবিতার উপাদানে ভরপুর 'পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ' দিয়ে কবি যেন তাঁর পাঠককুলের কাছে হাজারো প্রশ্নের মীমাংসা করে গেছেন। এমনকি ত্বরিত প্রকাশ করে গেছেন জীবনের অনেক না-বলা কথাও। কবি হিসেবে তাঁর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, তাঁর কবিকণ্ঠের ধরন-ধারণ নিয়ে দিয়ে গেছেন অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর। প্রকৃতি, সমাজ, রাষ্ট্র, সময় কীভাবে তাঁকে নিয়ে এসেছিল সাহিত্য-সাধনার বন্ধুরপথে—সেসব কবি ব্যক্ত করেছেন কাব্যময় গদ্যে। মৃত্যু যখন কড়া নাড়ছে, তখনো তিনি বলেছেন, 'শ্রেণী বৈষম্যের অভিশাপ, মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা এবং উদ্ভ্রান্ত উদ্বাস্তু যৌবনের যন্ত্রণা এই সবই আজো পর্যন্ত আমার কবিতার বিষয়বস্তু।'[১৮]

আগের কাব্য *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যের ধারাবাহিকতায় এ-কাব্যেরও বেশকিছু কবিতা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ভাস্বর। তা ছাড়া, কাব্যনামের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে গাঁথা রয়েছে এ-কাব্যের সবচেয়ে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকী শব্দাবলি, যা একই সঙ্গে চিত্রময়তারও সৃষ্টি করেছে। প্রথম কবিতা "বসবাস নিবাস"-এ 'পাখির উড়াল', 'পথের বাতাস', 'নদী' প্রভৃতি শব্দ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে। তবে জীবন-সায়াহ্নে কবি 'নিবাস' অর্থাৎ গন্তব্য খোঁজার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যে অনাদিকালের কথা

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন এবং কবিতাটির পঙ্‌ক্তিগুলো যে কবির মৃত্যুচেতনারই বহিঃপ্রকাশ, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ কবি যে পথে যাত্রার ইঙ্গিত দিয়েছেন, সে-পথ নিরুদ্দেশের দিকে :

পাখির উড়াল দেখতে দেখতে প্রশ্ন করেছি
কোথায় নিবাস?
পথের বাতাস উড়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করেছি
কোথায় নিবাস?

কি নিঃসঙ্গ নদী বয়ে যায় একা একা নদী
কোথায় যে যায়
কতদিন তাকে প্রশ্ন করেছি নিবাস কোথায়
নিবাস কোথায়

... ...

হঠাৎ কখনো দর্পণে মুখ হঠাৎ প্রশ্ন
কোথায় নিবাস?
("বসবাস নিবাস", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

একধরনের গতিময়তার ইঙ্গিত কবিতাটির শব্দাবলিতে প্রতিফলিত হলেও জিজ্ঞাসার বিপরীতে কবির যেন কোনো উত্তর জানার প্রতীক্ষা নেই। যেন অসীম কোনো 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' জগতের সীমানা খুঁজে পেয়েছেন কবি। ওই জগতের অন্য নাম মৃত্যু। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও কবি "এইখানে নিরঞ্জনা" কবিতায় 'মরা নদীর স্রোত ছাড়িয়ে' বস্তুপৃথিবীর বাইরে 'নিরঞ্জনা নদীর সন্ধানে' যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু পার্থিব মায়া ত্যাগ করা কঠিন। তাই কবি বলেন :

তবে কেন যাবো—
কেন যাবো স্বদেশ ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে
অন্ধকারে
প্রস্তুতি বড় কষ্টের
আমার কোনো প্রস্তুতি নেই।
("যাবো না", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

যেহেতু মৃত্যু অলঙ্ঘনীয়, সেহেতু 'হঠাৎ কখনো দর্পণে মুখ হঠাৎ প্রশ্ন/ কোথায় নিবাস?' দর্পণে প্রতিফলিত আত্মপ্রতিকৃতির কাছে আত্মজিজ্ঞাসার পর অচিরিতার্থ ভাবনার বেদনা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়েছে "রূপকথা" কবিতা। এ-কবিতায় 'একটি ছোট নীল রেলগাড়ি' কবির সমস্ত স্বপ্ন বহন করে যাচ্ছে। 'শ্বাপদ সঙ্কুল ঘন অরণ্যের বুক চিরে' যে রেলগাড়িটি যাত্রা শুরু করে, তার গতি আবার স্থবিরও হয়ে যায়। তবু থামতে চায়, কিন্তু থামতে পারে না। কারণ:

যেখানেই থামতে চায়, আলো নিভে যায়।
চারদিকেই হায় হায় রব স্টেশনের কর্তা বলে, নেই
স্বপ্নটপ্ন নামাবার যোগ্য কোনো মুটে নেই আমার এখানে
নেই স্বপ্ন রাখবার মতো যোগ্য কক্ষ একটিও।
("রূপকথা", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

Dhaka University Institutional Repository
এই নীল রেলগাড়ির স্বরূপ ধারণ করে আছেন কবি নিজেই। জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই মূলত মানুষের স্বরূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর সেই ভীষণমূর্তি কবির সন্নিকটে। সেটিও কবিতায় রূপায়িত হয় কবির কবিত্বশক্তি সক্রিয় থাকার কারণেই। তাই বলে 'বহির্জগতের ভগ্ন, বিক্ষিপ্ত উপকরণের অবিকল সমাবেশ বা নিছক বিবরণ যে কাব্য নয়, সেখানে কার্যকর কবির সমন্বয়ধর্মী মানস বা উপলব্ধির শৈল্পিক গ্রন্থনা যা কবি ও পাঠকের অভিজ্ঞতা সমীকৃত করে, দায়িত্ব নেয় পাঠকচৈতন্য উদ্বোধনের এ সত্যও বিভিন্ন সূত্রে অভিব্যক্ত।'[১৯] সে কারণেই সামাজিক দায়বোধের কথা ভুলে যাননি আহসান হাবীব। যে কবিতাটি তাঁর কবিজীবনের হয়তো শেষ কবিতা, তার শেষ পঙ্‌ক্তিগুলো প্রত্যেক মানুষের জন্য অত্যন্ত নির্মম সত্য বলে বিবেচিত। কেননা পৃথিবী মায়া সহজে কেউ ত্যাগ করতে চায় না। কবিও চাননি। তাই তিনি লিখেছেন :

হাটে হাটে মানুষের মেলা
ঘরে ঘরে আপ্যায়ন—
এই দৃশ্যাবলী আমার সঙ্গী হবে না।
("যাবো না", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

সৃজিত চিত্রকল্প : সাবলীলতার বহিঃপ্রকাশ

কবি আহসান হাবীব কর্মসূত্রে নাগরিক পরিবেশের বাসিন্দা হয়েও কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে মৃত্তিকা-ঘনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করেছেন। এর জন্য কাব্যজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সাধনা করে গেছেন। সংগতকারণে কবিতায় নির্মিত প্রকরণকৌশলে আধুনিক চিন্তাচেতনাকে লালন করলেও শব্দের সুনিপুণ ব্যবহারে বারবার তিনি তাঁর শেকড় ও অস্তিত্বের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন। এর কৌশল হিসেবে তিনি কখনো আধুনিক সভ্যতার ধারক হিসেবে নগরের দিকে ছোটা মানুষের শেকড়-বিমুখতার চিত্র অঙ্কন করেছেন, কখনো-বা যান্ত্রিক নাগরিক পরিবেশের অসারতা তুলে ধরে নিসর্গ ও ঐতিহ্যের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছেন। মানসিক স্বস্তি পাওয়ার জন্য তিনি কবিতায় ব্যবহার করেছেন আবহমান বাংলার শাশ্বত চরিত্র—জমিলার মা, খালিক নিকিরিদের। কখনো বা দেশাত্মবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামীণ নিসর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নিবেদন করেছেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে কবি ব্যক্ত করেছেন স্বকীয় শিল্পবোধ আর নিবিষ্ট থেকেছেন শব্দের বিচিত্র সম্ভাবনা নির্মাণে। সেসব শব্দ কখনো ছন্দের বিভিন্ন বিন্যাসে অপরিহার্য স্থান অধিকার করে নিয়েছে, কখনো উপমায় আশ্রিত হয়ে কবিতার মাহাত্ম্য বাড়িয়েছে, কখনো প্রতীকের আবডালে অতি সাধারণ কথনকে বিশেষে উন্নীত করেছে, কখনো রূপকার্থের শিল্পিত প্রকাশে কবিতা হয়ে উঠেছে গভীর তাৎপর্যবহ, কখনো বা বিষয়ীভূত অর্থকে চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায় শিল্পিত করে তুলেছে। আর মাঝেমধ্যে একটি শব্দই তাঁর কবিতায় হয়ে উঠেছে একটি স্বতন্ত্র চিত্রকল্পের প্রকাশক। শব্দের এমন বিচিত্র সম্ভাবনা আর অনবরত প্রচেষ্টা আধুনিক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[২০] আহসান হাবীবের কবিতায় শব্দের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ তাঁর নান্দনিক শিল্পবোধকে উচ্চকিত করেছে।

আহসান হাবীবের কবিতার ক্যানভাসে সামাজিক দায়বদ্ধতা, রাজনীতি, দেশাত্মবোধ, মানবিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, স্মৃতিবিধূরতা, প্রেম প্রভৃতি কখনো উপাদান হিসেবে, কখনো লক্ষণ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এসব চেতনাবোধকে ধরতে গিয়ে কবি শব্দকে একেক সময় একেক ধরনের চিত্রকল্প নির্মাণে ব্যবহার করেছেন। চিত্রকল্প নির্মাণে বেশির ভাগ সময় তিনি নিসর্গ-প্রকৃতির কিংবা নিসর্গ-আশ্রিত শব্দাবলির নৈকট্য গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে নদী, ফুল, পাখি, আগুন, আলো, বন, বৃক্ষ, আঁধার প্রভৃতির সমাগম লক্ষ করার মতো। এর মধ্যে প্রথম কাব্যের সর্বশেষ কবিতা "রেড্ রোডে রাত্রিশেষ"—যেটাকে নাম কবিতাও বলা যায়, তার অবিস্মরণীয় চিত্রকল্পটি হঠাৎ পাঠকের বোধকে

Dhaka University Institutional Repository
সচকিত করে তোলে। রাত্রি শেষ হতে চলেছে—দেশ মুক্তি পাচ্ছে দীর্ঘ দিনের ঔপনিবেশিক শাসনের বেড়াজাল থেকে। এই বিষয়টিকে চিত্রকল্পের প্রাকরণিক কাঠামোতে তিনি আরো বেশি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। মূলত চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবি এই কবিতায় আলংকারিক সমগ্রতাকে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। ফলে ভাষা যেন দূরদর্শী হয়ে উঠেছে ইঙ্গিতের মহিমায়। কেননা, 'কবিতায় অঙ্কিত চিত্রমাত্রকেই চিত্রকল্প বলা যায় না। চিত্রকল্প চিত্রাতীত বাস্তবতা ও নান্দনিকতাকে ধারণ করে।'[২১] শুধু তা-ই নয়, চিত্রকল্পের ভেতরে সংশ্লেষিত থাকে বোধ ও তথ্যের মিশ্রণ। এ ছাড়াও চিত্রকল্পের সার্থক রূপায়ণে প্রমাণিত হয় কবির স্বসৃষ্ট কাব্যভাষার ওপর তাঁর সক্ষমতা। আর শব্দ দিয়ে অনাবিল সৌকর্য নির্মাণে কবিব্যক্তিত্বের স্বকীয়তা প্রকাশ পায়। কারণ শিল্পসচেতন কবিকে জানতে হয়, 'আত্মিক শক্তিই গুণময় শব্দের অর্থ, চিত্রের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর সংগঠনের সময়চেতনা, স্তবক ভাবানুভূতির ক্রম অগ্রসরমানতা ও উন্মোচন, সেন্সিবিলিটিময় চিন্তার নরম আলো প্রভৃতি বস্তুকে ও বিরোধকে সংশ্লেষণ করে তোলে। এবং এই সংশ্লেষণের ফলেই চিত্রকল্প শুধু ছবি নয়, অনুভূতিময় অর্থ এবং প্রতীকিত অর্থ হয়ে ওঠে।'[২২] এসব প্রাসঙ্গিকতা মেনেই আহসান হাবীবের কবিতা চিত্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। প্রথম কাব্যের শেষ কবিতায় আমরা তার সার্থক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই :

রাতের পাহাড় থেকে
খ'সে যাওয়া পাথরের মত
অন্ধকার ধসে ধসে পড়ছে।
দু'হাতে সরিয়ে তাকে নির্বিকার নিরুত্তাপ মন
এগোলো।
... ...
এখানে এই বিশাল পথ জড়িয়ে
অন্ধকার প'ড়ে আছে
দীর্ঘকায় সাপের মত।

("রেড্ রোডে রাত্রিশেষ", *রাত্রিশেষ*)

আমরা জানি যে, ব্যঞ্জনাধর্মিতা ও অনুভবের অনন্যতার আশ্রয়েই কেবল একটি চিত্রকল্পের সফলতা নির্ভর করে। উপর্যুক্ত কাব্যপঙ্‌ক্তিতে উপমা, রূপক, ও সমাসোক্তি অলংকারের সীমাবদ্ধ গণ্ডি ছাড়িয়ে সমবায়ী এক তাৎপর্যে উপমানসমূহ সম্মিলিতভাবে চিত্রকল্পে উন্নীত হয়েছে। 'রাতের পাহাড়' থেকে 'অন্ধকার ধসে' পড়ার কাব্যকল্পনা অবশ্যই অভিনব। বিশেষ করে, সেটি যখন আবার পাথরের মতো খসে খসে পড়ে। 'রাতের পাহাড়' গভীর রাতের অনুভবকে মনে করিয়ে দেয়। এর সঙ্গে তুলনা চলে কেবল পরাধীনতার গ্লানির। কেননা, ওই রাতের গভীরতা দূরীভূত না হয়ে কেমন 'ধসে ধসে পড়ছে'। আর ধসে পড়া অন্ধকারের 'স্তূপ' জাতি হিসেবে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতাকেই উসকে দেয়। স্তূপীকৃত সেইসব গভীর অন্ধকার 'দু'হাতে সরিয়ে' কবি যখন সামনের দিকে এগিয়ে যান, 'তখন তার সামনে জীবন বিপন্নকারী সীমাহীন বাধার প্রাচীর নেই। কারণ, তখন রেড্ রোডে রাত্রিশেষ। প্রত্যাশিত জীবনের দ্বারপ্রান্তে তখন নতুন দিনের নতুন সূর্যের অপূর্ব ইঙ্গিত।'[২৩] কবি কাব্যটির নামকরণ *রাত্রিশেষ* কেন করেছিলেন, তার উত্তরও পাওয়া যায় এই চিত্রকল্পের বিশ্লেষণে।

অন্ধকারকে উপজীব্য করে বহুবিধ চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন কবি আহসান হাবীব। অন্ধকার তাঁর কবিতায় কখনো কখনো মগ্নচৈতন্যের পরিপূরক হিসেবে, কখনো বা তৃষ্ণার প্রতিরূপ হিসেবে আর মাঝেমধ্যে মৃত্যুভাবনার প্রতীক হিসেবে চিত্রকল্পের উপাদান হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃষ্ণার প্রতিরূপ :

একদা মায়ের মুখের সেই তৃষ্ণার আঁধার
অতঃপর আলো হয়ে আমার অধরে
রেখেছে চুম্বন; আমি মা বলে ডেকেছি মাকে।
আমি তোমাকে পেয়েছি আর মাকেও পেয়েছি।

("তোমাতে অমর আমি", *ছায়া হরিণ*)

শুধু "এই ঝড়ে অন্ধকার"-এ নয়, একই সঙ্গে প্রতীক ও চিত্রকল্প ব্যবহারের প্রবণতা আহসান হাবীবের আরো বেশ কয়েকটি কবিতায় লক্ষ করা যায়। যেমন: প্রতীকাশ্রয়ী হয়েও "নতুন কবিতা"র বক্তব্যটি যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি চিত্রকল্পটিও চমৎকার। চিত্রকল্পটি যেন কবিকল্পনার বিচিত্ররূপ ও অলংকারের নির্দেশক :

এখন ঝড়ের আকাশ থেকে
তুলে নেব একগুচ্ছ অন্ধকার,
আর পরাবো তোমার কালো মেঘমালা খোঁপায়;
তুমি খুশি হবে;
ঝলকাবে বিদ্যুতের দু'একটা পাপড়ি
অমাবস্যা-হৃদয়ে আমার!

("নতুন কবিতা", *সারা দুপুর*)

অন্ধকার কখনো তাঁর কবিতায় জীবনাভিযাত্রার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আবার কখনো বিপুল জলরাশির প্রতিচরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয় অন্ধকার। অথৈ জলরাশিতে নিমজ্জিত হওয়া যেমন ভীতির উদ্রেক ঘটায়, তেমনি আলোহীন সংসারে অন্ধকারও আহসান হাবীবের কবিতায় ভয়েরই প্রতিরূপ হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। যার ফলে যে চিত্রকল্পটি প্রতিষ্ঠা পায়, তা কাছের মানুষের মধ্যে তৈরি করে বিচ্ছিন্নতা। যেমন:

জ্ঞানবৃক্ষ কিশোর ক'জন সেই অন্ধকার গলির মুখেই
অন্ধকারে গা ডুবিয়ে বিমূঢ়, পেছনে
লণ্ঠনের পরিচিত আলো নেই। গলির এ পথ
কি ক'রে পেরিয়ে যাবো জানি না সুমুখে
অন্ধকার। ভয়। যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের
অন্ধকার আমরা ক'টি বিভ্রান্ত নাবিক।

("বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আমরা", *আশায় বসতি*)

চিত্রকল্পের পরিসর যেহেতু শুধু চিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা চিত্রাতীত বাস্তবতায় বিস্তৃত, তাই চিত্রকল্পের শিল্পিত রূপ নির্মাণে আহসান হাবীব বহুবিধ উপকরণ ব্যবহার করেন। অন্ধকার শুধু নয়, অগ্নি ও আলোও চিত্রকল্প নির্মাণে তাঁর কবিতার শরীরকে মোহনীয় করে তোলে। তবে মাঝেমধ্যে কবির কাছে আলোর চেয়ে আগুনই বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। আলো স্নিগ্ধতা বা কমনীয়তার প্রতীক আর আগুন ক্রোধ, হিংস্রতা ও ধ্বংসের প্রতীক। তবু তাঁর কবিতায় দুটি বিষয়ই জীবনের প্রয়োজনে ইতিবাচকভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে :

১. যে হরিণী তোমাকে পশ্চাতে ডাকে তাকে
বিদ্ধ করো মধ্যাহ্ন সূর্যের শরে। তার

Dhaka University Institutional Repository

রক্তস্রোতে পায়ের নীচের
মাটির নতুন জন্মবেদনায় উদ্বেলিত করো
করতলে যে অনন্য গোলাপের রেখা
জন্মাবধি লালন করেছো; তাকে
এই রাতে আলোর মিছিলে ফুটতে দাও;
("পলাতক বন্ধুকে", *আশায় বসতি*)

২. তাই বেদনার বহ্নিও প্রাণে মাধুর্যে সুনিবিড়,
ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তাই বাঁধলাম নীড়।
তীক্ষ্ণ নখর উদ্যত যার তারে ভালোবাসলাম;
দু'নয়নে যার হিংস্র আগুন আজো জপি তার নাম
("এই মন—এ মৃত্তিকা", *রাত্রিশেষ*)

আলো, আঁধার, দিবালোক প্রভৃতি যেভাবেই কবিতায় ব্যবহৃত হোক না কেন, চিত্র ও চিত্রকল্প নির্মাণের সময় আহসান হাবীব তাঁর বস্তুবিশ্বকেই অবলম্বন করেন। দিন সূর্যের আলোকময় উপহার হলেও তাঁর একাধিক কবিতায় একাধিক চিত্রকল্পে দিন 'আহত পাখি' কিংবা বন্ধ্যা মাটির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। তিনি হতাশা থেকে ক্রমাগত উৎরানোর চেষ্টা করেছেন, তবু সময় যেন তাঁকে বাধ্য করেছে দিনকে নিয়ে বেদনাবহ চিত্রকল্প সৃজনে। 'হিংস্র আগুন', 'তীরবিদ্ধ দিন', 'সূর্যের শর' প্রভৃতি একই সঙ্গে রূপক আর চমৎকার চিত্রকল্পে ঠাঁই নেয় তাঁর কবিতায়। 'রোদ', 'সূর্য' কিংবা 'পলাতক দিনের' অনুভবও রূপাকাশ্রিতভাবে চিত্রিত হয় :

১. দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ পাখির মতো
বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান।
... ...
দিনগুলি আজ জরতী রাতের দুঃস্বপন,
চির দহনের তিক্ত শপথ করে বহন!
দিনগুলি মোর শ্বাপদ-বিজয়ী অরণ্যতে
শর-খাওয়া এক হরিণ-শিশুর আর্তনাদ।
("দিনগুলি মোর", *রাত্রিশেষ*)

২. অশেষ আশার তিন পলাতক, আজো মিলায়নি ছায়া,
আজো দিগন্তে স্বপ্নের মতো তারি অপরূপ কায়া
স্মরণের তীরে তীর্যক হয়ে ক্লান্ত নয়নে কাঁপে
আজো এ হৃদয় দিনের আশাতে দুঃসহ দিন যাপে।
("এই মন—এ মৃত্তিকা", *রাত্রিশেষ*)

প্রকৃতপক্ষে তীরবিদ্ধ হরিণ-শাবকের মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণাময় পরিস্থিতিই বিরাজমান ছিল বিভাগ-পূর্ব সময়ের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে। বিশেষ করে স্বাধীনতাকামী মানুষের মন ও মেজাজে ছিল তেমনই আর্তনাদ। নীলিমা, আকাশ, পাখি, নদী, ফুলের বাগান প্রভৃতি আহসান হাবীবের কবিতার ক্যানভাসে চিত্রকল্পের অনুষঙ্গ হিসেবে বারবার প্রযুক্ত হয়েছে। পাখির 'ঠোঁট' তাঁর অনুভূতির বলিষ্ঠ দ্যোতনা হিসেবে এসেছে বেশ কয়েকটি কবিতায়। আবার মায়াকান্না বা কপট শোক-এর চিত্রকল্পও সৃষ্টি হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

১. পুরনো সংলাপে তোমার ছলছলানো চোখ
পাখির ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখো বানিয়ে নেয়া শোক
বাইরে বিরাট নাট্যসভা তোমার অপেক্ষাতে
তুমি অচল শোকের রেখেছো দুই হাতে।

("চন্দনা চন্দনা বলে", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

২. বিপর্যস্ত পাখির পাখনায় তার
শেষ গান ঝরে যায় দেখো
দেখো তার চারপাশে প্লাবন
তার ক্লান্ত ঠোঁটে নূহের জাহাজ।

("বালক এবং পাখি", *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

আবার রূপকধর্মী চিত্রকল্প নির্মাণে 'যুদ্ধখচিত আকাশ', 'পোড়া নিসর্গ', 'ভীত ত্রস্ত হরিণের পাল' প্রভৃতি নেতিবাচক শব্দসমষ্টি দ্বারা কবি বেশকিছু কবিতায় তৎকালীন সামষ্টিক চেতনাকে ধরতে চেয়েছেন। শিল্পিত চিত্রকল্পের প্রয়াসে সামরিক পরিভাষা 'ট্রেঞ্চ'ও ব্যবহার করেছেন একটি কবিতায়। মূলত যুদ্ধ তীব্রভাবে নেতিবাচক স্বভাবী করে তুলেছিল তাঁকে। আর 'এর প্রভাবে নীলিমা বা আকাশকে নিয়ে তিনি রচনা করেছেন বাস্তবতা নির্দেশক পংক্তিমালা (sic)। এ কারণেই ভেঙে পড়া আকাশে বিকেলের পলাতক রোদের পরিসমাপ্তি ঘটে।'[২৪] তিনি বলেন :

এবার শরৎ রাত্রে পানপাত্রে মানুষের খুন;
আসিতেছে উড়ন্ত আগুন
আমাদের আকাশের ক্ষুব্ধ সীমানায়;
নতুন পঙ্গের দল ঝ'রে ঝ'রে ট্রেঞ্চেতে লুকায়!
... ...
এবার শরৎ রাত্রি স্বপ্ন নয়—এনেছে সঙ্গিন
লুণ্ঠিত স্বর্ণের শীষে যে স্বপ্ন রঙিন
কেঁদে মরে—মৃত্তিকায় মিশে যায় ধীরে;
এবার শরৎ রাত্রি উদ্‌যাপিত হবে আঁখি নীরে।

("শরৎ", *রাত্রিশেষ*)

নদীকে নিয়ে চিত্রকল্প নির্মাণের করতে গিয়ে ঐতিহ্যবহুল অতীতের স্মৃতিময়তা আর জীবনের প্রতি আশাবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন কবি। সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক আবহ, গোধূলি-অনুষঙ্গী, ফসলি মাঠ, নদীর সাঁকো চিত্রকল্প রূপকার্থে ইতিবাচকতার ইঙ্গিত বহন করে। তবে শুধু একপেশে ইতিবাচকতা নয়, বরং 'ঘৃণার নদীর সাঁকো' পার হয়ে তিনি বিশ্বাসের আলোকের দিকে যাত্রা করতে চান :

পৌষের ধানের ক্ষেতে দেখো রিক্ততাকে
করেছে আড়াল
কয়েকটি ছড়ানো ধান, গোধূলির গলানো সোনায়
এখনো ঝলমল করে
জীবনের গন্ধ দেয় কিছু এখনো। আদিম
তৃষ্ণায় আকণ্ঠ জ্বলে কয়েকটি মানব-আত্মা, দেখো
বিষণ্ন আলোয় খোঁজে কিছু রৌদ্র আর কিছু হাওয়া।

("ফুটবে ফুল", *ছায়া হরিণ*)

Dhaka University Institutional Repository

নিত্য সৌন্দর্য-বিস্তারী অথচ স্বতঃসন্ত্রস্ত নিরীহ প্রাণী হরিণের ব্যবহার নতুন মাত্রা লাভ করে আহসান হাবীবের কবিতায়। মানুষকে সচকিত করার অভিপ্রায়ে কবি 'মেঘ ও অন্ধকারের' মিশেলে একটি চিত্রকল্পের আবির্ভাব ঘটান। যেটি মূলত গ্রিক মহাকাব্য *ওডেসির* একটি ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়। প্রচণ্ড মনোচাপের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে চিত্রকল্পটি চমৎকার পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে "গন্তব্য ইথাকা" কবিতায়। "যত দূরে যাই" কবিতায় হরিণের চিত্রকল্পটি আবার প্রতীকী তাৎপর্য বহন করেছে, যেখানে কবির অনুভূতিটি শিশুহরিণের চপলতায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন :

১. সারাদিন বৃক্ষপতনের শব্দ স্মৃতির ভেতরে। সারা রাত
ভীত ত্রস্ত হরিণের পাল
ধাবমানতার শব্দ রেখে যায় বুকের ভেতরে।
চোখের ভেতরে পোড়ে নক্ষত্রনিবাস
গলে যায় সুনীল বাসনা।
উথাল পাথাল মেঘ, অন্ধকার। সোনার প্রতিমা
জ্বলে যায় বুকের ভেতরে, পুড়ে যায়।
জ্বলে দিন প্রচণ্ড খরায়।
("গন্তব্য ইথাকা", *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

২. তুমি চিত্রল শিশু হরিণ
লালন করেছো বুকে তোমার
চোখে নাচে তার রাত্রি দিন
কি যে অস্থির চপলতার।
পুরনো পথের প্রান্তে যাই
দেখি ফুটে আছে নতুন ফুল
শুকনো নদীর ঘাটে দাঁড়াই
নতুন পানিতে কূল
("যত দূরে যাই", *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

বিচিত্র বিষয় আহসান হাবীবের কবিতায় সার্থক চিত্রকল্প হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। অধিকাংশ সময় কখনো আশাবাদ, কখনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতা, কখনো-বা নৈসর্গিক উপাদান তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে মানুষের শবদেহকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে চিত্রকল্প নির্মাণের প্রয়াস খুব বেশি লক্ষ করা যায় না। তাঁর কবিতায় শব কখনো শোকের প্রতীক, কখনো নৈঃসঙ্গ্যের প্রতীক, কখনো বা বধ্যভূমির প্রতীক হিসেবে ঠাঁই করে নিয়েছে। তেমনই একটি কবিতার উদ্ধৃতি :

আমিও শোকার্ত। তাই পথ চলতে কখনো উদাস
দু'চোখ আকাশে রাখি,
... ...
সারা শোক কাফনে আবৃত করি এবং ঘুমাই
শান্ত হয়ে। যেমন দেখেছি
মৃতের গলিত শব শ্বেতবস্ত্রে নিজেকে লুকিয়ে
লোকালয় আর সব কোলাহল থেকে
দূর সরে নিশ্চিন্তে ঘুমায়।
("শোকার্ত একজন", *আশায় বসতি*)

Dhaka University Institutional Repository

"চিত্রমালা" কবিতায় আহসান হাবীব চমৎকারভাবে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের সামাজিক পরিস্থিতি অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছেন। চিত্রকল্প কবিমনের দৃঢ় অথচ সংক্ষিপ্ত ভাবনার বিকাশ। চিত্রকল্পকে শিল্পিত করতে পঙ্‌ক্তির বিন্যাসের আবডালে রূপক, প্রতীক, সংকেত প্রভৃতি আহসান হাবীবের কবিতায় সাবলীলভাবে সক্রিয়। উপর্যুক্ত কবিতাবলি ছাড়াও মাঝেমধ্যে তিনি পৌরাণিক শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে চিত্রকল্পের সৃষ্টি করেন। আবার 'জমিলার মা', 'খালেক নিকিরি', 'সুন্দরালী', 'কদম আলী' প্রভৃতি প্রত্নচরিত্রের কথা বলতে গিয়ে কিংবা কোনো একটি বিশেষ শব্দপ্রয়োগে তিনি অসাধারণ চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। তেমনই একটি কবিতা "আমি কোনো আগন্তুক নই"। এখানকার 'জমিলার মা', 'কদম আলী', 'মাটির সুবাস' কিংবা 'বৈঠায় লাঙলে' 'হাতের স্পর্শ' প্রভৃতি শব্দমালা ব্যবহার করে কবি মানুষকে অস্তিত্বের সন্ধান দিয়েছেন।

সার্বিকভাবে বলা যায়, 'কবি কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে অখণ্ড আবেগ, খণ্ড খণ্ড অনুভূতি ও চেতনার রূপবন্ধনের প্রয়াসে অবশেষে হন শব্দশিল্পকবি; যেখানে শব্দযন্ত্রী নন কেবল, সার্থক শব্দশিল্পীও। একটি বিশেষ কল্পনার নদীপথে সুনির্বাচিত শব্দাবলি মিলেই তৈরি হয় চিত্র, রূপ ও রহস্যময় চরা—'রূপচিত্র', যা কবিতার শরীরে অত্যাবশ্যকীয় উপাদানই নয় শুধু,...মোহনীয় চিত্রকল্পও।'[২৫] আহসান হাবীবের কবিতার মনোজ্ঞ কারুকাজে বিষয়ের সঙ্গে শব্দই অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। কেননা, শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে এক একটি বিশেষ অর্থ ও অভিব্যক্তির সাযুজ্যে তিনি শিল্পিত কবিতার সোপান নির্মাণে সচেষ্ট থেকেছেন কবিজীবনের শেষ পর্যন্ত।

তথ্যনির্দেশ

১ বেগম আকতার কামাল, *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব কাব্যরূপ*, ইত্যাদি প্রকাশ (দ্বিতীয় সংস্করণ), ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১২৯

২ আজীজুল হক, *অস্তিত্বচেতনা ও আমাদের কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৭

৩ মিজানুর রহমান খান, "আহসান হাবীবের কবিতার শিল্পরূপ", *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা, চৌত্রিশ বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যা।। আষাঢ় ১৩৯৮, পৃ, ১৮৩

৪ মিজানুর রহমান খান, পূর্বোক্ত, ১৮৪

৫ হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৮

৬ আহমদ রফিক, "চল্লিশের কবিতা: স্বভাবে স্বরূপে", নান্দীপাঠ (সম্পা. সাজ্জাদ আরেফিন), সংখ্যা: পাঁচ, নভেম্বর ২০১১

৭ বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, "আহসান হাবীবের *সারা দুপুর*: সময়ের শিল্পকথা", 'সাহিত্য পত্রিকা', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ: ৪৮, সংখ্যা: ৩, জুন ২০১১, পৃ. ৩৩

৮ বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

৯ *আশায় বসতি* কাব্যের প্রকাশকাল (১৯৭৪) দেখে অনেকেই ভাবতে পারেন যে এর কবিতাগুলো হয়তো স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে রচিত। কারণ এর পূর্ববর্তী কাব্য *সারা দুপুর* প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। পাঠক যাতে কোনোভাবেই বিভ্রান্তিতে না পড়েন, তাই কবি দূর করেছেন সেই সংশয়। বলেছেন, 'উল্লেখ প্রয়োজন, দেশব্যাপী যখন স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিলো ক্রমান্বয়ে; সেই দুর্যোগময় দিনগুলিতে ১৯৭১ মার্চ-এর আগে পর্যন্ত লেখা প্রায় সব কবিতাই এই-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৬৪-তে প্রকাশিত *সারা দুপুরের* অন্তর্ভুক্ত হয়নি, পূর্ববর্তী এমন কিছু কবিতাও হয়ত রয়েছে এই সঙ্গে। রচনার সময়কাল বিস্মরণে আমি পারঙ্গম। তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে লেখা কোনো কবিতাই *আশায় বসতির* অন্তর্ভুক্ত নয় এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

১০ মিজানুর রহমান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

Dhaka University Institutional Repository

১১ পূর্বোক্ত, পৃ, ২০১

১২ তুষার দাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৬২

১৩ তুষার দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

১৫ মিজানুর রহমান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯

১৭ রফিকউল্লাহ খান, "আহসান হাবীবের কবিতা", 'ইত্তেফাক', ঢাকা, ২৬ কার্তিক, ১৩৮৯

১৮ আহসান হাবীব, 'পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ', *আহসান হাবীব রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৪৯

১৯ সিদ্দিকা মাহমুদা, *সুধীন্দ্রনাথ : কবি ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১১০

২০ মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৬৩

২১ সরকার আমিন, *বাংলাদেশের কবিতায় চিত্রকল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪

২২ বার্ণিক রায়, *কবিতা : চিত্রিত ছায়া*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪

২৩ মিজানুর রহমান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

২৪ সরকার আমিন, *বাংলাদেশের কবিতায় চিত্রকল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ.৩৬

২৫ "ঈগলের চোখে বসন্ত", নিরো সিরাজুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতার অঙ্গনে আবির্ভূত হয়ে আহসান হাবীব কার্বচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল। কবি হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় প্রবাসজীবন গ্রহণ করে আহসান হাবীব কর্মজীবনের নানা টানাপোড়েন সত্ত্বেও কবিতাকে শিল্পিত করার ক্ষেত্রে ছিলেন আপসহীন। মূলত কবি হওয়ার জন্য কলকাতায় গিয়ে আহসান হাবীব যেমন পেয়েছিলেন 'কলমপেশা মজুর'গিরি করার সুযোগ, তেমনি পেয়েছিলেন 'সমমনা' কবি-সহযাত্রী। তবু, সময় ও সমাজকে দেখার ভিন্নতা আর অর্জিত অভিজ্ঞাতাই তাঁকে স্বতন্ত্র কবি হিসেবে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তিরিশের কবিতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পেরিয়ে চল্লিশে যখন নতুন কাব্যযাত্রা শুরু, তখনই মানবতাবাদী কবি হিসেবে আহসান হাবীব সহযাত্রী হিসেবে পেয়ে যান সংগ্রাম, প্রতিবাদ ও রাজনৈতিক মতাদর্শের একদল সক্রিয় কর্মী-কবিকে। তবে এঁদের ভিড়েও তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বের ওপর ভর করে স্বতন্ত্র স্বরের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ-কথা সত্যি, চল্লিশে বিরাজমান সাহিত্য-শিল্পের পরিমণ্ডলই আহসান হাবীবকে ব্যক্তিত্বশীল কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

আহসান হাবীব কবি-জীবনের শুরুতে যেমন ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে কবিতা নির্মাণে যত্নশীল ছিলেন, তেমনি শেষাবধি তিনি ছিলেন বিশেষ কোনো মতবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত। প্রচণ্ড আবেগময় পরিস্থিতিতেও কবিতাকে কীভাবে মতাদর্শের প্রভাবমুক্ত রাখা যায়, সেদিকে তিনি ছিলেন যত্নশীল। আবেগকে নির্লিপ্ত রাখার এই কৌশলও তিনি রপ্ত করেছিলেন চল্লিশের দশকে কাব্যযাত্রার সূচনালগ্নেই। কেননা, রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবে দুই মেরুর সক্রিয় দুই কর্মী—ফররুখ আহমদ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য-প্রাপ্তিও তাঁকে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের দিকে আকৃষ্ট করেনি। চল্লিশের দশকে উত্তপ্ত সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে তিনি যেমন স্বকীয় আদর্শেই কাব্যচর্চা করেছেন, প্রাধান্য দিয়েছেন কবিতার শিল্পিত রূপকে, তেমনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আবেগময় দিনগুলোতে রচিত কবিতা দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পাঁচ বছর পর তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন যুদ্ধকালের কবিতা (*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*, ১৯৭৬), যাতে কবিতা বাড়াবাড়ি রকমের আবেগ-আক্রান্ত না হয়।

বিষয় নির্ধারণ, শব্দ নির্বাচন ও প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে আহসান হাবীব কবিতার শরীরে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন প্রথমাবধি। তাঁর কবিতায় সাধারণ মানুষের সংকট প্রাধান্য পেয়েছে; উঠে এসেছে সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সংকটের বিষয়াদি। সমাজ-রাজনীতির সংকটে উদ্বিগ্ন কবি আহসান হাবীব তাঁর কাব্য-জীবনের শুরুতেই মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছিলেন, যা ক্রমে আরো বিস্তার লাভ করেছে। তাঁর যাপিত জীবন নাগরিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও তিনি মনে-প্রাণে ধারণ করেছিলেন ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি। গ্রামীণ ঐতিহ্য, অতীত-গৌরব, স্বকীয় সংস্কৃতির দিকে বারবার ফিরে তাকানোর প্রয়াস তিনি চালিয়েছেন কাব্যজীবনের শেষ পর্যন্ত। সেই কারণেই বাঙালির শাশ্বত চেতনা অক্ষুণ্ন রেখেও কবি বিবর্তনশীল ও সৃষ্টিশীল প্রতিভার শিল্পিত দ্যুতি ছড়াতে পেরেছেন কবিতার শরীরে। সুগভীর জীবননিষ্ঠা ও আন্তরিক শিল্প-অনুধ্যানই তাঁকে সাফল্যের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দুই মহাসমরের সন্তান আহসান হাবীবের কাব্যশিল্প বাংলা কবিতার মূল ধারায় স্থিত থেকেই থেকে ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছে। শেকড়কে খুঁজতে গিয়েই তিনি পুনরাবিষ্কার করেছেন স্বদেশকে। আর ওই স্বদেশ তাঁর কবিতায় 'দেশমাতা'-রূপে সম্ভাষিত হয়েছে। এর কারণ তাঁর কাব্যযাত্রার শুরুতেই বিশ্বযুদ্ধ এবং এর নেতিবাচক প্রভাবে সৃষ্ট চল্লিশের মন্বন্তরকে খুব কাছে থেকে দেখার অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর। যুদ্ধ-মহামারির দুঃসময়ে সংবেদনশীল লেখকমাত্রই মানবতার পক্ষে অবস্থান নেন। আহসান হাবীবও মানবসৃষ্ট সংকটকে কাছ থেকে দেখে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান কামনা করেছেন সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করার মধ্য দিয়ে। তাঁর মৌলিকত্বের সূত্রপাত ঘটা প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ*-এ জীবন ও সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতা ধরা পড়েছিল, তার মধ্যেও সক্রিয় ছিল আত্ম-অনুসন্ধানী কবির মানবীয় অভীপ্সা। প্রত্যয় আর সাহসিকতা পুঁজি করেই তিনি উত্তরকালে অনায়াসে রচনা করেন *ছায়া হরিণ*। এ-কাব্যে চেতনায় নৈরাশ্যভর করলেও তিনি যেন এখানেই আপন ঠিকানা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন। এই অবস্থার সমাপ্তি ঘটে *সারা দুপুর* কাব্যে। সামাজিক অসাম্য ও অসংগতি তাঁকে পীড়িত করেছে বারবার, তবু সমাজ ও মানুষের সমান্তরালে শিল্পের প্রতিও যে তিনি ছিলেন দায়বদ্ধ, তারই স্মারক এ-কাব্য। আর ষাটের দশকের উত্তাল সময়ের কবিতা নিয়ে প্রকাশিত *আশায় বসতিতে* কবি দৃঢ়চেতা হিসেবে উচ্চ আসন লাভ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের আগে রচিত কবিতায় আহসান হাবীবের ভবিষ্যৎমুখী মানস-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। *আশায় বসতিতে* তিনি আবেগী, দৃঢ়কণ্ঠ ও ভবিষ্যদ্রষ্টা কবিপুরুষ। আর মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কবিতা নিয়ে প্রকাশিত *মেঘ বলে চৈত্রে যাবোতে* আমরা ধীরস্থির ও বাস্তববাদী আহসান হাবীবের অন্তর্মুখী বেদনার কবিতা পেয়েছি। চল্লিশের দশকে 'রাত্রিশেষ' বলার পরও যেমন কবিসহ সমগ্র বাঙালি অচিরেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় সংক্রমিত হয়েছিলেন, তেমনি কবিও যেন আবার স্বপ্নভঙ্গের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে লেখেন *মেঘ বলে চৈত্রে যাবের* কবিতাবলি। এভাবে বিচিত্র পথ পাড়ি দিয়ে তিনি আবারও গৌরব ও ঐতিহ্যের প্রতি ফিরে তাকান—নতুন প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ-পর্যায়ে পৌঁছেই তাঁর কাব্যযাত্রার চরমোৎকর্ষ ঘটে *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* ও *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* কাব্যে।

ওই দুই কাব্যের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত ভিন্নধাঁচের কাব্যগ্রন্থ *প্রেমের কবিতায়* এক স্থিতপ্রজ্ঞ প্রেমিক-কবির ঘটে আত্মপ্রকাশ। *প্রেমের কবিতায়* পাঠক যে আহসান হাবীবকে পান, তিনি একেবারেই অপরিচিত অথচ সফল এক কবিপুরুষ। শব্দবিন্যাস ও কবিতার গঠনে হয়ত তিনি মোটেই অচেনা কেউ নন। তবু এ-কাব্যের কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে প্রেমের বিচিত্র পথে কবিকে পরিভ্রমণ করতে দেখা যায়। প্রেম যে সর্বকালের ও সর্বস্থানের অনুপ্রেরণা এবং সেই কারণেই মানব-মনে ও শিল্পে তার সপ্রাণ উপস্থিতি—কবি জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এর মধ্যে বিশুদ্ধ আবেগের পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছে যুগোচিত চিত্রকল্প, স্বপ্ন-কল্পনা, আকাঙ্ক্ষা; কখনো বিচ্ছেদ-ব্যর্থতা, মিলন ও আনন্দের বিচিত্র অনুভূতি। তাঁর কবিতায় মানবজীবনের এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রেম হচ্ছে মানুষের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি। আহসান হাবীবের সমগ্র কাব্যজগতের পরিপ্রেক্ষিতে, *প্রেমের কবিতার* কবিতাসমূহ বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক অভিনব সংযোজন।

কর্মময় লৌকিক জীবন ও শ্রম আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যে ভিত্তি রচনা করে এবং উপায় বাতলে দেয়, তা থেকে অতি গভীর ও অনস্বীকার্য বাস্তবতার নির্যাসকে তুলে এনে কবি পরিচর্চা করে তা প্রয়োগ করেছেন প্রায় প্রতিটি কাব্যে। কর্মের ও আনন্দের প্রণোদনা জোগায় যে বাস্তবিক জীবন-ভাবনা, নান্দনিক

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চতায় তাকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে শিল্প ও শিল্পীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, ব্যর্থ হয়ে যায় দীর্ঘ সাধনার ত্যাগ ও তিতিক্ষা। আহসান হাবীবের সৃজনী প্রতিভা ছিল উঁচু স্তরের। তিনি সভ্যতার উত্থানে, সমৃদ্ধিতে এবং অগ্রসরণে শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকাকে যেমন উপলব্ধি ও প্রশংসা করেছেন, তেমনি তিনি ঐতিহাসিক স্তর অতিক্রমণের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতেও আস্থা রেখেছেন। তাই চেতনার বলিষ্ঠতা ও সূক্ষ্মতায়, কল্পনার নানা সিঁড়ি বেয়ে বিচিত্র পথপরিক্রমা অতিক্রম করেই তিনি কাব্যের নাম রাখেন *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*। এ-কাব্যে স্থান পেয়েছে সংক্ষুব্ধ হয়ে রচিত একটি কবিতা। যার প্রেক্ষাপটটি একেবারেই ব্যক্তিগত। ষাটের দশকে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচার নিষিদ্ধ করার বিষয়ে বাধ্য হয়ে স্বাক্ষর প্রদান আর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা চেয়ে লেখা বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান নিয়ে চলা বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই কবিতাটি রচিত। 'আমি কোনো আগন্তুক নই' বলে উচ্চারিত ওই পঙ্‌ক্তিতে নিহিত বক্তব্য দিয়েই তিনি সেই বিতর্কের জবাব দিয়েছিলেন। কারণ কেউ কেউ তাঁকে পাকিস্তানপন্থী কবি বা লেখক হিসেবে চিহ্নিত করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচিত সমগ্র কবিতায় কখনো পাকিস্তানের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি। এমনকি চল্লিশের দশকে রচিত কবিতাতেও যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, তা মূলত ছিল পরাধীনতা থেকে, ভিনদেশী শাসন থেকে, সর্বোপরি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির আকুতি। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণে শোকাভিভূত হয়ে লেখা অসাধারণ কবিতা "বাইশে শ্রাবণ" (*রাত্রিশেষ*) এবং তাঁর ১৩৮১ বঙ্গাব্দের পঁচিশে বৈশাখে *আশায় বসতি* কাব্যপ্রকাশ করার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-অনুরাগী কবি হিসেবে তিনি যে শ্রদ্ধার স্বাক্ষর রেখেছেন, তা-ও বিশেষ তাৎপর্যবহ। *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় প্রকাশিত 'চিরচেনা স্বজনদের' কাছে ফেরার যে আকুতি ব্যক্ত করেছেন কবি, তাঁরা আসলে বাঙালি জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই অবিচ্ছেদ্য চরিত্র। 'খালেক নিকিরি', 'আলেফ মুনশী', 'সখিনা', 'জমিলার মা', 'লক্ষ্মণ মুচি' প্রমুখ চরিত্র উপস্থাপনগুণে প্রত্নচরিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে। আর শেকড়ভোলা মানুষের প্রতি উষ্মা প্রকাশের পাশাপাশি কবি যে মানসিকভাবে শেকড়ের কতটা কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছেন তা-ও প্রতিফলিত হয় এ-কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। অন্যদিকে নশ্বর পৃথিবীর প্রতি অকৃত্রিম মায়া আর মৃত্যুচেতনার প্রতিফলন ঘটেছে কাব্য *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* কাব্যে। এখানে কবির লালিত স্বপ্নের সঙ্গের বাস্তবতার বৈপরীত্য উঠে এসেছে। সময়ের কাছে প্রত্যাশা আর বিরাজমান বাস্তবতার দ্বান্দ্বিক রূপ লক্ষ করে কবি যখন সারা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজেই নিজের সামনে দাঁড়ান তখন আর স্বাভাবিক থাকে না তাঁর স্মৃতির আয়না—বিদীর্ণ হয়ে যায়। একজন সমাজ-সচেতন মানুষ হিসেবে যখন তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর সার্বিক প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যাবে, থেকে যাবে সামাজিক বৈষম্য, শোষণ প্রভৃতি, তখন স্বভাবতই তিনি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েন আর ফিরে তাকান নিজের দিকে। ফলে স্বপ্ন, অভিজ্ঞতা আর বাস্তবতার ত্রিমুখী অবস্থানের কারণে কবির আত্মপ্রতিবিম্বের প্রকৃত স্বরূপ যেন তার স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলে। তাই তাঁর অন্তর্চেতনা হয়ে যায় দ্বিখণ্ডিত—যার একটি মৃত্যুচেতনা অন্যটি সমাজচেতনার ব্যর্থ স্বরূপ। বিশেষ করে, বিরাজমান প্রেক্ষাপটে কবির প্রত্যাশার স্বপ্ন যখন মানবসৃষ্ট চোরাবালিতে হাবুডুবু খায়, তখন তাঁর মানস-পৃথিবীর দর্পণ বিদীর্ণ হয়ে যায়। বিদীর্ণ দর্পণে প্রতিফলিত আত্মপ্রতিবিম্বও তখন স্বভাবতই বিচূর্ণ হয়, ভেঙে যায় প্রকৃত আদল কিংবা অবয়ব।

আহসান হাবীবের দীর্ঘ জীবনের কবিতায় উৎপীড়িত, বঞ্চিত মানুষ যেমন উপাদান হয়ে এসেছে, তেমনি স্থান পেয়েছে নিসর্গ-প্রকৃতি। এই নিসর্গ-প্রকৃতি কখনো এসেছে ঐতিহ্যিক উপাদান হয়ে,

Dhaka University Institutional Repository

কখনো-বা সভ্যতা ও মানবসমাজের টিকে থাকার অবিচ্ছেদ্য উপকরণ হিসেবে। কেননা, প্রকৃতির ভেতরেই লালিত হয় মানুষ ও মানবসমাজ।

বিষয় ও বিষয়াতিরেকের জটিল ও ইংগিতপূর্ণ রূপবন্ধনে এবং ইন্দ্রিয় সংবেদ্য মনোজ্ঞ কারুকাজে প্রত্যক্ষত শব্দই প্রত্যেক শিল্পীর প্রধান অবলম্বন। কবি আহসান হাবীবের ক্ষেত্রেও তা প্রাসঙ্গিক। প্রত্যেক বড় কবিই তাঁর শব্দ-কারুকার্য দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর করে রাখতে চান। আহসান হাবীবও চেয়েছেন, সফল হয়েছেন। তবে তাঁর কবিতায় শব্দ ও শব্দের বিশেষ অর্থ কবির উপলব্ধিকে উচ্চকিত করে তোলে। ওই শব্দকে আশ্রয় করেই তিনি চিত্র, দৃশ্য, বর্ণ ও চেতনাস্রোতের সমন্বয়ে কবিতার অবয়বে সাফল্যের চিহ্ন এঁকে দেন।

বাংলাদেশের কবিতার অগ্রপথিক আহসান হাবীবের হাতেই প্রথম এই অঞ্চলের মাটি-মানুষ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যিক উপকরণ আধুনিক কবিতার সমস্ত কলা-কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। তিনি অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে দ্বিধাহীনভাবে বর্জন করেছিলেন 'চল্লিশি রোমান্টিকতা'। সে-কারণে তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে বোধ ও বিশ্বাসের মেদহীন সংহতি। ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, সুন্দর ও শিল্পের অনুশীলনেই আহসান হাবীবের কবিচৈতন্য গঠিত ও বিকশিত হয়েছে। যে চেতনাবলে ও আত্মবিশ্বাসে তিনি সারা জীবন নিমগ্ন ছিলেন, তা আমাদের কাব্যচর্চার অঙ্গনে মানবজীবনের গূঢ় সত্যকে উচ্চকিত করেছে। তাই সমাজ, ঐতিহ্য, দেশপ্রেম ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষের বেঁচে থাকার কঠোর সংগ্রাম, মধ্যবিত্তের দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতা—এ সবই তাঁর কবিতায় বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেয়েছে। ফলে সাময়িক পরাজয়, ক্লান্তি, বঞ্চনা, জরা, মৃত্যু, শোষণ-তোষণ, অত্যাচার-নিপীড়ন সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি মানুষকে আশার বাণীই শুনিয়েছেন। কবিতার বিশুদ্ধ পরিমণ্ডলে তাঁর সুদীর্ঘ অভিযাত্রা যে আবেদন সৃষ্টি করেছে, তা অনাগত প্রজন্মের জন্য জীবনের প্রতি, শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ ও বিশ্বস্ত থাকার নিরন্তর অনুপ্রেরণা-স্বরূপ। বাংলা কবিতার অঙ্গনে বিশ শতকের তিরিশের দশকে আবির্ভূত প্রভাবশালী কবিদের কেউ কেউ পরবর্তী দশকগুলোতে সক্রিয় থাকলেও কবিতার ভুবনে আহসান হাবীব ওই প্রভাবমুক্ত স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর বড় শক্তি ছিল সমাজ-সচেতনতা ও দেশপ্রাণতা। চল্লিশের দশকে সৃষ্ট এই নতুন কাব্যধারার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলেন বলেই সমাজজীবনের নানা সংকটে পরাজয়ের আশঙ্কা তীব্র হলেও তিনি মুষড়ে পড়েননি, জনবিচ্ছিন্ন ও বিবরবাসী হননি; বরং মানুষের জীবনকে মাহিমান্বিতরূপে কবিতায় উপস্থাপন করেছেন। তীক্ষ্ণ জীবনবোধ ও সময়-স্বভাব তাঁর কবিতাকে করেছে সংবেদনশীল ও জীবনঘনিষ্ঠ। প্রবল হতাশা ও নৈরাশ্যের মধ্যেও তাঁর কবিতায় উঁকি দিয়েছে আশাবাদ। কারণ তিনি 'বিকলপক্ষ পাখি'র অনিশ্চিত জীবনের প্রতিমা রচনা করেও নীড় বাঁধার সুখ-স্বপ্ন দেখেছেন নিরন্তর।

সর্বোপরি বলা যায়, বাংলা কবিতার ভূগোলে তিরিশের কবিরা যেমন ছিলেন শিল্পসর্বস্ব, ঠিক তেমনি চল্লিশের কবিরা ছিলেন মতাদর্শ-সর্বস্ব। চল্লিশের দশকে আবির্ভূত বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে একমাত্র আহসান হাবীবই শুরু থেকে শিল্প ও আদর্শের সমন্বিত রূপকে লালন করে বাংলা কবিতার নন্দনশোভন ধারাকে আগলে রেখেছিলেন। তিনি গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাননি কারো বাণীতে মুগ্ধ হয়ে। জনচিত্তের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোনো অত্যুৎসাহী ব্যগ্রতা ছাড়াই অনায়াসে সহজে মন ও মানসে মানুষেরই নিকটাত্মীয় হয়েছেন। এই কারণেই কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ লালন না করেও তিনি চল্লিশের দশকে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়ার তাগিদ অনুভব

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। কাব্যচর্চার প্রারম্ভিক কাল থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি স্ব-নিরূপিত বিশ্বাসকেই বহন করেছেন। বিশ্বাসের ধ্রুবকে সমৃদ্ধ করে তিনি নিজেকে ক্রমাগত অতিক্রম করে গেছেন আঙ্গিক ও শিল্পসাধনায়। ব্যক্তিজীবনে যেমন শোরগোল ছিল তাঁর অপছন্দ, তেমনি কবিতাতেও উচ্চকণ্ঠ ভাষ্য ছিল তাঁর অপ্রিয়। কবিতা রচনার সূচনালগ্ন থেকেই তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে ব্যক্তিত্ব, স্থান পেয়েছে সুনিয়ন্ত্রিত আবেগ, স্বপ্নময়তা, মন্ময়তা, স্মৃতি-বিধুরতা, দেশপ্রাণতা ও রোমান্টিকতা। তিনি বাংলা কবিতার চিরায়ত পথেরই একজন সফল কবিপুরুষ।

Dhaka University Institutional Repository

প রি শি ষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

আহসান হাবীবের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১৯১৭ তৎকালীন বৃহত্তর বরিশাল এবং বর্তমান পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে ২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা হামিজুদ্দীন হাওলাদার ও মা জমিলা খাতুনের নয় ছেলেমেয়ের মধ্যে আহসান হাবীব ছিলেন জ্যেষ্ঠ।

১৯৩০ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় শ্রেণিশিক্ষক বাড়ির কাজ হিসেবে "হাজী মহসীন" নামে রচনা লিখতে দিলে কবি তা ছন্দ মিলিয়ে কবিতা আকারে লিখে আনেন। এতে শ্রেণিশিক্ষক তাঁর ওপর রুষ্ট হন।

১৯৩১ সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে প্রথম লেখা ছাপা হয় (লেখাটি কী নামে ছাপা হয়েছিল, তার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি)।

১৯৩২ অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এ বছর 'শরীয়তে এসলাম' পত্রিকার সম্পাদকের ইচ্ছায় সেখানে ছাপা হয় "প্রদীপ" নামে একটি কবিতা। এতে কবি খুব আনন্দ লাভ করেছিলেন।

১৯৩৩-৩৪ "ধর্ম" নামে একটি গদ্যরচনা ছাপা হয় পিরোজপুর সরকারি স্কুলের ম্যাগাজিনে ১৯৩৩ সালে। আর পরের বছর বন্ধুর মা মারা গেলে শোকাহত বন্ধুর উদ্দেশে লেখেন "মায়ের কবর পাড়ে কিশোর" নামে কবিতা। এটি প্রকাশিত হয় স্কুল ম্যাগাজিনেই। তখন তিনি দশম শ্রেণির ছাত্র।

১৯৩৫ "রিক্ত" ও "স্মৃতি" নামে দুটি লেখা প্রকাশিত হয়। এই বছরই তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে বরিশাল ব্রজমোহন (বি. এম.) কলেজে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি। এ-বছরই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা কবি জীবনানন্দ দাশ এই কলেজে যোগ দেন ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে। তিনি এ-কলেজে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। কিন্তু আহসান হাবীব তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন কি না, তেমন কোনো তথ্য বা তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না। জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে বন্ধু-পরিজন কারো সঙ্গে আহসান হাবীবের কোনো আলাপচারিতা হয়েছে—এমন তথ্য কেউ দিতে পারেননি।

১৯৩৬ উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পর আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ পড়াশোনা ছেড়ে পরিবার-পরিজন কাউকে না বলে কলকাতায় গমন। সম্পূর্ণ অচেনা মহানগরীতে স্বজন বলতে কেউ ছিলেন না তাঁর। ৫ ডিসেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় "একখানা চিঠি" নামে কবিতা প্রকাশ।

১৯৩৭ ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আজাদ' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগদান। এর কয়েক মাস পর যোগ দেন 'তকবীর' পত্রিকায়। সেখান থেকে একই বছর 'মাসিক বুলবুল' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। এখানে কাজ করেন প্রায় এক বছর।

১৯৩৯ 'মাসিক বুলবুল' ছেড়ে সমকালের অন্যতম প্রভাবশালী বাংলা সাহিত্যপত্রিকা 'সওগাত'-এ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে দীর্ঘ পাঁচ বছর (১৯৩৯-৪৩) চাকরি করেন।

১৯৪৩ 'সওগাত'-এর চাকরি ছেড়ে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা বেতারে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে যোগদান। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এখানে নিয়মিত অনুষ্ঠানাদি করতেন। এ-সময় 'বিদ্যার্থী মণ্ডল' ও 'গল্প দাদু'র আসরের জন্য ব্যাপক পরিচিতি পান।

১৯৪৭ জানুয়ারি মাসে 'দৈনিক ইত্তেহাদ'-এর সাহিত্যপাতা 'সাহিত্য মজলিস'-এর দায়িত্ব গ্রহণ। কমরেড পাবলিশার্সের প্রথম প্রকাশনা হিসেবে এপ্রিল মাসে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* প্রকাশ। ২১ জুন বগুড়ার নামাজগড় এলাকার মোহসীন আলী মিয়ার কন্যা খাতুন সুফিয়ার সঙ্গে বিয়ে।

১৯৪৮ বছরখানেক একসঙ্গে কলকাতা বেতার ও 'ইত্তেহাদ'-এ চাকরি করলেও একপর্যায়ে কবির কর্মক্ষেত্রের একমাত্র ঠিকানা হয় 'সাহিত্য মজলিস'। এ-বছর ঢাকায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এক বক্তৃতায় বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পেলে ঢাকার লেখকদের কাছ থেকে 'সাহিত্য মজলিস'-এর পাতায় বাংলাকে মাতৃভাষা করার পক্ষে লেখা আহ্বান করেন। প্রাবন্ধিক আবদুল হকের মতো আরো বেশ কয়েকজন এ-সময় 'সাহিত্য মজলিস'-এর মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। ১৯৫০ সালে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসার আগ পর্যন্ত কবি এখানেই কর্মরত ছিলেন।

১৯৫০ অক্টোবর মাসে কবির বড় মেয়ে কেয়া চৌধুরীর জন্ম। ততদিনে ঢাকাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু। এ-সময় কাজের সুযোগ পান ১৯৪৯ সালে ঢাকায় পুনঃপ্রকাশিত 'মাসিক মোহাম্মদী'তে। একই সঙ্গে দেশ-বিভাগের পর আবুল কালাম শামসুদ্দীনের (১৮৯৭-১৯৭৮) সম্পাদনায় ঢাকায় স্থানান্তরিত (১৯৪৮ সালের অক্টোবর) 'দৈনিক আজাদ'-এর সাহিত্যপাতাতেও কাজ শুরু করেন তিনি।

১৯৫১-৫৬ পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা 'দৈনিক আজাদ'-এর (১৯৪৮ সালে ঢাকায় স্থানান্তরিত) সাহিত্যপাতা এবং নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'ইত্তেহাদ' পত্রিকাতেও তিনি সাহিত্যপাতার দায়িত্ব পালন করেন। কাজ করেন 'সওগাত' পত্রিকাতেও।

১৯৫৪ কবির দ্বিতীয় কন্যা জোহরা নাসরীনের জন্ম (যিনি ২০১১ সালের ১০ আগস্ট তারিখে কিডনির সমস্যায় মৃত্যুবরণ করেন)।

১৯৫৫ *রাত্রিশেষ*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

১৯৫৭ বাণিজ্যিক প্রকাশনা সংস্থা 'ফ্রাংকলিন প্রোগ্রামসে' প্রোডাকশন অ্যাডভাইজার হিসেবে যোগদান। এখানে প্রায় সাত বছর দায়িত্ব পালন। এ-সময়ের মধ্যে তিনি 'কথাবিতান' নামে একটি পুস্তক বিক্রয় ও প্রকাশনা সংস্থা গড়ার চেষ্টা করেন, তবে সফল হননি।

১৯৫৮ কবির বড় পুত্র, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম কথাসাহিত্যিক মঈনুল আহসান সাবেরের জন্ম। প্রকাশিত হয় অনুবাদগ্রন্থ *রাজা বাদশা হাজার মানুষ*—মূল : মুনবোলিফ রচিত *হিস্টরি ক্যান বি ফান*।

১৯৫৯ অনুবাদগ্রন্থ *এসো পথ চিনে নিই* (মূল : ডরোথি কৃপকি) ও *অভিযাত্রী কলম্বাস* (আর্মস্ট্রং স্পেরি রচিত *দ্য ভয়েজেজ অব ক্রিস্টোফার কলম্বাস*) প্রকাশিত হয়।

১৯৬০ অনুবাদের জন্য 'ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার' লাভ।

১৯৬১-৬২ কবিতায় 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' (১৯৬১) প্রাপ্তি। কবির নিজের প্রকাশনা সংস্থা 'কথাবিতান' থেকে এ-বছরই *আরণ্য নীলিমা* উপন্যাসের প্রকাশ। ১৯৬২ সালে কবির দ্বিতীয় পুত্র বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী মনজুরুল আহসান জাবেরের জন্ম। এই বছরে কবির দ্বিতীয় কাব্য *ছায়া হরিণ* প্রকাশিত হয়।

১৯৬৪ কবির 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' লাভ। 'ফ্রাংকলিন প্রোগ্রামস' থেকে এ-বছরই তিনি 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। উল্লেখ্য, ৪৭ বছর বয়সে প্রাপ্ত এই চাকরিটিই ছিল কবির প্রথম এবং একমাত্র স্থায়ী চাকরি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এখানেই কর্মরত ছিলেন। এই পত্রিকার সাহিত্যপাতার গুণগতমানের কারণে সমকালে এটি তুমুল পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল। বাংলাদেশে এই পত্রিকাটির মাধ্যমে আহসান হাবীব সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় কবির তৃতীয় কাব্য *সারা দুপুর*।

১৯৬৫ 'কথাবিতান' থেকে ছোটদের জন্য লেখা *রাণীখালের সাঁকো* উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৬৭ পাকিস্তান সরকার বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। এ-সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সমমনা ও সরকারি চাকুরেদের কাছ থেকে সরকার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। ২২ জুন তারিখে হুমকির মুখে বাধ্য হয়ে ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান।

১৯৭৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে প্রকাশিত হয় *আশায় বসতি*। এ-কাব্যের মুখবন্ধে কবি তারিখ উল্লেখ করেছেন ২৫ শে বৈশাখ ১৩৮১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৬ মুক্তিযুদ্ধকালে রচিত কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*।

১৯৭৭ নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক লাভ। ছড়ার বই *বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর*-এর প্রকাশ।

১৯৭৮ এ-বছর কবি তিনটি পুরস্কার লাভ করেন—একুশে পদক, কবিতালাপ পুরস্কার (খুলনা) এবং অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (কুমিল্লা)। প্রকাশিত হয় ছড়ার বই *ছুটির দিন দুপুরে*।

১৯৮০ কবির সবচেয়ে সফল কাব্য *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*-এর প্রকাশ। আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (ময়মনসিংহ) লাভ।

১৯৮১ *প্রেমের কবিতা* কাব্যের প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পদক লাভ।

১৯৮২ পদাবলী পুরস্কার লাভ (ঢাকা) করেন।

১৯৮৪ আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৮৫ কবির সর্বশেষ কাব্য *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* প্রকাশিত হয়। এ-বছরের ১০ জুলাই তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজে কবির জীবনাবসান ঘটে। তাঁর মরদেহ রাজধানীর বনানীর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। কবির মৃত্যুর পর শিশু একাডেমী প্রকাশ করে ছোটদের কবিতার বই *রেলগাড়ি ঝমাঝম* (১৯৯১)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

গ্রন্থপঞ্জি

আহসান হাবীবের কাব্যগ্রন্থ (আকরগ্রন্থ)

রাত্রিশেষ	:	কমরেড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৭
ছায়া হরিণ	:	কথাবিতান, ঢাকা, ১৯৬২
সারা দুপুর	:	কথাবিতান, ঢাকা, ১৯৬৪
আশায় বসতি	:	আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৮১ (১৯৭৪)
মেঘ বলে চৈত্রে যাবো	:	সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা,১৯৭৬
দু'হাতে দুই আদিম পাথর	:	কথাসরিৎ, ঢাকা, ১৯৮০
প্রেমের কবিতা	:	আনন্দ প্রকাশন, ১৯৮১
বিদীর্ণ দর্পণে মুখ	:	বইঘর, চট্টঘর, ১৯৮৫

অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস : *আরণ্য নীলিমা*	:	কথাবিতান, ঢাকা, ১৯৬১
রাণীখালের সাঁকো	:	বাশার ব্রাদার্স, ঢাকা, (আনুমানিক) ১৯৫৫, (২য় সংস্করণ ১৯৬৫ কথাবিতান)
জাফরানি রঙ পায়র	:	মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯
গল্প (অগ্রন্থিত)	:	"বোবা জোয়ার"
	:	"দক্ষিণের জানালা"
	:	"খুশি"
	:	"ছাই থেকে"
	:	"কে কাঁদে"
	:	অপরাহ্নে"
	:	"চেহারা"
নাটক	:	তিনটি সন্ধ্যা একটি সকাল
শিশুসাহিত্য	:	*বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭
	:	*ছুটির দিন দুপুরে*, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮
	:	*হাজীবাবা*, লিপিকা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮
	:	*রেলগাড়ি ঝমাঝম*, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১
	:	*পাখিরা ফিরে আসে*, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা
অনুবাদ	:	*জোছনা রাতের গল্প*, বোরহান পাবলিকেশনস, ঢাকা, পঞ্চাশের দশকে
	:	*রাজা বাদশা হাজার মানুষ*, মজিদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৫৮
	:	*অভিযাত্রী কলম্বাস*, এশিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৫৯
	:	*এসো পথ চিনে নিই*, বাশার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৫৯
	:	*ইন্দোনেশিয়া*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৬
	:	*প্রবাল দ্বীপে অভিযান*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৩৭৭ (১৯৭০)
	:	*রত্নদীপ*, ওসমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা
	:	*খসড়া*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি : বাংলা

অনু হোসেন : *শিল্পের চতুষ্কোণ*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৫

: *বাংলাদেশের কবিতা : লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ২০০৭

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) : *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৩

অশোককুমার মিশ্র : *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০০০)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২

অশ্রুকুমার সিকদার : *হাজার বছরের বাংলা কবিতা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯

আজীজুল হক : *অস্তিত্বচেতনা ও আমাদের কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

আনিসুজ্জামান : *আমার চোখে*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯

: *কাল নিরবধি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

আবদুল হক : *বাঙালির জাগরণ* (আহমদ মাযহার সম্পাদিত), অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১

: *স্মৃতি-সঞ্চয়* (সৈয়দ আজিজুক সম্পা.), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫

আবিদ আনোয়ার : *বাঙলা কবিতার আধুনিকায়ন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

আবু জাফর শামসুদ্দীন : *আত্মস্মৃতি*, প্রকাশক, আহমেদ পারভেয শামসুদ্দীন, ঢাকা, ১৯৮৯

আবু রুশদ্ : *আত্মজীবনী*, এ্যাডর্ন পাবিলিকেশন, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ১৯৯৮

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : *অতীত দিনের স্মৃতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৬৮

আবুল হাসনাত (সম্পা.) : *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, অবসর, ঢাকা, ২০০০

আবু হেনা মোস্তফা কামাল : *আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী* (আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পা.), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

আহমদ রফিক : *শিল্প সংস্কৃতি জীবন*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮ (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮)

: *কবিতা আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১

আহমেদ মাওলা : *চল্লিশের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭

আহসান হাবীব : *আহসান হাবীব রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড,) বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

: *আহসান হাবীব রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ২০০১

ক্ষুদিরাম দাস : *বাংলা কবিতার রূপ ও রীতি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪

খোন্দকার আশরাফ হোসেন : *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

: *রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার অক্ষ-দ্রাঘিমা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১০

: *কবিতার অন্তর্যামী : আধুনিক উত্তরাধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১০

: *বিশ্ব কবিতার সোনালী শস্য*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

জহর সেনমজুমদার : *বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮

জীবেন্দ্র সিংহরায় : *আধুনিক কবিতার মানচিত্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৬

তারেক রেজা : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিমানস ও শিল্পরীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০১০

তুষার দাশ : *নিঃশব্দ বজ্র : আহসান হাবীবের কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

: *আহসান হাবীব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository

: *সেইসব মুখশ্রীর আলো ও আমার জীবনানন্দ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০২

দিনেশ দাস : *কাব্যসমগ্র* (অখণ্ড), মনীষা, কলকাতা, ১৯৮৪

দিলারা হাফিজ : *বাংলাদেশের কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২

দীপ্তি ত্রিপাঠী : *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা (৩য় সং), ১৯৮৪

নরেন বিশ্বাস : *অলঙ্কার অন্বেষা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০০

ফজলুল হক সৈকত : *তিরিশোত্তর কাব্যধারা ও আহসান হাবীবের কবিতা*, কল্লোল বুক সেন্টার, ঢাকা, ২০০২

ফরহাদ খান : *প্রতীচ্য পুরাণ*, প্রতীক, ঢাকা, ১৯৯৬

বার্ণিক রায় : *কবিতা : চিত্রিত ছায়া*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৬

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : *সাহিত্য-বিবেক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৬

বিমল গুহ : *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

: *আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকজ উপাদান : জসীমউদ্‌দীন-জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : *বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা*, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থবিতান, কলকাতা, ১৯৭৭

বুদ্ধদেব বসু : *কালের পুতুল*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৪৬

বেগম আকতার কামাল : *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, ইত্যাদি, ঢাকা, ২০১০

: *আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : *স্বনির্বাচিত কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯০

মাসুদুজ্জামান : *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

মাসুদুল হক : *বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

মাহবুব সাদিক : *কবিতায় মিথ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

মাহবুবা সিদ্দিকী : *আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজ সচেতনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পা.) : *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, প্রকাশিকা : নূরজাহান বেগম, ঢাকা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : *আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯১

: *বাংলা কবিতার ছন্দ*, নওরোজ কিবতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭৯

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ : *কবিতা ও প্রসঙ্গ কথা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী : *অভ্যুদয়*, ভীষ্মদেব চৌধুরী (সম্পা.), ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা, ২০১২

রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২

রফিকুল ইসলাম (সম্পা.) : *আধুনিক কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৪

রশীদ করিম : *অতীত হয় নূতন পুনরায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

রোকনুজ্জামান খান (সম্পা.) : *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ*, আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা, ১৯৮৭

শঙ্খ ঘোষ : *কবির অভিপ্রায়*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৪

: *ছন্দের বারান্দা*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭

শহীদ ইকবাল : *কালান্তরের উক্তি ও উপলব্ধি*, চিহ্ন, রাজশাহী, ২০০৫

সমর সেন : *সমর সেনের কবিতা*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ

সরকার আমিন : *বাংলাদেশের কবিতায় চিত্রকল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৬

সরলানন্দ সেন : *ঢাকার চিঠি*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সাঈদ-উর রহমান : *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩

(সম্পা.) : *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩

সিদ্দিকা মাহমুদা : *সুধীন্দ্রনাথ : কবি ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

সুকান্ত ভট্টাচার্য : *সুকান্ত সমগ্র*, সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৯৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৫৭

সৈকত আসগর : *বাংলা কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক*, ১৯৯৩

সৈয়দ আকরম হোসেন : *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

সৈয়দ আলী আহসান : *সতত স্বাগত*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৩

: *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ১৯৯৩

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : *কতিপয় প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

সৈয়দ শামসুল হক
ও মুহাম্মদ সামাদ (সম্পা.) : *কবি ও কবিতার সংগ্রাম*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪

হাসান হাফিজুর রহমান : *আধুনিক কবি ও কবিতা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

হুমায়ুন আজাদ : *নির্বাচিত প্রবন্ধ* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭

: *ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

হোসেনউদ্দীন হোসেন : *ঐতিহ্য আধুনিকতা ও আহসান হাবীব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি : ইংরেজি

Christopher Hollis : *A Study of George Orwell*, Hollis and Carter, London , 1956

C. Day Lewis : *The Poetic Image,* Jonthan Cape, London, 1968

F. Copleston : *Contemporary Philosophy*, Burns & Orates, London, (1963)

Frank Kermode : *Romantic Image*, Routledge and Kegan Paul, 1972

George Orwell : *Nineteen Eighty-Four*. 1949; Harmondsworth: Penguin Books, 1976.

James Mefarlane : *Modernism*, Penguin Books Ltd, London, 1976

Jeffrey Meyers : *A Reader's Guide to George Orwell*, Thames and Hudson, London,
1984

J. H. Miller : *Poets of Reality*, Belknap Press, Cambridge, (1965)

Jonathan Culler : *Literary Theory*. New York : Oxford University Press, 1997

Khondakar Ashraf Hossain : Western Influences on Bangladeshi Poetry

M.L. Rosenthal : *The Modern Poets*, Oxford University Press, New York.128 pp, 1960).

mohammad nurul huda : Flaming Flowers : Poet's Response to the Emergence of Bangladesh

S. S. Stumpf : *Socrates to Sartre : A History of Philosophy*, McGraw Hill, U.S.S. 372 pp, (1975).

সহায়ক প্রবন্ধপঞ্জি

আজীজুল হক : "বাংলাদেশের কবিতায় অস্তিত্বচেতনার স্বরূপ", 'সাহিত্য পত্রিকা', বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১, ১৩৮৭, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আবিদ আনোয়ার : "খলিক নিকিরির স্বজন পরিজন"

: "বাংলাদেশের আধুনিক কবিতা : সূচনাপর্বের প্রধান কবিদের নির্মাণকলা", 'নান্দীপাঠ' (সম্পা. সাজ্জাদ আরেফিন), ঢাকা, সংখ্যা ৫, নভেম্বর ২০১১

আবু কায়সার : "রাত্রিশেষের ছায়া হরিণ", 'শৈলী', সম্পাদক: কায়সুল হক, বর্ষ ৪, সংখ্যা ২২, ঢাকা, ১৯৯৯

আলমগীর টুলু : "মেঘ বলে চৈত্রে যাবো: আলোর প্রত্যাশ", 'উলুখাগড়া' (সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন),

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি ২০১২, ঢাকা, পৃ. ২০৪

আহমদ রফিক : "আহসান হাবীবের কবিতায় সমাজচেতনা"

: "চল্লিশের কবিতা : স্বভাবে স্বরূপে", 'নান্দীপাঠ' (সম্পা. সাজ্জাদ আরেফিন) ৫, নভেম্বর ২০১১

কামাল চৌধুরী : "আহসান হাবীব-এর কবিতা : আধুনিকতার উদ্ভাসন"

জামসেদ ফয়জী : *গ্রীক মিথ*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০

তুষার দাশ : "আহসান হাবীবের প্রেমের কবিতা"

দিনেশ দাস, : "আমি এদেশের মার্কসবাদীদের কথা শুনতে প্রস্তুত নই", 'গঙ্গোত্রী', শারদীয় সংখ্যা, পৃ. ৫২

নাসির আহমেদ : "আহসান হাবীব : তাঁর সম্পাদনা"

বসুধা চক্রবর্তী : "আহসান হাবীব প্রণীত রাত্রিশেষ", 'সওগাত', পৌষ, ১৩৫৪

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী : "আহসান হাবীবের *সারা দুপুর*", 'সাহিত্য পত্রিকা', বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৩, আষাঢ়, ১৪১৮,
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর : "আহসান হাবীবের পৃথিবী"

মঈনুল আহসান সাবের : "আহসান হাবীব ও একটি স্বাক্ষর", প্রথম আলো সাহিত্য সাময়িকী, ১৩ জুন ২০০৩

: "আমার বাবার ছবি"

মামুন মোস্তফা : "বাংলাদেশের কবিতায় নস্টালজিয়া", 'কলি ও কলম', তৃতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৪১৩

মাহবুব সাদিক : "আহসান হাবীব, তাঁর কবিতা"

মিজানুর রহমান : "আহসান হাবীবের কবিতার শিল্পরূপ", 'সাহিত্য পত্রিকা', বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ৩, আষাঢ়, ১৩৯৮, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ : "পঁচিশ বছরের কবি", 'উত্তরাধিকার', শহীদ দিবস সংখ্যা, ১৯৭৪

রফিকউল্লাহ খান : "আহসান হাবীবের কবিতা", 'ইত্তেফাক', ঢাকা, ২৬ কার্তিক, ১৩৮৯

সাজ্জাদ শরিফ : "বিদীর্ণ দর্পণে মুখ", 'অধুনা', সম্পা. শামসুর রাহমান

সাযযাদ কাদির : "একজন কবির প্রতিকৃতি", 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা', বর্ষ ৬, সংখ্যা ২০, নভেম্বর ১৯৭৭

সিকদার আমিনুল হক : "কবি আহসান হাবীব", 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা', বর্ষ ৬, সংখ্যা ২০, নভেম্বর ১৯৭৭

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : "আহসান হাবীবের গৃহানুসন্ধান", 'দৈনিক দেশ', ঢাক, ১৩ অক্টোবর, ১৯৯০

সৌভিক রেজা : "বিদীর্ণ দর্পণে মুখ : এক সংশয়ী ক্লান্ত কবির চূর্ণিত প্রতিচ্ছবি"

হাসান হাফিজুর রহমান : "বাংলাদেশের কবিতা : কাব্যবিচার", 'নান্দীপাঠ' (সম্পা. সাজ্জাদ আরেফিন), ঢাকা, সংখ্যা ৫, নভেম্বর ২০১১